বিশেষ সংখ্যা

ডিসেম্বর ২০১৯ ▪ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৬

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাওয়ার গল্প

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো

বিজয় দিবস, মুজিববর্ষ এবং বাংলাদেশ

বিজয় ফুল উৎসব

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

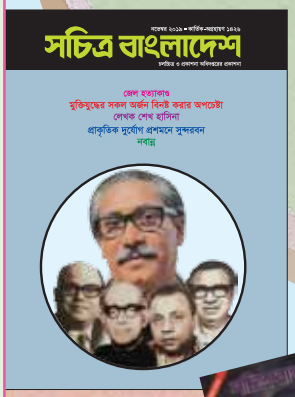

- যে-কোনো বিষয়ে লেখা পাঠানো যায়।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখার সাথে চিত্র দেওয়া হলে তা ক্যাপশনসহ প্রেরণ করা আবশ্যক।
- প্রতিটি লেখার জন্য লেখক সম্মানী দেওয়া হয়।
- হার্ডকপির সাথে সিডি বা ই-মেইলে লেখা পাঠানো হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
  dfpsb@yahoo.com

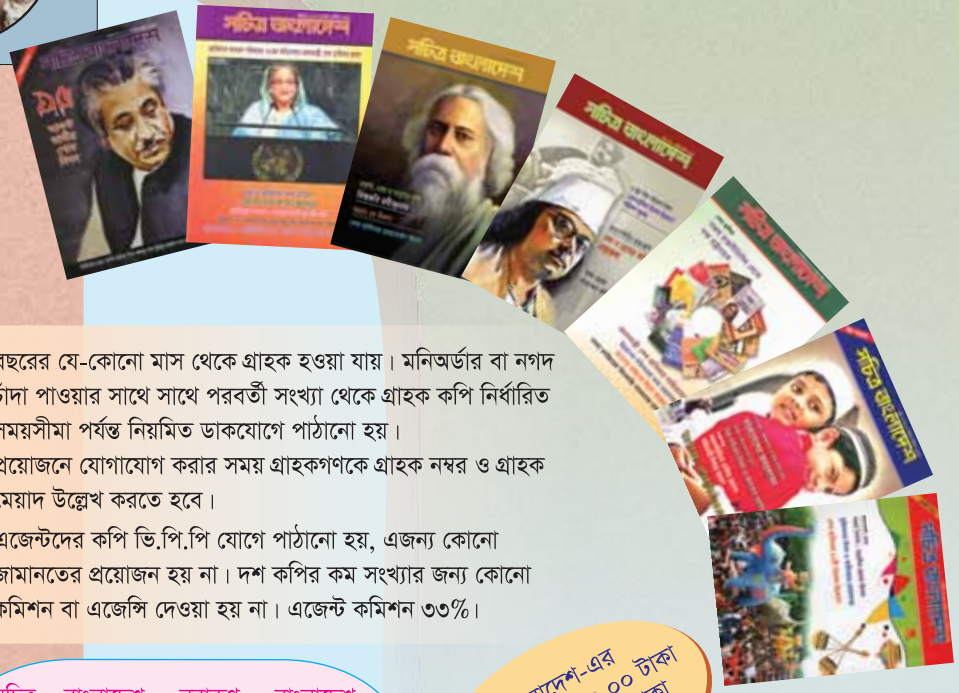

- বছরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- প্রয়োজনে যোগাযোগ করার সময় গ্রাহকগণকে গ্রাহক নম্বর ও গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্ট কমিশন ৩৩%।

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

ডিসেম্বর ২০১৯ ❑ অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৬

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১, রমনা রেসকোর্স ময়দানে [সোহরাওয়ার্দী উদ্যান] মিত্রবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে

সম্পাদকীয়

ষোলোই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড়ো বিজয় অর্জিত হয়েছিল। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে পাকিস্তানের লেফটেনেন্ট জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বে ৯২ হাজার পাকসেনা আত্মসমর্পণ করে। পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় 'বাংলাদেশ' নামে স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র। জাতি এবার পালন করছে বিজয়ের ৪৮-তম বার্ষিকী। বিজয়ের লক্ষ্যে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ডাক সমগ্র বাঙালি জাতিকে ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। বিজয়ের এই দিনটিতে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অকুতোভয় লাখো শহিদকে। মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রবন্ধ-নিবন্ধ দিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের *সচিত্র বাংলাদেশ* সংখ্যাটি।

বিজয়ের ৪৮ বছরে আমাদের প্রাপ্তি অনেক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে, জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের মানদণ্ড অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে একটি দেশের মাথাপিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে ১২৩০ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এখন ১৯০৯ মার্কিন ডলার। উন্নয়নশীল দেশের কাতারে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উদ্যমী ষোলো কোটি মানুষের এই অর্জন অক্ষয় হোক।

সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলার সঙ্গে বিশ্ব-সাহিত্যের মেলবন্ধন। লেখক, পাঠক-বুদ্ধিজীবী সমাবেশ ঘটেছে এই মেলবন্ধনে। এ নিয়ে রয়েছে একটি নিবন্ধ।

সংখ্যাটিতে রয়েছে– নিয়মিত বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধের গল্প ও কবিতা। আশা করি সংখ্যাটি পাঠক প্রিয়তা পাবে। পাঠকদের প্রতি রইল বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন
সিনিয়র সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া
সম্পাদক
সুফিয়া বেগম
মহাঃ শামসুজ্জামান

কপি রাইটার
মিতা খান
সহ-সম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ
শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন
অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা
আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৯৩৩২১২৯, ৯৩৩৩১৪৯
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা
গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : সহকারী পরিচালক
(বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ

বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাওয়ার গল্প ৪
ড. আতিউর রহমান

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো ৬
নির্মলেন্দু গুণ

বিজয় দিবস, মুজিববর্ষ এবং বাংলাদেশ ৮
খালেক বিন জয়েনউদদীন

বিজয় ফুল উৎসব ১০
সানিয়াত রহমান

আনোয়ারা উপন্যাসের শতবর্ষ ১২
ড. মোহাম্মদ হাননান

বিজয়ের ৪৮ বছরে প্রাপ্তি ১৭
রেহানা শাহনাজ

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় ২২
রফিকুর রশীদ

ঢাকা লিট ফেস্ট ২৮
ইফফাত রেজা

যুদ্ধশিশু ২৯
ড. শিল্পী ভদ্র

মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যা
বাঙালি শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আত্মদান ৩৩
সুষমা ফাল্গুনী

মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা ৩৫
মিজানুর রহমান মিথুন

ফায়ার সার্ভিস শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ ৩৭
মিয়াজান কবীর

২০১৭ ও ২০১৮ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান ৩৮
ফারিহা রেজা

বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা রমা চৌধুরী ৪০
বিনয় দত্ত

কবিতা ও গানে স্বাধীনতা সংগ্রাম ৪২
মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

একাত্তরের জননী ৪৫
মোঃ মাজেদুল ইসলাম

স্বাধীনতা ও আইনের শাসন ৪৬
সাহিদা বেগম

নারী জাগরণের আলোকবর্তিকা বেগম রোকেয়া ৪৬
ফাতেমা আক্তার হ্যাপি

ঋতু বৈচিত্র্যে শীত ঋতু ৫০
জাবরীনা রহমান

হাইলাইটস

প্রতিবন্ধী খাতে সরকারের সাফল্য ৫২
আবিদ লিপু

এইডস নির্মূলে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সম্পৃক্ততা ৫৪
জেসিকা হোসেন

গল্প

মানুষের ডেরায় স্বপ্নের খুঁটি ১৮
সেলিনা হোসেন

কালো মেয়ে ৫৫
নাসিম সুলতানা

কবিতাগুচ্ছ ২৬, ২৭, ৪৭, ৪৮, ৪৯
নির্মলেন্দু গুণ, জাকির আবু জাফর, শাফিকুর রাহী খান আসাদুজ্জামান, বাবুল তালুকদার, লিলি হক সাঈদ তপু, আবু তৈয়ব মুছা, মাইন উদ্দিন আহমেদ শাহনাজ, ফারিহা নূর, তাপসী রাবেয়া, নিলু হোসেন ইমরুল ইউসুফ, ওয়াসীম হক, রুস্তম আলী, সাদিয়া সিমরান রবিউল ইসলাম, হিরা চৌধুরী, ফায়েজা খানম

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৫৭
প্রধানমন্ত্রী ৫৮
তথ্যমন্ত্রী ৫৯
জাতীয় ঘটনা ৬০
আন্তর্জাতিক ৬১
উন্নয়ন ৬২
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৬২
শিল্প-বাণিজ্য ৬৩
শিক্ষা ৬৪
বিনিয়োগ ৬৫
নারী ৬৫
সামাজিক নিরাপত্তা ৬৬
কৃষি ৬৭
বিদ্যুৎ ৬৮
কর্মসংস্থান ৬৮
পরিবেশ ও জলবায়ু ৬৯
নিরাপদ সড়ক ৭০
যোগাযোগ ৭০
স্বাস্থ্যকথা ৭১
মাদক প্রতিরোধ ৭২
সংস্কৃতি ৭৩
চলচ্চিত্র ৭৪
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৭৫
প্রতিবন্ধী ৭৬
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৭৭
ক্রীড়া ৭৮
শ্রদ্ধাঞ্জলি: চলে গেলেন কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন ৮০

বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাওয়ার গল্প

গত এক যুগ ধরে বাংলাদেশ গড়ে প্রায় সাত শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। আর প্রবৃদ্ধির হারের স্থিতিশীলতা এ অঞ্চলের সব দেশের মধ্যে উত্তম। বিগত অর্থবছরের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.১৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছরেও তা আট শতাংশের বেশিই হবে বলে এডিবি আশা করছে। এই উন্নয়ন অব্যাহত রাখা গেলে ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে 'বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাওয়ার গল্প' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-৪

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রকৃত ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পৌঁছে দেওয়ার তাগিদবোধ থেকে ও ইতিহাস বিকৃত করার অপচেষ্টা রুখে দিতে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ৭ই মার্চের ভাষণটিকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কবি নির্মলেন্দু গুণ একটি কবিতা রচনা করেন। রচনান্তে কবিতাটির নাম রাখেন– 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো'। এ কবিতাটিই বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠোচ্চারিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার অমর কাব্যবাণীকে বহন করে নিয়ে যাবে ভবিষ্যতের বাঙালির কাছে। যুগ থেকে যুগান্তরে। কাল থেকে কালান্তরে। কবিতাটি রচনার প্রেক্ষাপট বিষয়ে 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' শীর্ষক নিবন্ধটি দেখুন, পৃষ্ঠা-৬

বিজয় দিবস, মুজিববর্ষ এবং বাংলাদেশ

১৬ই ডিসেম্বর বাঙালির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম অর্জনের দিন। এবারের বিজয় বার্ষিকী এসেছে মুজিববর্ষ পালনের প্রাক্কালে। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের সমূহ কর্মসূচি ঘোষণা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ সালের ১৭ই মার্চ পর্যন্ত বছরব্যাপী জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) পালন করা হবে। মুজিববর্ষ ঘোষণা এবং উদ্‌যাপন বাঙালির কাছে অহংকার ও শ্রদ্ধার বিষয়। 'বিজয় দিবস, মুজিববর্ষ এবং বাংলাদেশ' শীর্ষক নিবন্ধটি দেখুন, পৃষ্ঠা-৮

বিজয় ফুল উৎসব

নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উপলব্ধি এবং সংগ্রাম, ইতিহাস জানানোর উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ২০১৮ সাল থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'বিজয় ফুল' তৈরি, গল্প ও কবিতা রচনা, কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, একক অভিনয়, চলচ্চিত্র নির্মাণ ও দলগত দেশাত্মবোধক জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ বছরও স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে দেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজয় ফুল উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। 'বিজয় ফুল উৎসব' সম্পর্কে নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা-১০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাওয়ার গল্প

ড. আতিউর রহমান

এ বছর বাঙালির বিজয় দিবস এক ভিন্ন অনুভবে উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। 'মুজিববর্ষে'র ঠিক প্রাক্কালের এই বিজয় দিবস নিশ্চয় এক নয়া মাত্রা পেতে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এবং সারা বিশ্বেই আগামী বছর বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হবে। ২০২০ সালে মুজিববর্ষ পালন শেষেই আমরা ২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করব। ঐ সময়েও বঙ্গবন্ধুর বিশাল উপস্থিতি আমরা লক্ষ করব। কেননা সকল অর্থেই তিনিই যে বাংলাদেশ। তাঁর স্বপ্ন, অর্জন, চ্যালেঞ্জ, নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশের এগিয়ে চলার গল্প আমরা বলব এই দু'বছর ধরে। স্মরণ করব বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জিং সফল উন্নয়ন অভিযাত্রা।

মাত্র ৪৮ বছরে বাংলাদেশে যে বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছে তা অনেক বিদেশির কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য। সত্তরের দশকে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ যখন যাত্রা শুরু করে তখন তার রাস্তাঘাট, রেল, বন্দর, বিমানবন্দর, শিল্প কারখানাসহ সকল অবকাঠামো ও স্থাপনাই ছিল বিধ্বস্ত। এক ধ্বংসস্তূপ থেকে আমাদের উন্নয়ন অভিযাত্রার সূচনা হয়। ১৯৭২ সালে আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র আশি ডলারের মতো। সঞ্চয়ের হার জিডিপির ৩ শতাংশ; বিনিয়োগের হার জিডিপির ৯ শতাংশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিদেশি মুদ্রার মজুদ ছিল প্রায় শূন্য। বিদেশ থেকে খাদ্য সাহায্য ছাড়া দুর্ভিক্ষাবস্থা এড়ানো খুব মুশকিল ছিল। গড়পড়তা জীবনের আয়ুষ্কাল ছিল চল্লিশের সামান্য ওপরে। এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার দেশকে উন্নত করার লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় স্বদেশ পুনর্গঠনে নেমে পড়ে। তিনি দিনরাত পরিশ্রম করে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করে এনেছিলেন। দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও বাংলাদেশ ধ্বংসযজ্ঞ কাটিয়ে উন্নয়নের নয়া সড়কে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু বাংলাদেশে নেমে এল এক দুঃসময়। ১৯৭৫-এর আগস্টে ষড়যন্ত্রকারীদের এক নারকীয় আক্রমণে দেশবাসী তাদের প্রিয় নেতাকে হারালেন। এর কয়েক মাসের মধ্যে বাকি শীর্ষস্থানীয় নেতাদেরও জেলখানায় হত্যা করা হলো। নিরাশায় অন্ধকারে ডুবে গেল জাতি।

বঙ্গবন্ধুর সরকার পঁচাত্তরের শুরুর দিকেই অর্থনৈতিক নীতিমালায়, বিশেষ করে, শিল্প খাতে উদারিকরণের বেশকিছু সু-উদ্যোগ নিয়েছিল। খাদ্য উৎপাদনে নয়া প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ বছরের আগস্টের আচমকা আক্রমণের কারণে হঠাৎ যেন সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। এই ধাক্কা কাটাতে বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল। সামরিক শাসনের যাঁতাকলে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার তখন ক্ষুণ্ন হচ্ছিল। এর নেতিবাচক প্রভাব অর্থনীতিতেও পড়ছিল। তবে, অর্থনৈতিক নীতিমালায় কিছু উদারিকরণ নীতি গ্রহণের কারণে শিল্প ও বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধির ধারা জোরদার হতে শুরু করে। এই ধারা আরও বেগবান হয় নব্বইয়ের দশকে সামরিক শাসনের অবসানের পর। গণতান্ত্রিক পরিবেশে নব্বইয়ের দশকের শেষ ভাগে উদ্যোক্তার বিকাশের ধারায় আরো গতি আসে। বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে ঐ সময়ে যে সরকার গঠিত হয় তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল উদারিকরণের পাশাপাশি কৃষি ও খুদে উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সমর্থন প্রদান। বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে তাঁর সরকারের সমর্থনে। উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নও ছিল তাঁর সরকারের আরেক বৈশিষ্ট্য। উদার অর্থনীতি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ঐ কৌশল তাঁর সরকারের পর যেসব সরকার আসে তাদের এতটা স্পষ্ট ছিল না। এক পর্যায়ে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা চরমে পৌঁছলে বাংলাদেশে ফের ভিন্ন ধরনের সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে। তবে এই হস্তক্ষেপ খুব বেশি দিন টেকেনি। মূলত জনচাপে মাত্র দু'বছরের মাথায় একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দিয়ে সামরিক সমর্থনপুষ্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিদায় নেয়। ঐ নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে শেখ হাসিনা ফের ক্ষমতায় বসেন। ২০০৯-এর শুরু থেকে এই সরকারের আমলে ডিজিটাল বাংলাদেশসহ আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সুদূরপ্রসারী অনেক কর্মসূচির বাস্তবায়নের ফলে অর্থনীতি এক নয়া গতি লাভ করে।

বিশ্ব আর্থিক মন্দা সত্ত্বেও দিন দিনই প্রবৃদ্ধির গতি বেড়ে চলেছে। সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হলো যে এই প্রবৃদ্ধি বাড়ার সময় আয়ের বৈষম্য সেরকমটি বাড়েনি। বরং নিচের দিকের মানুষের আয় রোজগার বেশি হারে বেড়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে। যে কর্মীরা মূলত শিল্প খাতে বেশি বেতনে অংশগ্রহণ করেছে তারাই এই সাম্যের অর্থনীতির মূল কারিগর। বিদেশি অনেক বিনিয়োগকারী এখন বাংলাদেশে উন্নতমানের গার্মেন্টস ও অন্যান্য

ম্যানুফেকচারিং কারখানা স্থাপন করেছে। এসব কারখানায় কাজের পরিবেশ ভালো। আমাদের কর্মীরা এসব কারখানায় কাজ করে নতুন দক্ষতা অর্জন করার সুযোগ পায়। এরপর তারা অন্য দেশীয় কারখানায় কাজ খুঁজে নেয়। এখানে বেশি বেতনে কাজ এবং নয়া কর্মস্থানে তাদের অর্জিত দক্ষতা বিকাশের সুযোগ পায়। এভাবেই আহরিত দক্ষতা ব্যবহারের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তারা বাংলাদেশের শিল্পায়নে উৎপাদনশীলতা যেমন বাড়াচ্ছে, তেমনি কর্ম-পরিবেশকেও বিশ্বমানে উন্নীত করতে সহযোগিতা করছে। কাজের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের কারণেই আমাদের প্রবৃদ্ধি এমন গুণগতমানের হতে পারছে। আশার কথা, আমাদের সরকার ব্যক্তি খাতকে এই নয়াধারার গুণগতমানের প্রবৃদ্ধি অর্জনে যাবতীয় সুযোগ ও সহযোগিতা দিতে কার্পণ্য করছে না। তবে এর ফলে নগরায়ণের ওপর চাপ পড়ছে। এই চাপ মোকাবিলার জন্যে আরো বিচক্ষণ শাসন-ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই। গভার্নেন্স কাঠামোর দিকে নীতিনির্ধারকদের নজর আরো তীক্ষ্ণ করার সময় এসেছে। হালে অতি ধনীদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাবার প্রবণতার কারণে আয়-বৈষম্য বেশ বাড়ছে। দুর্নীতির প্রকোপও বেড়েছে আর সে কারণেই বঙ্গবন্ধুকন্যা দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, সহিংসতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এই শুদ্ধি অভিযানের ছোঁয়া দলে, অঙ্গসংগঠনে এবং প্রশাসনে পড়তে শুরু করেছে। এর ফলে সুশাসনের সুযোগ বাড়বে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়লে বিনিয়োগও গতি লাভ করবে।

গত এক যুগ ধরে বাংলাদেশ গড়ে প্রায় সাত শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। আর প্রবৃদ্ধির হারের স্থিতিশীলতা এ অঞ্চলের সব দেশের মধ্যে উত্তম। বিগত অর্থবছরের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.১৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছরেও তা আট শতাংশের বেশিই হবে বলে এডিবি আশা করছে। দুনিয়াজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়াও নানা মাত্রিক ঝুঁকি মোকাবিলা করেই বাংলাদেশের এগিয়ে যাবার ভঙ্গিটি প্রশংসিত হচ্ছে। শুধু প্রবৃদ্ধি বাড়ছে তাই নয়, এ প্রবৃদ্ধি সকলেই ভাগ করে নিচ্ছে। দ্রুত দারিদ্র্য নিরসনের হারই প্রমাণ করে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি খুবই গুণগতমানের। অতি দারিদ্র্যের হার প্রায় এগারো শতাংশে নেমে এসেছে। এ বছর প্রবৃদ্ধি আট শতাংশ ছাড়িয়েছে। এ ধারা অব্যাহত রাখা গেলে অতি দারিদ্র্যের এই হার অচিরেই এক ডিজিটে নেমে আসবে। এটা সম্ভব হচ্ছে আমাদের প্রবৃদ্ধির চালক কৃষি, রেমিট্যান্স ও তৈরিপোশাক শিল্পের সমান্তরাল প্রসারের কারণে। এসবই কর্মসংস্থান-বর্ধক খাত। এ কারণে আমাদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাত্রাও এখনও পর্যন্ত সহনীয় রয়েছে। আমাদের এই অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির মূলে রয়েছে একাত্তরের লড়াকু চেতনা, দুর্ভিক্ষ ও দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং প্রতিটি বিপর্যয়কে সুযোগে রূপান্তরিত করার অবিস্মরণীয় সক্ষমতা। ষোলো কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশ। তাই আমরা গভীরভাবে 'কানেক্টেড'। শহর আর গ্রামের সংযোগ খুবই নিবিড়। তাই গ্রামীণ মানুষের আয় রোজগার বাড়ার প্রভাব শহরের মানুষের জীবনকেও প্রভাবান্বিত করছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে চাঙ্গা রেখেছে। শিল্পায়নের গতি বাড়াতে সাহায্য করছে। তবে হালে বিশ্বজুড়েই আর্থিক মন্দার বাতাস আবার বইতে শুরু করেছে। এর ঝাপটা হয়ত বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও পড়বে। সেজন্যে রেগুলেটরও সরকারকে দ্রুত এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

বর্তমান সরকারের 'ভিশন-২০২১' জনগণের মৌলিক চাওয়াকে ঘিরেই তৈরি করা হয়েছে। ব্যক্তি খাতের প্রাধান্য, উদারিকরণ ও বিনিয়োগবান্ধব নীতি সংস্কার, বড়ো বড়ো অবকাঠামো গড়ার উদ্যোগ, দেশব্যাপী ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসার এবং মার্কেটের সঙ্গে অধিক হারে সংযুক্তির কৌশলের ওপর ভিত্তি করে এই দীর্ঘমেয়াদি কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও এই কৌশল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের নীতিমালা গ্রহণ করেছে।

আর এমন কৌশল ব্যবহার করে বাংলাদেশ যে হারে তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে তা বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারের দ্বিগুণেরও বেশি। সরকারের বাজেটভিত্তিক উদ্যোগগুলোর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংককেই অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নে ব্রতী করেছে। ফলে কৃষি ও খুদে খাতে প্রচুর অর্থায়ন ঘটেছে। এর ফলে দেশীয় চাহিদা ও বাজার যেমন বেড়েছে, তেমনি সরবরাহও বেড়েছে। দুইয়ে মিলে মূল্যস্ফীতিকে ক্রমান্বয়ে স্থিতিশীলও কমিয়ে আনা গেছে। আজ বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৯০৯ ডলার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এরই মধ্যে স্থিতিশীল হয়ে এসেছে। তার মানে মাথাপিছু আয় বাড়ার হার আগামীতে আরও বেশি হবে। রপ্তানি, রেমিট্যান্স, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণসহ সব ক্ষেত্রেই দিন দিনই উন্নতি হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গত সাত বছরে পাঁচগুণের মতো বেড়ে ৩১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশ আগামীতে ৭-৮ শতাংশের মতো প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখতে পারবে বলে আশা করছে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণসহ অবকাঠামো উন্নয়নে এবং আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণে বর্তমান সরকার যেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে তাতে মনে হয় আগামী দিনে প্রবৃদ্ধির এই হার আরো বাড়বে। আর সরকার প্রধানের গরিব-হিতৈষী অঙ্গীকারের কারণে এই প্রবৃদ্ধি আসবে সমাজের নীচের দিককার মানুষের আরো বলিষ্ঠ অংশগ্রহণের মাধ্যমে। পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের অবদানও বাড়বে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের ঝুঁকি সমন্বয় করার পরেও যে মুনাফা অর্জন করে তা আশপাশের সব দেশ থেকে বেশি। আর সে কারণেই বাংলাদেশের গুণগতমানের এই উন্নয়ন অভিযাত্রা টেকসই হবে। এরই মধ্যে বিদেশি বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে শুরু করেছে। তাদের উপযুক্ত সময়ে সহজ পদ্ধতিতে ব্যবসায়ী সেবা দিতে পারলে এফডিআই আরো বাড়বে।

তাই যদি সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে নগরায়ণ, শিল্পায়ন, তরুণ জনশক্তির সমন্বয় ঘটানোর স্বার্থে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা যায় তাহলে বাংলাদেশের উন্নয়নের গতি ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। ২০৩০ নাগাদ উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশ হতে তার কোনোই অসুবিধা হবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বদ্বীপ পরিকল্পনার আওতায় ২১০০ সালের স্বপ্নও জাতিকে দেখাচ্ছেন।

আমাদের এই ঐতিহাসিক পথ চলায় প্রতিবন্ধকতা ও সাফল্যের নানা মাত্রিক শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনের আলোর পথে অভিযাত্রার রূপরেখা তৈরি করে যেতে হবে। একইসঙ্গে এই পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের দিকে বেশি বেশি নজর দিতে হবে। লড়াই করে দেশ স্বাধীন করেছি, প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে অর্থনৈতিক মুক্তি যুদ্ধেও আমরা সাফল্য দেখাচ্ছি। আমাদের জাতীয় এসব গৌরব থেকে শক্তি অর্জন করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পথে আরো অনেক বাধাবিপত্তি হয়ত আসবে। তবে জাতি হিসেবে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি, হাতে হাত রেখে যদি একযোগে সামনের দিকে হাঁটতে থাকি, তাহলে নিশ্চয় আমরা সোনার বাংলা অর্জনের স্বপ্নিল লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারব। আগামী দিনের বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরিত হোক সেই প্রত্যাশাই করছি।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মারক: স্বাধীনতা স্তম্ভ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো

নির্মলেন্দু গুণ

১. আজ থেকে ৪৮ বছর আগে, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ মুক্তিকামী তৃতীয় বিশ্বের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (পূর্ব প্রচলিত নাম রেসকোর্স ময়দান) ১০ লক্ষাধিক মানুষের এক বিশাল জনগণসমুদ্রে দাঁড়িয়ে যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেছিলেন, আমার সৌভাগ্য হয়েছিল জনসভা মঞ্চের খুব কাছ থেকে, সাংবাদিকদের জন্য সংরক্ষিত বেঞ্চে বসে সেই কালজয়ী ভাষণ শোনার।

একজন তরুণ কবির জন্য এরচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে? তখন আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' সবে প্রকাশিত হয়েছে।

পৃথিবীর খুব কম কবিই জীবনের শুরুতে এ রকম সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছেন। আমি নিশ্চিতই একজন ভাগ্যবান কবি।

আমার মতো ভাগ্যবান কবি পৃথিবীতে খুব বেশি নেই।

আমি তখন শিল্পপতি ও গীতিকার আবিদুর রহমান সম্পাদিত ইংরেজি দৈনিক 'দি পিপল' পত্রিকায় কাজ করি।

আমি কবি বলেই তিনি তাঁর পত্রিকায় আমাকে সাব-এডিটরের কাজ দিয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অনুসারী এবং স্নেহভাজন।

পিপল পত্রিকা ভবন থেকে তখন একটি বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ বেরিয়েছিল, নাম 'গণবাংলা'। 'গণবাংলা'র নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন সাংবাদিক ও ভাসানী ন্যাপের অন্যতম নেতা জনাব আনোয়ার জাহিদ।

আমি দি পিপলের পাশাপাশি গণবাংলায়ও তখন লিখি। ৭ই মার্চ সিদ্ধান্ত নিলাম, আনোয়ার জাহিদ ভাইয়ের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে আমিও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাব।

ওই ভাষণটিই যে বিশ্ব-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে মানবজাতির অনন্য দলিলরূপে গণ্য হবে, তা কে জানত?

তবে বঙ্গবন্ধু যে ওইদিন একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন, তা মানুষের মুখে-মুখে এবং ঢাকার আকাশে-বাতাসেও ধ্বনিত হচ্ছিল। আমাদের পত্রিকার মালিক-সম্পাদক আবিদুর রহমান সাহেব আগেই স্থির করে রেখেছিলেন, ওই ভাষণের পরপরই ভাষণের সারবস্তু নিয়ে 'গণবাংলা' একটি টেলিগ্রাম প্রকাশ করবে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার পর আমিও ওই টেলিগ্রামে কিছু একটা লিখব। এইমতো স্থির করেই আমরা তিল ঠাঁই নাই মাঠে গিয়ে উপস্থিত হই।

রেসকোর্সের বিশাল ময়দানটি তখন কানায় কানায় পূর্ণ।

মঞ্চের কাছে সাংবাদিকদের জন্য সংরক্ষিত আসনে বসতে পেরে আমি নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান বলে ভাবতে থাকি। বঙ্গবন্ধুর জনসভাস্থলে আসতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছিল।

তখন জাহিদ ভাই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা আ স ম আবদুর রবের সঙ্গে কিছু কথা বলেন। কথাগুলো ছিল এ রকম: 'কী আপনার নেতা কি আজ স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন?'

তখন ছাত্রনেতা আ স ম রব পাঞ্জাবির আস্তিন গোটাতে গোটাতে বলেন, 'উনি না করলে আজকে আমরাই স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেব।'

জাহিদ ভাই তখন রবকে বিদ্রুপ করে বলেন, 'দেখা যাবে। নেতা এলে তো আপনারা সবাই বিড়াল হয়ে যাবেন।'

আ স ম আবদুর রব জাহিদ ভাইয়ের ওই বিদ্রুপের কী জবাব দিয়েছিলেন আমার স্মৃতিতে নেই। স্মৃতিতে নেই এজন্য যে, সকল অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ঠিক তখনই রেসকোর্স ময়দানে সমবেত জনসমুদ্রের জয়ধ্বনিতে বঙ্গবন্ধুর আগমনবার্তা প্রচণ্ড ঢেউয়ের মতো সমুদ্রসৈকতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তিনি একটি সাদা গাড়িতে চড়ে রমনা পার্কের দিক থেকে রেসকোর্স ময়দানে প্রবেশ করেন।

নেতাকে স্বাগত জানিয়ে ময়দানে আগত লাখো কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে– 'শেখ মুজিবের পথ ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর/ তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব/তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা/জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।'

২. এত বড়ো একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। শুধু তাঁর কথাই বলি কেন? এত বড়ো জনসভায় ভাষণ দেওয়ার ভাগ্য বিশ্বের কোনো নেতার হয়েছে কি? আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, তিনি কী বলে সম্বোধন করবেন এই বিশাল জনতাকে। তিনি জনসমুদ্রের ওপর চকিতে তাঁর চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর দুই হাত তুলে নমিত ভঙ্গিতে জনসমুদ্রকে শান্ত হওয়ার ইঙ্গিত করলেন। মুহূর্তে থেমে গেল সমুদ্রগর্জন।

রোস্ট্রামের সামনে সাজানো মাইক্রোফোনগুলোর দিকে সামান্য ঝুঁকে তিনি শুরু করলেন তাঁর সেই ঐতিহাসিক কালজয়ী ভাষণ।

বললেন, ভায়েরা আমার।

৩. আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত কণ্ঠের বজ্রভাষণ শুনলাম। আমার আশপাশের রিপোর্টাররা তাঁর কথা কাগজে টুকে নিচ্ছিলেন। আমারও উচিত ছিল তাই করা। কিন্তু আমি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে শুনতে কোথায় যেন হারিয়ে যাই। একসময় তাঁর ভাষণ শেষ হয়। লাখো মানুষের 'জয়য়য়য়য় বাংলা' 'জয়য়য়য়য় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনি শ্রবণ করতে করতে তিনি মঞ্চ ত্যাগ করে উদ্যানের মাটিতে পা রাখেন।

আমরা গণবাংলার টেলিগ্রাম প্রকাশের লক্ষ্যে সামনে নিয়ে দ্রুত সভাস্থল ত্যাগ করে পিপল অফিসে ফিরে যাই। অফিসে ফিরেই জাহিদ ভাই বললেন, যান, দ্রুত একটা রিপোর্ট লিখে ফেলুন।

কাগজ-কলম নিয়ে আমিও লিখতে বসি। কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারি না বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে আসলে কী বলেছেন। শুধু একটি বাক্যই ঘুরে ঘুরে আমার মনে পড়তে থাকে। পিন আটকে যাওয়া ভাঙা রেকর্ডের মতো ওই বাক্যটিই আমার মনের মধ্যে ধ্বনিত হতে থাকে– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয়য়য়য় বাংলা।'

কবি নির্মলেন্দু গুণ

আমি ওই বাক্যটি দিয়েই একটি খবরের শিরোনাম তৈরি করি এবং জনসভার একটি ছোট্ট বর্ণনা লিখি।

জাহিদ ভাই আমার রিপোর্ট পড়ে হাসেন।

বলেন, রিপোর্টিং কি এতই সোজা? বঙ্গবন্ধু যে চার দফা শর্ত দিয়েছেন, তা বুঝতে পারেননি? আমি মাথা নেড়ে স্বীকার করি, বলি, না। তিনি তখন হো হো করে হাসেন। বলেন, যান আপনার কবিতা নিয়ে আসেন। রিপোর্ট আপনাকে লিখতে হবে না।

অগত্যা আর কী করি। আমি একটি কবিতা লিখে গণবাংলার টেলিগ্রামে প্রকাশের জন্য জাহিদ ভাইকে দিই। রিপোর্টের বদলে গণবাংলার টেলিগ্রাম সংখ্যায় আমার ওই কবিতাটি ছাপা হয়।

(২৫শে মার্চের রাতে দি পিপল পত্রিকার কার্যালয়টি গানপাউডার দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পাঁচজন শ্রমিক-কর্মচারী জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যান। পত্রিকা অফিসটি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। ফলে আমার ৭ই মার্চকে নিয়ে ৭ই মার্চে লেখা ওই কবিতাটি চিরদিনের মতো হারিয়ে যায়। গণবাংলা পত্রিকার ওই টেলিগ্রাম সংখ্যাটি আমি অনেক খুঁজেও আর পাইনি। পেলে ওই কবিতাটি পাওয়া সম্ভব হতো। ওই কবিতায় আমি কী লিখেছিলাম, তার একটি শব্দও আমার মনে পড়ে না। কবিতার নামটিও মনে পড়ে না। তবে লিখেছিলাম যে, এবং কবিতাটি ছাপা হয়েছিল যে, সে কথা খুব মনে পড়ে। কবিতাটির জন্য আমার খুব মায়া হয়। না জানি কেমন হয়েছিল ওই কবিতাটি।)*

১০ বছর পর, ওই হারানো কবিতাটি যে একটি নতুন কবিতা হয়ে আমার মগজ থেকে মুক্তিলাভ করবে, আমি তা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টিকে নিয়ে জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল বিএনপি যখন ইতিহাস বিকৃত করার পথে পা রাখে– তখন ১৯৮০ সালের কোনো একদিন ইতিহাস বিকৃতির প্রতিবাদে, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ৭ই মার্চের ভাষণটিকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি একটি কবিতা রচনা করি। রচনান্তে কবিতাটির নাম রাখি– 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো'।

এ কবিতাটি আমি লিখেছিলাম আমার ময়মনসিংহের ধোপাখলার বাসায়। আমার স্ত্রী ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে পড়তেন বলে আমি তখন ময়মনসিংহে থাকতাম।

ওই কবিতার প্রথম শ্রোতা ছিলেন আমার বাবা। তিনি চিকিৎসার জন্য তখন আমার বাসায় এসেছিলেন। কবিতাটি আমি এক বসাতেই লিখে ফেলি।

লেখার পরে বাবাকে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাই। বাবা বিছানায় শুয়ে থেকে আমার কবিতাটি শুনছিলেন। এক পর্যায়ে, কবিতার শেষ দিকে এসে তিনি আর শুয়ে থাকতে পারেননি। তিনি বিছানায় উঠে বসেন এবং আমাকে বলেন, 'এত দিনে তুই একটা কবিতার মতো কবিতা লিখছোস। অনেকদিন পরে মনে হইল শেখ সাহেবের ভাষণটা শুনলাম।' একদিন কাশবনে বাবাকে আমার 'হুলিয়া' কবিতাটি পড়ে শুনিয়েছিলাম। আজ শোনালাম– 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' কবিতাটি। আমি দেখলাম আমার বাবার চোখে জল জমেছে।

৪. এখন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পাশে যখন আমার এ কবিতাটিকে ক্রমে স্থান করে নিতে দেখি, তখন আমার খুবই আনন্দ হয়। আমি যখন ওই কবিতাটি লিখেছিলাম তখন আমার ধারণা ছিল, ইতিহাস বিকৃতির উত্তাল তরঙ্গে বাংলাদেশ থেকে একদিন হয়তো বা ওই ভাষণটি হারিয়ে যাবে। তখনো টিকে থাকবে আমার এ কবিতাটি। আর এ কবিতাটিই বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠোচ্চারিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার অমর কাব্যবাণীকে বহন করে নিয়ে যাবে ভবিষ্যতের বাঙালির কাছে। যুগ থেকে যুগান্তরে। কাল থেকে কালান্তরে। তার যে প্রয়োজন হয়নি, সে আমাদের সবারই সৌভাগ্য।

আমি খুব হিসেবি মানুষ নই। কবিতাটির রচনা তারিখ লিখে রাখা হয়নি। তবে মনে পড়ে এ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক সচিত্র সন্ধানী পত্রিকায় ১৯৮০ সালের স্বাধীনতা দিবস বা বিজয় দিবস বিশেষ সংখ্যায়।

*[এই কবিতাটির রচনাপট]

লেখক: কবি

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ

বিজয় দিবস, মুজিববর্ষ এবং বাংলাদেশ

খালেক বিন জয়েনউদদীন

ষোলোই ডিসেম্বর বাঙালির শ্রেষ্ঠতম অর্জনের দিন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের এদিন আমরা পাকিস্তান সৈন্যদের পরাস্ত করে বিজয় অর্জন করেছিলাম। নয় মাস যুদ্ধ শেষে পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার, আলশামস ও আলবদররা আত্মসমার্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তারা সংখ্যায় ছিল বিপুল, প্রায় ৯০ হাজারের মতো। সেদিন দিনের বেলা প্রকাশ্যে বিকেল ৪টা ২১ মিনিটে পাকিস্তানি দানব নিয়াজি তার দলবল নিয়ে আমাদের যুক্তবাহিনীর জেনারেল অরোরার কাছে রমনা রেসকোর্সে আত্মসমার্পণ করেছিল। আর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ২৬শে মার্চ ঘোষিত স্বাধীন বাংলাদেশ পাকিস্তান দখলদারমুক্ত হয়েছিল।

উনিশ'শ একাত্তর থেকে দুই হাজার উনিশ সালের ষোলোই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের বিজয়ের ৪৯ বছর, প্রায় অর্ধশতাব্দী বছর। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে এই দীর্ঘ সময় চাট্টিখানি কথা নয়। একাত্তরে নিন্দুকেরা বলেছিল– 'মুজিব বাংলাদেশ স্বাধীন করলেও দীর্ঘস্থায়ী হবে না'। স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় একাত্তরের শত্রু সেসব নিন্দুকেরা দেশটাকে বিনাশ করার জন্য পঁচাত্তরে অপচেষ্টা চালিয়েছিল। বলা যায় মিনি পাকিস্তানে পরিণত করেছিল রক্তে অর্জিত বাংলাদেশকে।

এবারের বিজয় বার্ষিকী এসেছে মুজিববর্ষ পালনের প্রাক্কালে। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের সমূহ কর্মসূচি ঘোষণা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ সালের ১৭ই মার্চ পর্যন্ত বছরব্যাপী যথাযথভাবে আমরা বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) পালন করব। মুজিববর্ষ ঘোষণা এবং উদ্‌যাপন বাঙালির কাছে অহংকার ও শ্রদ্ধার বিষয়। উল্লেখ্য, ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার দক্ষিণী মহকুমা গোপালগঞ্জের জলেডোবা টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু জন্মগ্রহণ করে বাঙালির দুই হাজার বছরের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছিলেন। একাত্তরেও বন্দি মুজিব ছিলেন আমাদের মরণপণ লড়াইয়ের মহানায়ক।

আমাদের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির হাজার হাজার বছরের স্বাধীনতা-সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি। যার একক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জলেডোবা গ্রামটির শেখ মুজিব। যৌবনে পাকিস্তান স্বাধীনতার সংগ্রামে শরিক হয়েও ৩৬৫ দিনের মাথায় বুঝতে পেরেছিলেন মুসলিম লীগ স্বাধীনতা বাঙালিদের মুক্তির পরিবর্তে পাঞ্জাবিদের অধীনস্ত করেছে। পূর্ববাংলার মানুষকে শোষণ ও নির্যাতনের স্বাধীনতার নামে একটি পাকিস্তান ঔপনিবেশ সৃষ্টি করা। সাতচল্লিশের স্বাধীনতা ছিল তাই কৃত্রিম বা মেকি।

এ কারণেই শেখ মুজিব ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্বে নিজের হাতে গড়া ছাত্রলীগের সদস্য ও তমদ্দুন মজলিশের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে মাতৃভাষার শত্রুদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। অবশ্য তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়াশোনা করার সময়। সে সময় তিনি দীক্ষা পেয়েছিলেন শেরে বাংলা, সুভাষ বোস, শরতবসু, সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ও ভাসানীর কাছে। এরা ছিলেন বাঙালির ঐক্যবদ্ধ চিন্তাচেতনায় বিশ্বাসী। ১৯০৫ সালের বাংলা ভাগ এবং সাতচল্লিশে বাংলার পূর্বাংশের মেকি স্বাধীনতা চাননি। মূলত '৪৭-এর স্বাধীনতা ছিল বঙ্গভঙ্গকারী এবং তাদের উত্তরসূরিদের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধানোর ফল। তবুও আমাদের বাপদাদারা এ স্বাধীনতা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিমাদের শোষণ শুরু হলেই এদের প্রগতিশীল একটি অংশ পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য ১৯৪৯ সালে আওয়ামী (মুসলিম) লীগ নামে একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলেন এবং এই দলটির ছায়াতলে বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী মানুষজন জড়ো হয়ে স্বাধিকার অর্জনে সোচ্চার হন। শেখ মুজিব এই দলের প্রথমে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, পরে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্বপ্ন-সাধনা শুরু করেন।

১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গের নির্বাচনে বাঙালির বিপুল বিজয় ঘটে। যুক্তফ্রন্টের সেই নির্বাচনে এককদল হিসেবে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তিনবার সরকার গঠন করেও সেবার বাঙালি ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। ভুয়া অজুহাত দেখিয়ে প্রদেশে শেরেবাংলা, আবুল হোসেন সরকার ও আতাউর রহমান খান এবং কেন্দ্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সরকারকে বরখাস্ত করে পাকিস্তান শাসক ইস্কান্দার মির্জারা। সেবারই মুজিব বুঝতে পারেন, আর একত্রে থাকা নয়, বাঙালির আলাদা সত্তা নিয়ে বাঁচতে হবে। তাই তিনি প্রথমেই স্বাধিকার আদায়ের কর্মসূচি ৬ দফা ঘোষণা করেন। কিন্তু ফল হয় উলটো। সামরিক শাসক পাকিস্তান ভাঙার দায়ে অভিযুক্ত করে আগরতলা মামলা রজ্জু করেন। কিন্তু পূর্ববাংলার স্বাধীনতাকামী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে '৬৯-এ বিপ্লব ঘটে। বাধ্য হয়ে আইয়ুব মামলা প্রত্যাহার করেন।

বন্দি মুজিব মুক্ত হন এবং বাঙালির ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি লাভ করেন ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি। এরপরে পাকিস্তান মসনদ দখল করে আরেক পাকিস্তানি জেনারেল ইয়াহিয়া। এই লোকটি '৭০-এ নির্বাচন দিলে পুরো পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানি ইয়াহিয়া বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ২৫শে মার্চ '৭১-এ বাঙালিদের স্বাধিকারের খায়েশ পূরণ করে হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে। সমগ্র পূর্ববাংলায় পাকিস্তান সৈন্য দিয়ে মানুষ মারা শুরু করে। ইয়াহিয়ার আলোচনা ও ভাবগতি লক্ষ করেই বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজ বাসভবন থেকে ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে ইপিআরের ওয়ারলেসযোগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাঙালি জনগণকে দখলদার সৈন্যদের হটানোর লক্ষ্যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন, যা তিনি ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর ঘোষণার আলোকে ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করে ১৭ই এপ্রিল মুজিব নগরে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সামনে শপথ নিয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা হয়।

যুদ্ধকালে ভারত, ভুটান, রাশিয়াসহ বিশ্বের মানবতাবাদী রাষ্ট্র ও স্বাধীনতাকামী জনগণ আমাদের পাশে দাঁড়ায়। ভারত-রাশিয়া সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। ভারত আমাদের আশ্রয় দেয়, যুদ্ধের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে। রাশিয়া জাতিসংঘে আমাদের পক্ষে ভেটো প্রয়োগ করে। ইন্দিরা গান্ধী, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের জন্য গোটা বিশ্ব চষে বেড়ান। এজন্যই তিনি আমাদের একাত্তরের মিত্রমাতা। অপরদিকে পাকিস্তানিদের পক্ষে এবং আমাদের বিপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন– এই দুই পরাশক্তি দাঁড়ায়। ডিসেম্বরে মুক্তিযুদ্ধ চূড়ান্তরূপ নিলে আমরা পাকিস্তানি জাতিকে আক্রমণের আগেই ভারত-বাংলাদেশ যুক্ত বাহিনী গঠন করে। ভারতের পূর্বাংশে এই কম্বাইন্ড বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জেনারেল অরোরা। তখন মুক্তিবাহিনী সাড়াশি আক্রমণে পাকিস্তানিরা দিশেহারা। মিত্রবাহিনীতো আছেই। অবশেষে দখলদার পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের তাবেদাররা ষোলোই ডিসেম্বর ঢাল-সড়কি ফেলে আত্মসমার্পণ করে। মিত্রমাতা ইন্দিরা গান্ধীর একক প্রচেষ্টায় বঙ্গবন্ধু ফিরে আসেন পাকিস্তানি কারাগার থেকে ১০ই জানুয়ারি। সেদিনই আমাদের যুদ্ধের পরিপূর্ণ বিজয় ঘটে।

এরপর বঙ্গবন্ধু দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু একাত্তরের শত্রুরা তাঁকে বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে দেয়নি। পঁচাত্তরেই তাঁকে দেশি-বিদেশিদের গভীর ষড়যন্ত্রে সপরিবারে প্রাণ হারাতে হয়। প্রাণ হারান জেলখানায় তাঁর অনুচর ও সহকর্মীরা এবং মোহাম্মদপুরেও তেরোজন।

এরপর বাংলাদেশের একুশ বছরের ইতিহাস অন্ধকারে ঢাকা। মোশতাক, সায়েম, জিয়া, এরশাদ ও পুতুলমণি বাংলাদেশকে মিনি পাকিস্তানে পরিণত করে। একাত্তরের সকল অর্জন– সংবিধান, একাত্তরের চেতনা ও মুজিব আদর্শ চিরতরে বিসর্জন দেওয়া হয়। সে এক দুঃসময়। একাশিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে আমাদের দুঃসময় কাটতে শুরু করে। বন্ধ দুয়ার খুলে যায়। '৯৬-এর নির্বাচনের পরে একাত্তরের চেতনা ফিরে পায়। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার করা হয়। একাত্তরের খুনিরাও গলায় ফাঁসি পরে। মিনি পাকিস্তান বুড়িগঙ্গার কালো পানিতে হারিয়ে যায়। পাশাপাশি চলে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, খাদ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়। ভাষা আন্দোলনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, সমুদ্র বিজয়, সীমান্ত অঞ্চল ফিরে পাওয়াসহ পদ্মাসেতুর নির্মাণ– একাত্তরের বিজয়েরই দৃষ্টান্ত এবং তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলেই হয়েছে। দেশে কি কোনো খাদ্যাভাব আছে? আমাদের মাথাপিছু আয় ও রিজার্ভ বেড়েছে। একচল্লিশ সালে আমরা উন্নত দেশে পরিণত হবো। আর একবছর পরে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করে বিশ্বকে দেখাবো আমাদের একাত্তরের মহান বিজয়ের শক্ত অবস্থান।

কিন্তু আমরা কি স্বস্তিতে আছি? স্বাধীনতার শত্রুদের মাঝে মাঝে উৎপাত আমাদের জনজীবনের শান্তিকে বিঘ্নিত করে। কখনো তারা পেট্রোল বোমা মেরে মানুষ হত্যা করে, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে, গ্রেনেড হামলা করে বঙ্গবন্ধুর রক্তের ধারাকে চিরতরে বিনাশ করতে চায়। টেলিফোনের খাম্বা ও রেলের লাইন উপড়ে ফেলতে আমরা দেখেছি বিগত দিনে। আর কোনো যুক্তিসংগত দাবি-দাওয়া উপস্থাপিত হলে এই চক্রান্তকারী দল মানুষকে উসকে দেয়। শুধু তাই নয়– ব্যক্তি স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে মিথ্যে অপবাদ ও মিথ্যে সংবাদ ছড়িয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এই কিছুদিন আগে নিরীহ মানুষকে লবণের গুজব ছড়িয়ে জনজীবনকে অতিষ্ট করে তুলেছিল। এরাই একবার একাত্তরের এক মাওলানা ঘাতককে চাঁদের পিঠে চড়িয়েছিল। এরাই 'পদ্মাসেতু শিশুর রক্ত খেতে চায়'– এমন প্রচার প্রকাণ্ডা চালিয়েছিল। আসলে বাংলার মানুষ এসব একাত্তরের চিহ্নিত শত্রুদের অপকর্ম থেকে নিষ্কৃতি চায়। তাদের শক্ত হাতে বিনাশ না করা গেলে মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না।

আমাদের রক্তে ধোয়া বাংলাদেশ। এদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ স্বাধীনতাকামী মানুষ ও দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করেছি। আমাদের মিত্রবাহিনীরও হাজার হাজার সৈন্য প্রাণ দিয়েছে। আর সেই মরণপণ যুদ্ধের চেতনা নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলতে চায়, তারা জাতির শত্রু।

আমাদের বিজয়ের ৪৮ বছর। যারা একাত্তরে বলেছিল– বাংলাদেশ স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না। মিত্রবাহিনী দেশ গ্রাস করবে। পৃথিবীর কোনো দেশই স্বীকৃতি দেবে না। অচিরেই বিশ্বের মানচিত্র থেকে বাংলাদেশ উবে যাবে। আজ সেই সব দুর্মুখরা কোথায়? কিন্তু তাদের উত্তরসূরিরা আছে। তারা বিভীষণ ও মীরজাফরের ভূমিকাই পালন করে। আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অটল থেকে একটি সমৃদ্ধশালী দেশ গড়তে হবে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি সাহসই ওদের বিনাশে সহায়ক হবে। এই পরম মাহেন্দ্রক্ষণে একাত্তরে শহিদ ত্রিশ লক্ষ প্রাণ, দুই লক্ষ সম্ভ্রমহারা মা-বোন, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল মুক্তিযোদ্ধা, মিত্রসৈন্য, বঙ্গবন্ধু, তাঁর সহচর এবং পনেরোই আগস্টে নিহত সকল শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

বিজয় ফুল উৎসব

সানিয়াত রহমান

'বিজয় ফুল' নামে কোনো ফুলের নাম কি আমরা আগে শুনেছি। যে ফুল গাছে ধরে না অথচ ডিসেম্বর মাস এলেই ফোটে। ফোটে মানে ফুলটি বানাতে হয়। বাংলাদেশে বিজয় ফুলের ধারণাটা একেবারে নতুন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারীদের স্মরণে ব্রিটেনসহ আরো কয়েকটি দেশে পপি ফুল পরার চল দেখে 'বিজয় ফুল' ধারণা মূলত প্রবাসী জনৈক বাংলাদেশি কবির। ১৯৯৮ সাল থেকে 'বিজয় ফুল'-এর ধারণা প্রচার পেতে থাকে। এই প্রবাসী কবি তার একটি লেখায় উল্লেখ করেন এভাবে– 'কয়েক বছর আগে এক শীতার্ত নভেম্বর। হুইল চেয়ারে করে ব্রিটিশ রয়্যাল লিজিওনের হয়ে মহাযুদ্ধের স্মরণে টুকটুকে লাল কাগজের পপি বিক্রি করছিলেন ইংরেজ বৃদ্ধ টেড স্টকওয়েল। তিনি নিজেও ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ফেরত আহত সেনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পর বেলজিয়ামের প্রাণহীন বিশুষ্ক ভূমিতে ফুটেছিল লাল টুকটুকে পপি ফুল। সেই থেকে হাতে তৈরি পপি বিক্রি করা। বিক্রয়লব্ধ অর্থ মৃত সৈনিকদের সাহায্য করা।' এখন পাশ্চাত্যে তা এক বিশাল ব্যাপার। গত কয়েক বছরে যুক্তরাজ্য ছেড়ে এ কর্মসূচি ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন দেশে। যুক্তরাজ্যের ৩৯টি স্থানে বিভিন্ন সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ কর্মসূচি পালিত হয়। যুক্তরাজ্যের বাইরে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, সুইডেন, বেলজিয়াম, দুবাইসহ বিভিন্ন দেশে চলছে এই কর্মসূচি। হাতে তৈরি পপি বিক্রি করে এক ক্যানাডিয়ান নারী তার বিক্রয়লব্ধ অর্থে মৃত সৈনিকদের সন্তানের জন্য কিনেছিলেন প্রথম ক্রিসমাস উপহার। যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম প্রতিবছর ১১ই নভেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত তাদের বীর শহিদদের স্মরণে 'রিমেমব্রেন্স ডে' উদযাপন করে।

যেসব যোদ্ধা এবং সাধারণ মানুষ যুদ্ধে নিহত হয়েছে ঐ দিন ওদের স্মরণে পোশাকে সবাই লাল পপি ফুল ধারণ করে থাকে। বাংলাদেশের রয়েছে গৌরবের ইতিহাস। আমাদের বীর শহিদদের স্মরণে আমরাও শুরু করতে পারি। মুক্তিযুদ্ধে শহিদের পরিবার বা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সামান্য হলেও উপহার কিনে দেওয়া যেতে পারে নামমাত্র মূল্যে বিক্রিত বিজয় ফুলের অর্থ দিয়ে। বিজয় ফুল হোক আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের প্রতীক। 'বিজয় ফুল' হলো আমাদের জাতীয় ফুল 'শাপলা'। এই ফুলের ছয়টি পাপড়ি ও একটি কলি থাকবে। ফুলের ছয়টি পাপড়ি বঙ্গবন্ধুর ছয় দফাকে স্মরণ করবে এবং মাঝখানের কলিটি ৭ই মার্চের প্রতীক। রঙিন কাগজ কেটে আঠা লাগিয়ে এ ফুল তৈরি করতে হয়। যাদেরটা সুন্দর হবে তারা বিজয়ী ও পুরস্কৃত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'বিজয় ফুল' তৈরি, গল্প ও কবিতা রচনা, কবিতা আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, একক অভিনয়, চলচ্চিত্র নির্মাণ ও দলগত দেশাত্মবোধক জাতীয় সংগীত প্রতিযোগিতা আয়োজনের লক্ষ্য হলো নতুন প্রজন্মের কাছে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উপলব্ধি এবং সংগ্রাম ইতিহাস জানানো।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২০১৮ সাল থেকে এই আয়োজন শুরু করে। বিজয় ফুল প্রতিযোগিতাটি প্রতিবছর নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এ কমসূচি বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। ২০১৮ সালের ন্যায় এ বছরও স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ে দেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আন্তঃশ্রেণির মাধ্যমে শুরু করে উপজেলা, মহানগর, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় প্রতিযোগীদের মধ্যে থেকে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী নির্বাচিত করা হয়।

নিজেদের তৈরি করা বিজয় ফুল হাতে শিক্ষার্থীরা

পুরস্কার

প্রতিযোগিতার প্রতিটি পর্যায়ে ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকারীকে তাদের প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষরে সনদপত্র দেওয়া যেতে পারে। তবে প্রতিটি ইভেন্টের গ্রুপভিত্তিক (ক,খ ও গ গ্রুপ) প্রতিষ্ঠান প্রধান ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার/ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষরে সনদপত্র প্রদান করা যেতে পারে।

বিজয় ফুল উৎসব

'বিজয় ফুল' তৈরি ও অন্যান্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ১-১৬ই ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, উপজেলা, মহানগর, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে 'বিজয় ফুল উৎসব'– এর আয়োজন করা হয়। এ উৎসবে শিক্ষার্থীরা ফুল তৈরি, বিতরণ ও বিক্রি করে।

ফুলবন্ধু ডিজিটাল প্লাটফর্ম

এটুআই প্রকল্প ফুলবন্ধু ডিজিটাল প্লাটফর্ম কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। শিক্ষার্থীগণ এ প্লাটফর্মে যোগ দিয়ে ভার্চুয়াল 'বিজয় ফুল' এবং 'ফুলবন্ধু' গ্রুপ তৈরি করে।

উৎসবে অন্যান্য সহায়ক কার্যক্রম

১. এটুআই কর্তৃপক্ষ বিজয় ফুল উৎসব/বিজয় ফুল প্রতিযোগিতা উপলক্ষে তৈরি করা থিম সং ব্যবহার করে ৩০-৪০ সেকেন্ড ব্যাপ্তির একটি ভিজুয়্যাল/কনটেন্ট তৈরি করে। প্রস্তুতকৃত ভিজুয়্যাল/কনটেন্ট এটুআই কর্তৃপক্ষ ২০শে অক্টোবরের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ, সোশাল মিডিয়ায় আপলোড এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইটি আপলোডের জন্য কপি সরবরাহ করে।

২. তথ্য মন্ত্রণালয় প্রস্তুতকৃত অডিও-ভিজুয়াল/অভিজ্ঞ কনটেন্ট সরকারি এবং বেসরকারি সকল টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেলে প্রচারের ব্যবস্থা করে।

৩. শিল্পকলা একাডেমির সহায়তায় বাংলাদেশ টেলিভিশন বিজয় ফুল নির্মাণ প্রক্রিয়া/কৌশল সম্পর্কিত ভিডিও ফিল্ম তৈরি করে। তথ্য মন্ত্রণালয় বিটিভিসহ অন্যান্য চ্যানেলে এই ভিডিও ক্লিপ প্রচারের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ায় আপলোড করে থাকে।

৪. 'বিজয় ফুল'-এর থিম সং নিয়ে তৈরি টিভিসি এবং বিজয় ফুল তৈরির প্রক্রিয়া/কৌশল সংক্রান্ত টিভিসি/ভিডিও ক্লিপ টেলিভিশন ছাড়াও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের মাধ্যমে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রচার করা হয়।

৫. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত মহান বিজয় দিবসের সমাবেশ স্থল সাজসজ্জার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মিত বিজয় ফুল ব্যবহার করা হয়।

৬. মহান বিজয় দিবসে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে আয়োজিত শিশু-কিশোর সমাবেশে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের ইউনিফর্ম/ পোশাকে বিজয় ফুল পরিধান করে।

৭. দেশব্যাপী সকল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী, যুবসহ নাগরিকবৃন্দকে ১-১৬ই ডিসেম্বর ছোটো আকারের শাপলা ফুল/ কোট পিন বুকে পরিধান করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

৮. ব্যক্তি/ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগেও বিজয় ফুল/কোট পিন বানিয়ে বুকে পরিধানের জন্য বিক্রি করা হয়।

৯. প্রতিযোগিতার বাইরে ছাত্রছাত্রীবৃন্দ বিজয় ফুল/ কোট পিন বানিয়ে বিক্রি করে তহবিল গঠন করে।

কাগজ, কাপড়, প্লাস্টিক অন্য যে-কোনো সামগ্রী দিয়ে এ ফুল তৈরি করা হয়। এ প্রতিযোগিতায় থাকবে ৩টি বিভাগ। ক বিভাগ: শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত; খ বিভাগ: ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত। গ বিভাগ: নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।

শিক্ষার্থীদের তৈরি করা বিজয় ফুল

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিজ দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করা বীর শহিদ, শহিদ পরিবারের প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শন করা হয়। আমরাও পারি বিজয় ফুল দিয়ে আমাদের স্বাধীনতার বীরদের সম্মান জানাতে। এ উদ্যোগই নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

আজকের শিশুদের হাতেই গড়ে উঠবে সোনার বাংলা। তাদের হাতের তৈরি বিজয় ফুলে এদেশের গৌরবগাথা ছড়িয়ে যাবে– প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

আনোয়ারা উপন্যাসের শতবর্ষ

ড. মোহাম্মদ হাননান

সাহিত্যরত্ন মোহাম্মদ নজিবর রহমান তাঁর প্রথম উপন্যাস *আনোয়ারা* রচনা করেছিলেন ১৯১৪ সালে। মুদ্রণ পৃষ্ঠায় রয়েছে, '১৮ই মে ১৯১৪'। প্রকাশক ছিলেন মঈনুদ্দীন হুসাইন। প্রকাশনা সংস্থা: 'নূর লাইব্রেরী, ১২/১ সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা'। মুদ্রক পরিচিতি: 'পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, মেটকাফ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৪ মেছুয়া বাজার লেন, কলিকাতা'। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল, ৩৬০। বইয়ের সাইজ: ১/৮ ডিমাই। মূল্য: 'দেড় টাকা'।[১]

ঔপন্যাসিক বইটি উৎসর্গ করেছিলেন রাজশাহীর তৎকালীন একজন আইনজীবী 'মৌলবী মোহাম্মদ এমাদুদ্দিন আহমদ বিএ, বিএল'-কে। তিনি আবার জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন, মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনেরও সেক্রেটারি ছিলেন। উৎসর্গপত্রে তাঁর আরো বহুবিধ পরিচয় দেওয়া আছে। উৎসর্গ করতে গিয়ে নজিবর রহমান লিখেন, '...সাহেবের করকমলে সম্মানের চিহ্নস্বরূপ অর্পিত হইল'।[২]

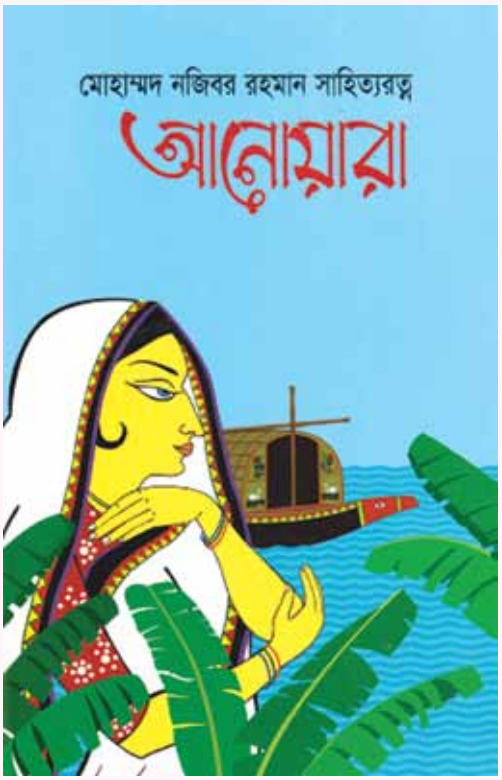

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে *আনোয়ারা* কোনো বিখ্যাত উপন্যাস নয়। মোহাম্মদ নজিবর রহমানও বিখ্যাত কোনো লেখক নন। এ মন্তব্য করা হলো, বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য বিচারের যেসব সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার ভিত্তিতে। কারণ নজিবর রহমান বা তাঁর সৃষ্ট *আনোয়ারা* বিশেষ কোনো অভিধায় এসব সমালোচনায় উল্লিখিত হয়নি। তবে পণ্ডিত-গবেষকদের মধ্যে এ উপন্যাস সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা প্রথম থেকেই ছিল, সম্ভবত আজ অবধি তা অব্যাহত আছে। সম্প্রতি বাংলা একাডেমি তাদের 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম' সংক্রান্ত একটি বিশেষ প্রকল্পের আওতায় শতবর্ষী এ উপন্যাসটি পুনর্মুদ্রণ করেছে। একশত বছরেরও বেশি সময় পূর্বে রচিত উপন্যাসটি সম্ভবত এ প্রথম 'জাতীয় মর্যাদায়' একটি আসন পেল।

এ প্রেক্ষাপটে মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের সামান্য পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। সংসদ *বাঙালি চরিতাভিধান*[৩]-এ তাঁর সম্পর্কে কোনো ভুক্তি নেই। *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*-এ নজিবর রহমান সম্পর্কে যা আছে:

> মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ১৮৬০ (আনুমানিক) সনে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের চরবেল তৈল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরে শাহজাদপুর ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ঢাকা নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। টিউশনি করে লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহ করেন। নর্মাল পাস করার পর জলপাইগুড়িতে একটি নীলকুঠিতে কিছুদিন চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। পরে শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রথম সিরাজগঞ্জের ভাঙ্গাবাড়ি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব পালন করেন। কারো কারো মতে, মধ্যবাংলা মডেল ছাত্রবৃত্তি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন দিয়ে তাঁর শিক্ষকতা জীবন শুরু হয়। শিক্ষকতার পাশাপাশি ভাঙ্গাবাড়ি ডাকঘরের পোস্টমাস্টার পদেও তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
>
> পরে তিনি চলে যান সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জের সলঙ্গায়। সেখানে মাইনর স্কুলের ডে পণ্ডিত হিসেবে যোগদান করেন। স্কুলটি পরে হাটিকুমরুল গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। নজিবর রহমান পরে এখানে নিজের স্থায়ী বসতবাড়িও নির্মাণ করেন।
>
> ১৯১০ সনে তিনি রাজশাহী জুনিয়ার মাদরাসার বাংলার শিক্ষক পদে যোগদান করেন। তাঁর নিজ গ্রাম চরবেলতৈলে একটি মক্তব ১৮৯২ সনে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা পরবর্তীকালে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল।[৪]

নজিবর রহমানের সাধারণ পরিচয় মোটামুটি এরকমই। কিন্তু তিনি যে অনেক সামাজিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছেন তার কিছু আমরা স্কুল নির্মাণ ও অন্যান্য বিষয়ে পাই। যখন সলঙ্গায় চলে যান সেখানে এক বড়ো সামাজিক আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এলাকার ইতিহাসে যা এখনো অম্লান হয়ে আছে। সলঙ্গা এমনিতেই ছিল একটি আন্দোলন ও সংগ্রামমুখর অঞ্চল। উপমহাদেশের এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মাওলানা আবদুল রশিদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বে ১৯২২ সনে সলঙ্গায় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, যা 'সলঙ্গা বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। আমরা আঞ্চলিক ইতিহাসে দেখি, মোহাম্মদ নজিবর রহমান তারও আগে সলঙ্গায় জমিদারদের নির্যাতন ও নিবর্তনের বিভিন্ন ঘটনার বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সলঙ্গায় জমিদাররা গরু জবাই নিষিদ্ধ করেছিল। নজিবর রহমান এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। কিন্তু জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনীর কাছে তিনি হার মানতে বাধ্য হন। শুধু তাই নয়, তাঁকে স্থায়ীভাবে সলঙ্গা ত্যাগ করতে হয়েছিল। তিনি পরে স্থায়ী বাসিন্দা হন সলঙ্গা থেকে তিন মাইল দূরবর্তী হাটিকুমরুল গ্রামে। সেখানেও তিনি গিয়ে শিক্ষকতা পেশাই বেছে নেন।[৫] তবে নজিবর রহমানের সংগ্রাম বিফলে যায়নি। সলঙ্গায় গরু জবাইয়ের অধিকার শেষ পর্যন্ত সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬]

তবে সামাজিকভাবে সমগ্র বঙ্গে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর কালজয়ী উপন্যাস *আনোয়ারা* অথচ লেখকের জন্ম তারিখ, এমনকি মৃত্যু তারিখ সম্পর্কেও গবেষক, সমালোচকরা একমত নন। তাঁর সম্পর্কে জানার তথ্য কিছুটা অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী বাংলা অনেক অখ্যাত এবং সাধারণ পরিচিত লেখক-কবিরও জন্ম এবং মৃত্যু তারিখ যথাযথভাবে গ্রন্থিত আছে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে নজিবর রহমানের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ নিয়ে প্রচুর মতান্তর দেখি:

১. *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*:[৭]
জন্ম: ১৮৬০ [আনুমানিক]
মৃত্যু: ১৮ই অক্টোবর ১৯২৩
[১লা কার্তিক ১৩৩১]

২. ড. মুহম্মদ এনামুল হক:[৮]
জন্ম: ১৮৭৮
মৃত্যু: ১৯২৩

৩. মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন:[৯]
জন্ম: ১৮৫২
মৃত্যু: ১৯২৫

৪. ড. গোলাম সাকলায়েন:[১০]
জন্ম: ১৮৪৭
মৃত্যু: ১৮ই অক্টোবর ১৯২৩

৫. আনিসুজ্জামান:[১১]
জন্ম: ১৮৬০
মৃত্যু: ১৯২৩

৬. ড. মযহারুল ইসলাম:[১২]
জন্ম: ১৮৫৪ থেকে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ [এর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে]
মৃত্যু: ১৯২২ কিংবা ১৯২৩

৭. খন্দকার মো. বশির উদ্দিন:[১৩]
জন্ম: ১৮৬০
মৃত্যু: ১৯২৫

৮. জুলফিকার মতিন:[১৪]
জন্ম: ১৮৬০ [এর পূর্বে কোনোক্রমেই নয়]
মৃত্যু: ১৯২৫

বাংলা সাহিত্যের আর কোনো লেখক-কবির জন্ম ও মৃত্যু তারিখ নিয়ে এতটা মতান্তর আছে বলে মনে হয় না। এতে মনে হতে পারে, নজিবর রহমান খুব স্বল্প পরিচয়ের ছিলেন অথবা খুব বেশি প্রচার বিমুখতার কারণে নীরবে-নিভৃতে ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদপত্রে কোনো খবর হয়ে এসেছিল এমনটাও মনে হয় না। তবে এটা অবিশ্বাস্য যে, যাঁর উপন্যাস সে আমলেই লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে, বাংলার শিক্ষিত স্বল্প-শিক্ষিত মুসলিম পরিবারের ঘরে ঘরে পঠিত হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মীর মশাররফ হোসেনের *বিষাদসিন্ধু*-কেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে উপন্যাস *আনোয়ারা*, তার লেখক এতটা বেশি অপ্রকাশিত, অপ্রচারিত থেকেছেন, এ অঙ্কটা সমালোচকের কলমে মেলে না। এ প্রসঙ্গে মনীষী কাজী মোতাহার হোসেনের একটি মন্তব্য, যা তিনি *আনোয়ারা* উপন্যসের কাটতি বিষয়ে করেছিলেন তা এখানে স্মর্তব্য:

> সম্প্রতি এ বই-এর ত্রয়োবিংশতি সংস্করণ কলিকাতা ৩০ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রীটস্থ ওসমানিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।... জানা গেছে, এ যাবত 'আনোয়ারা'-র প্রায় দেড় লক্ষ কপি নিঃশেষিত হয়েছে। বোধহয় একমাত্র 'বিষাদসিন্ধু' ছাড়া আর কোনো বাংলা বই-এর এত কাটতি হয়নি।[১৫]

প্রকৃতপক্ষে, কাজী মোতাহার হোসেনের এই মূল্যায়নে কোনো অতিশয়োক্তি ছিল না। এটা বাস্তব যে ব্রিটিশ আমলে এ দেশের বাংলার মুসলিম সমাজে ঘরে ঘরে *আনোয়ারা* পঠিত ছিল। কাজী মোতাহার হোসেন *বিষাদসিন্ধু*-র সঙ্গে এর একটি তুলনা করেছেন, কিন্তু *আনোয়ারা* সম্ভবত *বিষাদসিন্ধু*-র জনপ্রিয়তা ও পাঠক প্রিয়তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। *বিষাদসিন্ধু* কিছু উচ্চমার্গের রচনা ছিল এবং সকল পাঠকের পাঠ করে তা বোঝা আয়াস সাধ্য ছিল না। *বিষাদসিন্ধু*-র প্রধান আকর্ষণ ছিল ইমাম হোসেন (রা.)-এর নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিল্পকুশল বর্ণনা, যা পাঠক চিত্তকে আলোড়িত করে। কিন্তু অন্যান্য অধ্যায় সাধারণ পাঠকের জন্য কঠিনতর ছিল। কিন্তু *আনোয়ারা*-র প্রধান আকর্ষণ ছিল একজন মুসলিম বালিকার প্রেম। পর্দার মধ্যে থেকেও একজন মুসলিম নারী কীভাবে প্রেমে পড়ে যেতে পারে, তা তৎকালীন বিবাহিত-অবিবাহিত সকল মুসলিম বালিকাকে আকর্ষণ করেছিল। মুসলিম নারীর দাম্পত্য জীবন কেমন হতে পারে তারও সুঢৌল বর্ণনা ছিল *আনোয়ারা* উপন্যাসে। ফলে *আনোয়ারা* ঘরে ঘরে বালিকা থেকে বালিকায়, তৎকালীন তরুণ প্রজন্মে এবং সদ্য বিবাহিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়। এমনকি সে সময়ে মুসলিম নারীর বিয়েতে 'উপহার' হিসেবেও জ্যেষ্ঠরা একখানা *আনোয়ারা* নিতে ভুলতেন না।[১৬]

এ পর্যায়ে এসে আমরা মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন-এর অন্যান্য রচনা কর্মের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেখতে পারি। এতে দেখা যাবে, মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের ষাটের অধিক বয়স পর্যন্ত জীবৎকালে মাত্র আটটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। অনেক গবেষক এর চেয়েও অধিক সংখ্যক রচনার কথা উল্লেখ করেছেন, যদিও তার অনেকগুলোর একটি কপিও সন্ধান পাওয়া যায়নি, তথাপি আটটি মূল গ্রন্থের তালিকা অনেকটা নিম্নরূপ:

ক্র. ন.	গ্রন্থের নাম	প্রকাশকাল	মন্তব্য
১.	সাহিত্য প্রসঙ্গ	১৯০৪	প্রবন্ধ গ্রন্থ
২.	বিলাতী বর্জ্জন রহস্য	১৯০৪	প্রবন্ধ গ্রন্থ [ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত]
৩.	আনোয়ারা	১৯১৪	উপন্যাস
৪.	চাঁদ-তারা বা হাসন-গঙ্গা বাহমণি	১৯১৭	উপন্যাস
৫.	প্রেমের সমাধি	১৯১৮	উপন্যাস
৬.	পরিণাম	১৯১৮	উপন্যাস
৭.	গরীবের মেয়ে	১৯২৩	উপন্যাস
৮.	দুনিয়া আর চাই না	১৯২৪	উপন্যাস

একজন গবেষক, 'পুণ্যস্মৃতি : কুতুদ্দীন আয়বক' শিরোনামে একটি প্রবন্ধের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত *ইসলাম প্রচারক* পত্রিকায়। ১৯০১ সনের জুলাই-আগস্ট সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়।[১৭]

মোহাম্মদ নজিবর রহমানের সাহিত্য মানস গড়ে ওঠার পেছনে ছিল তাঁর সংগ্রামশীল জীবন। তাঁর জয়েনউদ্দিন সরকার (মাতা ছিলেন সোনাভান বিবি) আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিলেন না। কৃষি জীবনই পিতার মূল পেশা ছিল। নজিবর রহমানের সহোদররাও কৃষক জীবনকে বেছে নেয়। কিন্তু মেধাবী নজিবর রহমান গ্রামের পাঠশালায় কৈশোর থেকেই মেধার পরিচয় দেন এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন। জেলাওয়ারি মাসিক বৃত্তি লাভ তাঁর সম্বন্ধে পরিবারের সদস্যদের ভাবান্তর ঘটায়। তাঁর চাচা ময়েনউদ্দিন সরকার ছিলেন মসজিদের ইমাম এবং একইসঙ্গে পুঁথি সাহিত্য অনুরাগী। তিনি শাহজাদপুরে আরো শিক্ষালাভে নজিবর রহমানকে ভর্তি করে দেন। এখানে নজিবর রহমানের নতুন জীবন শুরু হয়। জায়গির থেকে পড়াশুনা এবং একইসঙ্গে সাহিত্য-অনুরাগী জায়গিরদারের কাছ থেকে উর্দু ও ফারসি সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ তাঁর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। নজিবর রহমানের সাহিত্যিক হিসেবে গড়ে ওঠার পেছনে এ ঘটনা প্রভূত ভূমিকা রাখে।

এ সময় তাঁর পিতার মৃত্যুর হয়। পরিবারের হাল ধরতে নজিবর রহমান গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষকতা শুরু করেন। কিন্তু পূর্বের জায়গিরদার নজিবর রহমানকে ঢাকায় এনে নর্মাল স্কুলে ভর্তি করে দেন। জায়গিরদার মহোদয় ছিলেন শাহজাদপুর স্কুলের ফারসি ভাষার শিক্ষক। তিনি নজিবর রহমানের প্রতিভা সম্বন্ধে আঁচ করতে পেরেছিলেন। ঢাকার নর্মাল স্কুল নজিবর রহমানের জীবনে বড়ো ধরনের বাঁক পরিবর্তন করে দেয়। কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি এখান থেকে পাস করে বের হন এবং 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি লাভ করেন।[১৮] কেন তিনি 'সাহিত্যরত্ন' উপাধি লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে পরবর্তীকালে এ উপাধি তাঁর নামের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

গবেষকরা মনে করেন, নজিবর রহমান বাংলার প্রখ্যাত কবি রজনীকান্ত সেনের ভাবাদর্শে লালিত ছিলেন।[১৯] উভয়েই সিরাজগঞ্জের সন্তান ছিলেন। নজিবর রহমান ছিলেন শাহজাদপুর থানার চরবেলতৈল গ্রামের আর রজনীকান্ত সেন ছিলেন পাশের থানার বেলকুচির ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামের। নজিবর রহমানের সঙ্গে ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামেরও স্মৃতি রয়েছে। রজনীকান্ত সেন লিখেছিলেন, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই', নজিবর রহমান লিখেছিলেন, 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য'। তবে 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৪ সনে, আর 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৬ সনে, বঙ্গভঙ্গের পরপর।

১৯১০ সনের অল্প আগে নজিবর রহমান সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। তাঁর পদায়ন হয়, রংপুর নর্মাল স্কুলে। সেখান থেকে তিনি চলে যান রাজশাহী সরকারি মাদরাসায়। রাজশাহী সরকারি মাদরাসায় শিক্ষকতা কালে তাঁর জীবনের দুটো বড়ো ঘটনা ঘটে। একটি এ সময় তিনি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (পরে কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা)-কে বিয়ে করেন। অন্যটি *আনোয়ারা* উপন্যাস রচনা। নজিবর রহমানের *আনোয়ারা* উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে লেখকের পরিচিতি– ঠিকানায় রাজশাহী মাদরাসার নাম উল্লিখিত রয়েছে।

আনোয়ারা প্রকাশিত হওয়ার পর সমাজ-সাহিত্যে নানারকম প্রতিক্রিয়াই হয়েছে। পাঠক প্রিয়তা পেলেও *আনোয়ারা* সমালোচকদের কঠিন মন্তব্যের সম্মুখীন হয়। কেউ কেউ ব্যক্তিগত অনুভূতি, কেউ কেউ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও *আনোয়ারা*কে বিশ্লেষণ করতে থাকেন। এর মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের সমালোচকরাই ছিলেন। কেউ কেউ *আনোয়ারা*য় ব্যবহৃত ভাষারও সমালোচনা করেছেন। কেন 'জল' না লিখে 'পানি' লেখা হলো সেই প্রশ্নও তারা তুলেছেন। *মাসিক প্রবাসী* (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত)-তে লেখা হয়েছিল :

> ...বইখানি অনাবশ্যক দীর্ঘ হইয়াছে। উপন্যাস রচনায় সফলকাম হইতে হইলে উপরিল্লিখিত ত্রুটিগুলির দিকে খুব নজর রাখিতে হইবে।
>
> গ্রন্থকারের ভাষায় এমন কয়েকটি কথা ব্যবহৃত হইয়াছে যা বাংলা ভাষায় অচল। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি– তিনি জল না লিখিয়া লিখিয়াছেন 'পানি'। বাংলায় 'জল' লিখিতে হইবে, 'পানি' বাংলা নয়।
>
> ...যে কোনো ইংরেজী, সংস্কৃত বা পারসী শব্দ বাংলা অক্ষরে লিখিলেই বাংলা হইবে না। সে শব্দগুলির চলতি হওয়া চাই।[২০]

তবে ভাষা নিয়ে প্রশংসাও ছিল। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখাল রাজ রায় সম্পাদিত *সাহিত্য পঞ্জিকা* মন্তব্য করে:

> মৌলভী মোহাম্মদ নজিবর রহমান।...*আনোয়ারা* নামে ইনি একখানি সামাজিক উপন্যাস লিখিয়াছেন। পুস্তকখানির ভাষা ও লেখা অতি সুন্দর। এই একখানি পুস্তকেই গ্রন্থকারকে অমর করিয়াছে।[২১]

অবশ্য কঠিন সমালোচনার শিকার হতে হয়েছিল মুসলিমদের পত্রিকা থেকে। মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা *আনোয়ারা* উপন্যাসকে খুব ভালোভাবে নিতে পারেননি। এর মধ্যে কবি গোলাম মোস্তফা অন্যতম, তিনি *বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায়* লেখেন:

> ইহা একখানি স্ত্রী পাঠ্য উপন্যাস।[২২]

নজিবর রহমানের উপন্যাসটি একেবারেই শুধু নারী জাতির পাঠ্য, পুরুষের জন্য একেবারেই নয়, তাই এটি তো আর কোনো সাহিত্য হলো না– এমনটাই নানা কায়দায় বলার চেষ্টা করেছেন গোলাম মোস্তফা। এ উপলক্ষে তিনি সকল মুসলিম লেখকদেরই ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলেন,

> মুসলমান লিখিত যে কয়খানি উপন্যাস বাজারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় কোনখানিই উপন্যাস হিসাবে ভাল হয় নাই, ইহাই আমার ধারণা। কি প্লটে, কি চরিত্র সৃষ্টিতে, কি মনস্তত্ত্ব (Psychical Phenomeha) বিশ্লেষণে, কি বর্ণনা কৌশলে, কি নূতনত্বে, প্রায় কোন উপন্যাসই প্রতিযোগিতায় হিন্দু-উপন্যাসের পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারে না।[২৩]

কবি গোলাম মোস্তফা আসলে ছিলেন উপন্যাস-সাহিত্যেরই বিরোধী। সুতরাং নজিবর রহমান বা *আনোয়ারা* তো আলোচনার যোগ্যই হতে পারে না। তিনি বলছেন,

> উপন্যাস লইয়া আমাদের সমাজের রুচি-বিরোধ ঘটিয়েছে। একদল ইহার ঘোর বিরোধী, অপরদল ইহার ঘোর পক্ষপাতী। যাঁহারা বিরোধী, তাঁহারা উপন্যাসকে 'রাবিশ' আখ্যা দিয়াছেন।... কথাগুলো সর্ব্বৈর্ব সত্য না হইলেও অংশত সত্য বটে;
>
> ...আদর্শ বিহীন উপন্যাসের আমরা আদৌ পক্ষপাতী নহি। এই শ্রেণির 'রাবিশ' উপন্যাস বাস্তবিকই কুফল প্রসব করিয়া থাকে। যিনি তাহার উপন্যাসে আখ্যান বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিতে না পারিবেন, তিনি যেন উপন্যাস না লেখেন।[২৪]

সমালোচক হিসেবে কবি গোলাম মোস্তফা এই যে অনেক 'নীতিকথা' বললেন, তার স্বরূপটি একটু পরেই আবিষ্কৃত হবে। *আনোয়ারা* উপন্যাসে 'আনোয়ারা' চরিত্রটির ঔজ্জ্বল্য তিনি অস্বীকার করতে পারেননি:

> আনোয়ারা চরিত্র মুসলমানী কায়দায় সুন্দররূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে,...তাহার চরিত্রে আমরা আদর্শ পতিভক্তি, ধর্ম্মপ্রণেতা, গুরুজনের প্রতি সম্মান, রন্ধন নৈপুণ্য ইত্যাদি নারী ধর্মের সর্বগুলিই পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাই।...
>
> বস্তুতঃ মুসলমানের কুলবধূ যেরূপ হওয়া উচিত, লেখক আনোয়ারাকে সেইরূপভাবেই অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।[২৫]

কিন্তু তাঁর (সমালোচকের) রাগ অন্যত্র। উনিশ শতকে 'নাকউঁচা' মুসলিম সম্প্রদায়ের তথাকথিত আভিজাত্য আশরাফ-আতরাফ দ্বন্দ্ব তাঁর সমালোচনায় প্রতিফলিত হতে দেখি:

> কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েক স্থানে আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারি নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, প্রথমতঃ নূরুল ইসলামের সহিত আনোয়ারার সাক্ষাৎ-ব্যাপারে। 'পূর্ব পারে একখানি পানসী নৌকা পাট ক্রয়ের নিমিত্ত লাগান রহিয়াছে' দেখিয়াও আনোয়ারা

> তাহাদের খিড়কীর দ্বারে বসিয়া বন্যার জলে (অনতিবিস্তৃত খালের জলে?) অজু করিতে লাগিল– ইহা কোন আশরাফ (সম্ভ্রান্ত) মুসলমান ঘরে সম্ভব না। ...এরূপ অনাবৃত স্থানে বয়স্কা মুসলমান বালিকা অজু করিতে সঙ্কোচ বোধ করে। যদি না করে, তবে বলিতে হইবে সে বেহায়া।[২৬]

সমালোচনার ধার পাঠক লক্ষ করুন, একেবারে চাঁচাছোলা। কোনো রাখ-ঢাক নেই। নজিবর রহমান কলকাতার নাগরিক জীবন থেকে অনেক দূরের গ্রামের স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর হাতে রচিত হয়েছে এক অমর উপন্যাস। উৎসাহ পাওয়ার কথা অগ্রসর মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে, কিন্তু পাচ্ছেন তিরস্কার, যেমন করে অস্ত্রের সাহায্যে আবরণ বা ছাল উঠিয়ে ফেলা হয়, ঠিক যেন তেমনটাই। গ্রামের শিক্ষক-লেখক নজিবর রহমানের তা পাওনা ছিল না। অন্যত্র, সমালোচনাকে দেখি আরো ভারি হয়ে উঠতে:

> বিবাহের পূর্ব্বে আনোয়ারা কর্তৃক তাহাদের বৈঠকখানা হইতে ভুলক্রমে পরিত্যক্ত নূরুল ইসলামের চটিজুতা গ্রহণ ও উহার বাক্সে সংরক্ষণ। ইহা কেমন আশরাফী? লেখক উক্ত চটিজুতা আনোয়ারার সিল্ক রুমালে জড়াইয়াছেন বটে। কিন্তু তবুও এ স্থলে তিনি যে কুরুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমরা উক্ত রুমালের চাকচিক্যে ভুলিয়া যাইতে পারি না।...যাহা আশরাফী ধারণার সহিত খাপ খাইতে চাহে না।[২৭]

এত গেল মুসলিমদের মধ্যকার আন্তঃশ্রেণিচেতনার বিস্ফোরণ। এক্ষেত্রেও সমালোচকের স্ববিরোধিতা লক্ষ করি। 'আশরাফী' অভিজাত মুসলিমের দৃষ্টিতে নারী ভাবী-স্বামীর জুতো সযত্নে সংরক্ষণ করেছে দেখে তো খুশী হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা হয়নি, উলটো এরূপ দৃশ্য রূপায়নের কারণে ঔপন্যাসিক অভিযুক্ত হয়েছেন। এমনকি নায়ককে প্রথমবারের মতো দেখে আনোয়ারার চিত্তে যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল, আর ভাবাবেগে তাঁর জ্বর এসে গিয়েছিল, সেই জ্বর কেন আসল, এমন উদ্ভট প্রশ্নও সমালোচনায় করা হয়েছে:

> ...অজু করিতে করিতে নূরুল ইসলামের সহিত আনোয়ারার সেই যে প্রথম সাক্ষাৎ ব্যাপারে– সেই যে চারি চক্ষুর সম্মিলন– তার সঙ্গে সঙ্গেই Then and there আনোয়ারার জ্বর ও শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইবার কথা নিতান্তই হালকা এবং আর্টশূন্য।... বলি জ্বর ও শিরঃপীড়া কি পূর্ব্ব হইতেই অর্ডার দেওয়া ছিল? সাবাস! নিমেষের দেখাতেই এই! আর না জনি আলাপ হইলে কি হইত?...
>
> ধর্ম্ম ও সমাজের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ওরূপ পূর্ব্ব বিবাহ-প্রেম আদৌ সমর্থন যোগ্য নহে। উহা পাশ্চাত্য রীতি।[২৮]

লেখক নজিবর রহমান ও তাঁর সৃষ্টি *আনোয়ারা* উপন্যাসের প্রতি এমন কটাক্ষ ও তাচ্ছিল্য থেকে উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের মুসলিম ব্রাত্যজনদের অপরিপক্কতা ও পারস্পরিক দ্বেষ আমাদের কাছে উদঘাটিত হয়। গ্রামে পড়ে থাকা একজন উঠতি মুসলিমের কলকাতাকেন্দ্রিক মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে সমর্থন, সহযোগিতা ও উৎসাহ পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমরা দেখি, *আনোয়ারা* উপন্যাসকে সকল দিক থেকেই পরিত্যাজ্য জ্ঞান করা হয়েছে। নজিবর রহমান উপন্যাসের এক জায়গায় রূপকের ছলে লিখেছিলেন, আনোয়ারা, 'রূপার খাটে বসিয়া সোনার আলনায় চুল' শুকায়। সমালোচক একেও ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'রূপার খাটে বসিয়া সোনার আলনায় চুল শুকান– ইত্যাদি ব্যাপার রূপকথার সেই রাজকন্যাতেই ভাল মানায়।... লেখক যদি আনোয়ারাকে রূপার খাটে এ সোনার আলনা নাও দিতেন, তবুও তাহার বসিবার বা চুল শুকাইবার ব্যাঘাত ঘটিত বলিয়া মন হয় না। প্রিয় প্রাঠক-পাঠিকা কি বলেন'?[২৯]

এত একটি অপ্রাসঙ্গিক সাহিত্য-সমালোচনা হলো। কিন্তু সমালোচককে হঠাৎ মুসলিম থেকে বাঙালি হয়ে যেতে দেখি। লিখেছেন তিনি, 'আনোয়ারার পিতৃভক্তির আমরা মোটেই পরিচয় পাইলাম না। ...ইহা খাঁটি বাঙালি নারী চরিত্র নহে'।[৩০]

সমালোচক হিসেবে কবি গোলাম মোস্তফার এরূপ আচরণের প্রতিক্রিয়া নজিবর রহমান কীভাবে নিয়েছিলেন তা বিশেষভাবে জানা যায় না। নিশ্চিতভাবে আমরা অনুমান করতে পারি, এসব ঘটনা তাঁর জন্য সুখকর ছিল না। তবে এর পাশাপাশি অন্যকিছু সমালোচনা যা হিন্দু লেখক-সম্পাদকদের কাছ থেকে হয়েছিল, তা লেখকের জন্য নিঃসন্দেহে ছিল প্রণোদনামূলক। ইতঃপূর্বে *সাহিত্য পঞ্জিকা* (১৩২২ সনের)-র একটি সংখ্যায় *আনোয়ারা* উপন্যাসের 'ভাষা ও লেখা অতি সুন্দর' বলে স্তুতি করার কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে। ১৩২২ খ্রিষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় *মাসিক প্রবাসী* ভাষা বিষয়ে দুএকটি সমালোচনা করলেও উপন্যাসটির সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে লিখেছিলেন, 'গ্রন্থকার বাঙালী মুসলমান পরিবারের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা বাঙালী হিন্দু পরিবারের চিত্রও হইতে পারিত, পার্থক্য বিশেষ নাই'।[৩১] এ মন্তব্য *আনোয়ারা* উপন্যাসের সর্বজনীনতাকে স্বীকৃতি দেয়। প্রকৃতপক্ষে, নজিবর রহমান *আনোয়ারা* উপন্যাসে বাঙালি জীবনচিত্রই রূপায়িত করেছেন, তা আঁচ করতে পেরেই পূর্বোক্ত মুসলিম সমালোচক *আনোয়ারার* উপর এতটা খড়গহস্ত হয়েছিলেন।

আনোয়ারা উপন্যাস পাঠ করার পর রাজশাহী কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক পঞ্চানন ভট্টাচার্য লেখক নজিবর রহমানকে একটি চিঠি লিখেন। চিঠিটি পাঠক দেখতে পারেন,

> আপনার *আনোয়ারা* পড়িলাম। শুধু নভেল পড়ার মতো পড়ি নাই, সবিশেষ মনোযোগ দিয়াই পড়িয়াছি। পুস্তকখানির ভাষা খাঁটি বঙ্গভাষা, মুসলমানি ভাষা আদৌ নহে। তবে আপনি মধ্যে মধ্যে অনেকগুলো ফার্সি কথাও ব্যবহার করিয়াছেন– যথা আম্মাজান (শাশুড়ি), কলেজা (হৃদপিণ্ড), দুলামিয়া (জামাতা), বরকত (আয়, উন্নতি), খোস এলহান (সুমধুর স্বরে) প্রভৃতি।
>
> হিন্দু পাঠকদের নিকট এই সকল শব্দ অবোধ্য হলেও এই সকল শব্দ ব্যবহারে আদৌ অন্যায় হয় নাই। কারণ মুসলমান সমাজে এই সকল শব্দ নিত্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মনে রাখতে হবে যে, বাঙ্গালা শুধু হিন্দুর ভাষা নহে– মুসলমানের মাতৃভাষাও বটে।[৩২]

চিঠিটির ভাষ্য অনেকগুলো প্রশ্নের মীমাংসা করে দেয়। এক. বোঝা যায়, *আনোয়ারার* ভাষা সমকালে বিশেষভাবে আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। পঞ্চানন ভট্টাচার্য এতে অংশ নেন এবং লেখকের পাশে দৃঢ়তার সঙ্গে অবস্থান গ্রহণ করেন। দুই. আরেকটি বিষয় পরিষ্কার হয়, তাহলো *আনোয়ারা* শুধু মুসলিম সামাজিকদের ঘরে ঘরেই নয়, হিন্দু-মুসলিম সকল বাঙালির ঘরেই তা প্রবেশ করেছিল এবং সকল শ্রেণির পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় উপন্যাস হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

শেষ করার পূর্বে *আনোয়ারা* উপন্যাসের প্রথম অনুচ্ছেদ এবং শেষ অনুচ্ছেদ থেকে দুটো উদ্ধৃতি দেব, যেসব পাঠকের হাতে উপন্যাসটি নেই, তারা এর গঠনশৈলী, বর্ণনারীতি ও শিল্পরূপকে খানিকটা হলেও উপলব্ধি করতে পারবেন।

এক. গ্রন্থের প্রথম অনুচ্ছেদ

> ভাদ্র মাসের ভোরবেলা। স্বর্গের উষা মর্তে নামিয়া ঘরে ঘরে শান্তি বিলাইতেছে; তাহার অমিয় কিরণে মেদিনী-গগন হেমান্ত বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গের নিম্ন সমতল গ্রামগুলি সোনার জলে ভাসিতেছে; কর্ম্মজগতে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে;

ছোটবড় মহাজনী নৌকাগুলি ধবল পাখা বিস্তার করিয়া গন্তব্য পথে উষাযাত্রা করিয়াছে; পাখিকূল সুমধুর স্বরলহরী তুলিয়া জগৎপতির মঙ্গল গানে তান ধরিয়াছে। ধর্ম্মশীল মুসলমানগণ প্রাভাতিক নামাজ অন্তে মসজিদ হইতে গৃহে ফিরিতেছেন। হিন্দু-পল্লীর শঙ্খ-ঘণ্টা রোল থামিয়া গিয়াছে।[৩৩]

উপন্যাসের প্রারম্ভেই লেখক এরকম একটা চিত্রল পরিবেশে গড়ে তোলেন, যা আসন্ন ঘটনাসমূহের দ্বারকে উন্মোচন করে দেবে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সামাজিক উপন্যাস *কৃষ্ণকান্তের উইল* অথবা বিষবৃক্ষ, যে-কোনো একটির সঙ্গে তুলনা করলেই *আনোয়ারা* উপন্যাসের এ ভাষা সৌকর্যের বিশিষ্টতা অনুভব করা যাবে।

দুই. গ্রন্থের শেষ অনুচ্ছেদ

আনোয়ারা: ... তুমি সে সময় চিকিৎসা না করিলে, ঐ অবস্থায় আমার মৃত্যু ঘটিত।...

নূরুল: তাই ত' দেখিয়াছি, কিন্তু লক্ষ টাকার জান বাঁচাইয়া তাহার পুরস্কার ত' পাই নাই।

আনোয়ারা: কেন? যাহা যত্ন করিয়া রক্ষা করিয়াছ, তাহা সমস্তই তোমাকে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নূরুল: সে ত মূলধন; কিন্তু উপরি লাভ কই?

আনোয়ারা কি যে মনে করিয়া 'আজ দিব' বলিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

'তবে এখনই দাও' বলিয়া নূরুল সোৎসাহে মস্তক অবনত করিলেন। আনোয়ারা বিদ্যুৎবেগে নিজ মস্তক উত্তোলন করিয়া 'তবে এই নাও' বলিয়া হাসিতে হাসিতে সাদরে স্বামীর মুখ-চুম্বন করিয়া মধুরে উপরি লাভ প্রদান করিল।[৩৪]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গল্প-উপন্যাসে চুম্বনের দৃশ্য অঙ্কনে লোক-সাহিত্যিকদের উৎসাহের কমতি নেই। বরং এ বিষয়ে ছড়াছড়ি এতটা যে, চুম্বনের দৃশ্য রূপায়ণে প্রায় উৎকট পরিবেশ গড়ে তোলা হয়। কিন্তু শতবর্ষ আগে লেখা একটি উপন্যাসের এই চুম্বন দৃশ্য কতটা শিল্পসৌকর্যময় হলে এতটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে, আজকের পাঠকদের কাছে সেটাই এক বড়ো প্রশ্ন।

তথ্যপঞ্জি

১. মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন: *আনোয়ারা*, বাংলা একাডেমি সংস্করণ, ঢাকা, ২০১৫, পৃষ্ঠা ২১৯। বাংলা একাডেমির এই সংস্করণে উল্লিখিত হয়েছে, *আনোয়ারা* প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৮ই মে ১৯১৪ সনে, কলকাতার ১২/১, সালেঙ্গ লেনস্থ, নূর লাইব্রেরী থেকে। কিন্তু *বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা*'র তথ্য অনুযায়ী *আনোয়ারা* প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার ৫/এ কলেজ স্কোয়ারস্থ মখদুমী লাইব্রেরী থেকে। *বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা* (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সম্পাদিত), দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৬।

২. *আনোয়ারা*, বাংলা একাডেমি সংস্করণ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১৯।

৩. দেখুন, *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৪। মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন সম্পর্কে কোনো ভুক্তি নেই।

৪. *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, সম্পাদনা সেলিনা হোসেন, নূরুল ইসলাম, ঢাকা (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫), বর্তমান সংস্করণ ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৩২০।

৫. খোন্দকার সিরাজুল হক, সম্পাদকের ভূমিকা, *আনোয়ারা*, বাংলা একাডেমি সংস্করণ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা বারো।

৬. *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২০।

৭. *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২০।

৮. *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, মনসুর মুসা সম্পাদিত, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ৪১৬।

৯. মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন: *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, দ্বিতীয় খণ্ড, হাসি প্রকাশনালয়, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ১৭৭-১৭৮।

১০. ড. গোলাম সাকলায়েন: *মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক*, তৃতীয় সংস্করণ, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৫৭-১৭১।

১১. আনিসুজ্জামান: *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, চারুলিপি, ঢাকা, ২০১২।

১২. ড. মযহারুল ইসলাম: *মোহাম্মদ নজিবর রহমান*, কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ২, ৮।

১৩. খন্দকার মো. বশির উদ্দিন: *মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৭, ৩০।

১৪. জুলফিকার মতিন: *মোহাম্মদ নজিবর রহমান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৩৩, ৩৪।

১৫. কাজী মোতাহার হোসেন: *বাংলা সাহিত্য সম্পদ, মোহাম্মদ নজিবর রহমানের আনোয়ারা*, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ৩৩, ৩৪।

১৬. এ তথ্যটি কৈশোরে আমি পেয়েছিলাম আমার নিজের মায়ের কাছ থেকে। তিনিও তাঁর বিয়েতে একাধিক *আনোয়ারা* উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন। আমাদের পারিবারিক সংগ্রহে নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের *আনোয়ারা* ও *গরীবের মেয়ে* দু'খানা বই-ই দীর্ঘদিন সযত্নে ছিল।

১৭. খোন্দকার সিরাজুল হকের সম্পাদকীয় (ভূমিকা), *আনোয়ারা*, বাংলা একাডেমি সংস্করণ, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-আট।

১৮. খন্দকার মো. বশির উদ্দিন: *মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ২২।

১৯. খোন্দকার সিরাজুল হক, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-দশ।

২০. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *মাসিক প্রবাসী*, ১৫শ ভাগ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

২১. যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় সম্পাদিত *সাহিত্য পঞ্জিকা*, ১৩২২ বঙ্গাব্দ। সূত্র: মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী (কোহিনূর পত্রিকার সম্পাদক): *মুসলমান লেখকগণের তালিকা*, পৃষ্ঠা ১০৫। খন্দকার সিরাজুল হকের ভূমিকায় উল্লিখিত।

২২. *আনোয়ারা* উপন্যাস সম্পর্কে কবি গোলাম মোস্তফার এ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা* (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সম্পাদিত)-এর দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৬ তারিখে।

২৩. *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, পূর্বোক্ত।

২৪. *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, পূর্বোক্ত।

২৫. *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, পূর্বোক্ত।

২৬. *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, পূর্বোক্ত।

২৭. *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, পূর্বোক্ত।

২৮. *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, পূর্বোক্ত।

২৯. *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, পূর্বোক্ত।

৩০. *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, পূর্বোক্ত।

৩১. *সাহিত্য পঞ্জিকা*, পূর্বোক্ত এবং *মাসিক প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ বঙ্গাব্দ সংখ্যা।

৩২. মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের কাছে রাজশাহী কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক পঞ্চানন ভট্টাচার্যের চিঠি, *আনোয়ারা* উপন্যাসের চতুর্বিংশ সংস্করণ (১৩৬২ বঙ্গাব্দ)-এর বিজ্ঞাপনে উদ্ধৃত।

৩৩. মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন: *আনোয়ারা*, বাংলা একাডেমি সংস্করণ, ২০১৫,

৩৪. *আনোয়ারা*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২১৮।

লেখক: গ্রন্থকার ও গবেষক

বিজয়ের ৪৮ বছরে প্রাপ্তি

রেহানা শাহনাজ

কেটে গেল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪৮ বছর। স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সব ধরনের অন্যায়-অবিচার ও বৈষম্য থেকে মানুষের মুক্তি। বর্তমান সরকারের নিরলস প্রচেষ্টা এ বিষয়ে অব্যাহত আছে। দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। আমরা গর্ব করে বলতে পারি আমরা আজ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি। এককালের শাসক পাকিস্তানের তুলনায় আমাদের শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, বিদ্যুৎ ও নারীর ক্ষমতায়ন ও মানসিকতার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তা বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন আজ বাস্তবায়নের পথে।

স্বাধীনতার কিছুকাল পরেই মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলে উপস্থাপন করেছিলেন। আজ এই তলাবিহীন ঝুড়ির তলাটা অনেক শক্ত হয়েছে। তাই বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের কথা মনে পড়ছে– 'আমাদের কেউ দাবায়ে রাখতে পারবা না'।

ছোটো আয়তনের একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারা বিশ্বের নিকট প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিবিড় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা, জনবহুল দেশে নির্বাচন পরিচালনার দক্ষতা, বনায়ন, সামাজিক-অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিজয়ের মাসে একটি বিষয় বারে বারে মনে পড়ছে যা লেখাতে উল্লেখ করছি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের একটি উক্তি– 'ছোটোবেলায় মুরব্বিদের মুখে শুনতাম, পূর্ব পাকিস্তান আমাদের একটি বোঝা। ন্যায় বিচার না পেয়ে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে গেছে।' ইমরান খান বুঝতে পেরেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন কি কারণে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে গেছে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে ঠাঁই করে নিয়েছে।

আজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের তুলনায় বিভিন্ন সূচকেই বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। এই বিজয়ের মাসে বড়ো স্বস্তির বিষয় হলো– বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ ফিরে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়। এই ডিসেম্বর মাসেই আমরা বিজয়ের চার যুগ পূরণ করছি। আগামী ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে সুবর্ণ জয়ন্তীতে এসব উন্নয়নের গুণগত মান নিশ্চিত করাই হবে মূল লক্ষ্য। এমনটিই আমাদের প্রত্যাশা। বর্তমান সরকার একটানা তিন মেয়াদে থাকার ফলে তৃণমূল জনগণ আজ উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে। আমরা প্রত্যাশা করছি ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের পূর্বেই উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।

জাতিসংঘ মনে করে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছে। অর্জিত সাফল্য ধরে রাখতে ও আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পেতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলোকে সমন্বিতভাবে মোকাবিলা করতে হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশকে উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম, উৎপাদনশীলতা অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সুশাসন, অগ্রগতি, বৈষম্য বিলোপের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি বলে মনে করে জাতিসংঘ। দেশ স্বাধীনের পরই সোনার বাংলা গড়ার কাজ শুরু করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পঁচাত্তরে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার ফলে এই অব্যাহত ধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর গত

একদশকে দেশের বৃহৎ অবকাঠামো, উন্নয়নে সরকারের ব্যাপক বিনিয়োগ বাংলাদেশকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। বাংলাদেশ শুধু অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে অগ্রগতি অর্জন করেনি, প্রভাবশালী শক্তির সঙ্গে দর কষাকষির সক্ষমতা অর্জন করেছে। ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় এবং দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিশ্বব্যাংকের খবরদারির মুখে সংস্থাটিকে বিদায় দিয়ে নিজের অর্থেই ৩০ হাজার কোটি টাকার পদ্মা সেতু নির্মাণ করছে বাংলাদেশ। শুধু তাই না, এক লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকায় নির্মাণ করছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। বিশ্বে তৃতীয় উচ্চতম ১৩০ তলা ভবন নির্মাণেরও উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ। গভীর সমুদ্র বন্দর ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেল নির্মাণ ও একসঙ্গে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতার পরিচয় বহন করে। ৪৮ বছর আগের উদ্যোক্তাশূন্য বাংলাদেশ এখন লাখো উদ্যোক্তা বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে বৃহৎ শিল্প কারখানা, তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষস্থানে বাংলাদেশ। আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশের ১৬ কোটি মানুষের চাহিদার বড়ো অংশই পূরণ করছে বেসরকারি খাত। খাদ্য উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষস্থানে বাংলাদেশের নাম লেখিয়েছে কৃষকরা। আয়তনে বিশ্বের ৯৪তম হয়েও সবজি উৎপাদনে তৃতীয় এবং ধান, মাছ উৎপাদনে চতুর্থ শীর্ষ অবস্থান বাংলাদেশের। ১৯৭২-১৯৭৩ সালে যেখানে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯৯ দশমিক ৩১ লাখ টন এখন তা পৌঁছেছে ৪২০ লাখ টনে। মাত্র ৮০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স ৪৮ বছরে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ২৭৭ কোটি ডলারে। ২ কোটি ডলারের রিজার্ভ এখন ৩৩৭ কোটি ডলার। স্বাধীনতার পর প্রথম অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ছিল ২ দশমিক ৭৫ শতাংশ, বর্তমানে ৮.১৪ শতাংশ।

এই উন্নয়ন যাত্রাকে টেকসই করতে মানবসম্পদের উন্নয়ন ও বণ্টনে বৈষম্য কমানোসহ বেশ কিছু বিষয়ে জোর দেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা। তারা বলেছেন বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীই বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রাণশক্তি। স্বাধীনতার পর দেশের ৮০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত। বর্তমান হিসাবে ২৪.৩ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের গড় আয়ু মানুষের ৪৭ বছরের কিছু বেশি। বর্তমানে ৭৬ বছর। জনসংখ্যা বেড়েছে, চাষযোগ্য জমি কমেছে অথচ দেশে খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে না। কৃষির চেয়ে শিল্পের অবদান বাড়ছে অর্থনীতিতে। সেবা খাতের কার্যক্রমও বাড়ছে।

স্বাধীনতার ৪৮ বছরে আমাদের প্রাপ্তি অনেক। প্রাপ্তিতে রয়েছে– ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রসর। পদ্মাসেতু নির্মাণ, মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে উৎক্ষেপণ ও নারীর ক্ষমতায়ন। বর্তমান সরকারের যে উন্নয়নের পথযাত্রা তাতে কিছুটা বাধা থাকলেও আমাদের প্রত্যাশা নিকট ভবিষ্যতে এই সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠা সম্ভব হবে। প্রসঙ্গত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা এই তিনটি সুচকের দুটিতে উত্তীর্ণ হতে পারলে কোন দেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশ তিনটি সুচকেই যোগ্য বিবেচিত হয়েছে।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

মানুষের ডেরায় স্বপ্নের খুঁটি

সেলিনা হোসেন

ছোটো ক্যানভাসটিকে নানা রঙে ভরিয়ে তুলছে আমিনউদ্দিন। গাছের নিচে বসে আঁকা ওর প্রিয় অভ্যেস। এমন একটি অভ্যাসের ভেতরে ঢোকার দিন-তারিখের হিসাব আমিনের মনে নেই। শুধু মনে আছে যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরলে এমন একটি চিন্তা ওর ভেতরে ভোরের আলোর মতো ছড়ায়। ক্যানভাসের রঙের মধ্যে ফুটে থাকবে শহিদের মুখ। গ্রামের স্কুলে চাকরি করতে এসে এমন একটি ছায়াঘেরা জায়গা পেয়ে সিদ্ধান্তটি এমনই হয়েছিল।

ও বুকভরে বাতাস টেনে চারদিকে তাকায়। তখনও সূর্য ওঠেনি। বাতাসে শীতের মৃদু আমেজ। নিজেকেই বলে, দেখ কেমন মনোরম স্নিগ্ধতা। বড়ো করে শ্বাস টেনে একফুঁয়ে জীবনটা উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। ক্যানভাসে নীল রঙের আঁচড় টেনে বলে, মৃত্যু আমার কাছে সৌন্দর্য। এই ক্যানভাসের উজ্জ্বল রঙের মতো। জলরঙে গড়িয়ে যায় আঁকাবাঁকা রেখা। ফুটে উঠতে থাকে একটি মুখের আদল।

একদিন এ দেশে যুদ্ধ হয়েছিল। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ। আমিনউদ্দিনের বয়স তখন তিরিশের কোঠায়। প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করে আর মনের আনন্দে ছবি আঁকে। প্রকৃতি আর মানুষ মিলেমিশে যেন চারদিকে রং ছড়ায়। কখনো প্রকৃতির মাঝখানে বিন্দুসম মানুষ, কখনো ক্যানভাসজুড়ে শুধু একটি মুখের ওপর বিন্দুসম প্রকৃতি। এভাবে কাটছিল দিন। এক ধরনের মগ্নতা জীবনের অন্যদিক ভরিয়ে রেখেছিল। ভাবতো, ঘাটতি নেই কোথাও। এমন এক গভীর সময়ে ওর সামনে তখন স্বাধীনতার ডাক। যুদ্ধ করবে বলে একদিন নদী পার হয়ে চলে গেল মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে। যুদ্ধ মানে তো রক্ত আর মৃত্যু। কত অসংখ্য মৃত্যু দেখতে হয়েছে। এখন সেসব শহিদের মুখ নানা রঙে ক্যানভাসে উঠে আসে। কাউকে চিনে বা না চিনে– কেউ দৃশ্যমান, কেউ অদৃশ্য মানুষ– তাতে কিছু এসে যায় না। আমিনের ক্যানভাসে শহিদের মর্যাদায় ফুটে ওঠে সব মুখ। যেসব ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকা শেখায় তাদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, এত মানুষের মুখ আঁকেন কেন স্যার?

আমিনউদ্দিন সোজা হয়ে বসে বুক টান করে ওদের সামনে একজন মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতি হয়ে গর্বের সঙ্গে বলে, যাদের মুখ আঁকি

তারা সবাই স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন।

আপনি সবাইকে চিনতেন স্যার?

শহিদদের চিনতে হয় না সোনামানিকরা। ত্রিশ লক্ষ শহিদের মুখ আমার বুকের ভেতর আছে। যাদের দেখিনি তাদেরও মুখ আঁকি।

আমরাও আঁকব। আমরা যদি একটা বড়ো ফুল আঁকি সেটা কি শহিদের মুখ হবে?

পাশের জন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে, ধুত কেমন করে হবে? ফুল কি মানুষের মুখ!

তাহলে আমি নদী আঁকব। নৌকা আঁকব।

আমি একটা পাকা ধানের শীষভরা ক্ষেত আঁকব। তার ওপর দিয়ে উড়ে যাবে বুলবুলির ঝাঁক।

আমি আমাদের সবার মুখ আঁকব। একটা কাগজে ছোটো ছোটো করে সব ছেলেমেয়ের মুখ।

একজন গালে আঙুল ঠেকিয়ে ভাবুকের ভঙ্গিতে বলে, এই দেশের স্বাধীনতার জন্যইতো তারা জীবন দিয়েছেন। এসব আঁকলেই শহিদদের আঁকা হবে।

ছেলেমেয়েরা নিজেরা নিজেরা কথা বলে, তখন আমিনউদ্দিন নিজের স্বপ্নের ভেতরে ডুবে যায়। স্বপ্নের ভুবন একটি যুদ্ধক্ষেত্র। যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝ দিয়ে হেঁটে যায় ও। ওর সামনে ক্যানভাস নেই। হাতে অস্ত্র। চারপাশে ধ্বংস এবং মৃত্যু। আছে বুকের ভেতরের বড়ো ইজেলে স্বাধীনতার বিচিত্র রং। রঙের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। চোখে দেখা রঙের বাইরেও অজস্র আলোর ফুলকি ঝলকায়। হেঁটে যেতে যেতে দেখা হয় প্যাট্রিক হেনরির সঙ্গে। আমিন হাসিমুখে স্বাগত জানিয়ে বলে, প্যাট্রিক হেনরি আপনি?

হ্যাঁ, আমি। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাকে দেখতে এসেছি। স্বাধীনতার লড়াই সহজ কথা নয়। তুমি ইতিহাস ভালো করে জানো।

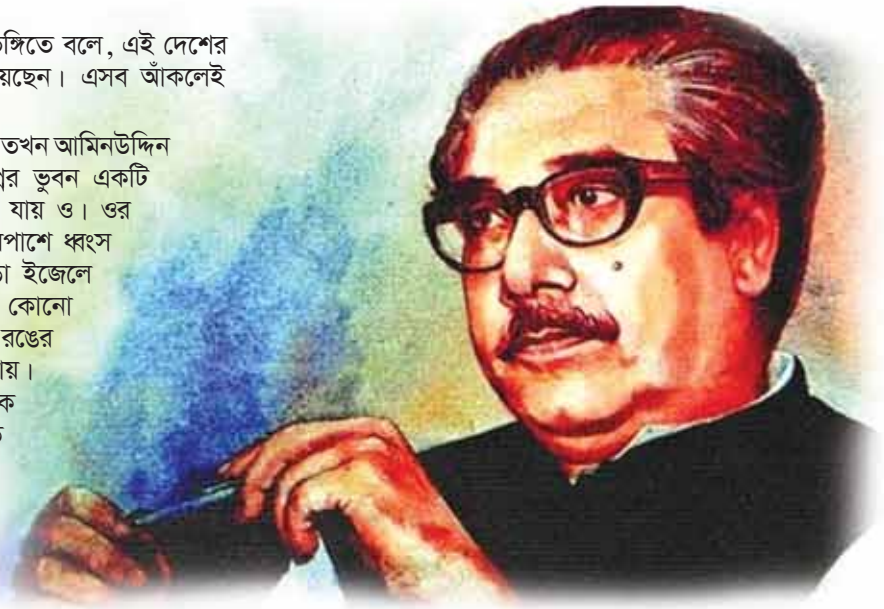

আমি জানি আপনি যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া রাজ্যের শাসক ছিলেন। ব্রিটিশ উপনিবেশের শিকল ভাঙতে চেয়েছিলেন। সেইন্ট জর্জ চার্চের সমবেত মানুষের সামনে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, সেদিন আমি বলেছিলাম আমাকে স্বাধীনতা দাও, নয়তো মৃত্যু।

আপনার এই সাহসী ভাষণ পড়ে আমি নিজেকে স্বাধীনতার যোদ্ধা ভাবতে শিখেছিলাম। আপনার ভাষণ আমাকে লড়াকু হওয়ার প্রেরণা দিয়েছিল।

সেজন্য আমি এই যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাকে দেখতে এসেছি আমিনউদ্দিন।

আপনি বলেছিলেন জীবন কি এতই প্রিয়, আর শান্তি কি এতই মধুর যে শিকল আর দাসত্বের মূল্যে তাকে কিনতে হবে? আপনার এই লাইন পড়ে আমি বন্ধুদের বলতাম, না জীবন এত ক্ষুদ্র নয়। জীবনের সীমানা বিশাল। তাকে ২ রক্ত আর মৃত্যু দিয়ে স্বাধীনতার গৌরবে ভরে তুলতে হয়। আপনি যেদিন ভাষণ দিয়েছিলেন সেই তারিখটি আমার মনে আছে ২৩শে মার্চ, ১৯৭৫।

তোমাদের শুরুটাও মার্চ মাসে। তোমাদের জীবনে ৭ই মার্চ আছে।

ঠিক বলেছ প্রিয় বন্ধু প্যাট্রিক হেনরি। তুমি ইতিহাসের পাতায় চিরঞ্জীব থাক।

এই মুহূর্তে আমি তোমার পাশে আছি। ছায়ার মতো আছি। সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাও বন্ধু।

তখনই শত্রুর গুলি এসে বিদ্ধ হয় মিজানুরের ঘাড়ে। ও পড়ে যায়। ওহ্, কি নিদারুণ সময় ছিল সেদিন। পড়ে যাওয়া মিজানুরের শরীর টপকে ছুটে গিয়েছিল ও। প্রবল উন্মাদনায় শত্রুর মোকাবিলা করেছিল। ওর বাহিনী পরাজিত করেছিল পাকিস্তানি সেনাদের। শত্রুর একজনও সেদিন জীবিত ফিরে যেতে পারেনি। অপারেশন শেষে মিজানুরের কাছে ছুটে এসেছিল ও। দেখেছিল মিজানুর তখনো কাতরাচ্ছে। জ্ঞান হারায়নি। ওকে দেখে হাত চেপে ধরে বলেছিল, তুই না বলেছিলি, আমাকে স্বাধীনতা দাও, নয় মৃত্যু। আজ স্বাধীনতার জন্য আমার সামনে মৃত্যু। তুই আমার মাকে খবরটা পৌঁছে দিস। বলিস, মা যেন দুঃখ না পায়। এ মৃত্যু গৌরবের।

ওকে সবাই মিলে ধরাধরি করে ক্যাম্পে নিয়ে যাবার পথে মারা যায় মিজানুর।

এখনও থেমে থেমে কথা বলা মিজানুরের কণ্ঠস্বর কানে বাজে আমিনের। ও দু'হাতে মুখ ঢাকে। মাথা ঝাঁকায়। যেন দৃশ্যটি এই মুহূর্তে ওর সামনে, এই গাছতলায়। চারপাশে ভিড় করে আছে শিশুরা। আমিনউদ্দিন গাছের কাণ্ডে পিঠ ঠেকায়। প্যাট্রিক হেনরির কণ্ঠস্বর শুনতে পায় ও– বলেছি না, স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার অর্থ দাসত্বকে মেনে নেওয়া। আমরা তেমন জাতি নই। আমাদের সামনে যুদ্ধ। আমরা তাকে বরণ করব। মরণের বরণ ডালায় রক্তের জীবন– আমিনউদ্দিন নিজেকেই কথা বলে টের পায় ওরা আসছে। মাটিতে ওদের ছোটো পায়ের মৃদু ধ্বনি। ও মুখ থেকে হাত সরায়। দেখতে পায় কাগজ-রংতুলি নিয়ে ওরা আসছে।

স্যার আপনি মুখ ঢেকে রেখেছিলেন কেন?

আমরা দূর থেকে আপনাকে এভাবে দেখেছি।

স্যার, আপনার কি মন খারাপ?

তোদের মতো ছেলেমেয়েরা যার চারপাশে থাকে তার কি মন খারাপ হয় রে?

আমরা খুশি, আমরা খুশি।

ওরা হাসতে হাসতে গাছতলা ভরিয়ে তোলে। কাগজ বিছিয়ে নিজেরা বসে। বলে, আজ আমরা আপনার ছবি আঁকব।

কেন, আমাকে কেন?

সবার বড়ো তের বছরের সন্তু বলে, এটাও শহিদের মুখ হবে। শহিদের মুখের ছবি।

ও তাই, তাহলে আঁক। আমি যেভাবে বসে আছি সেভাবে বসে থাকব?

হ্যাঁ, থাকেন। আমরা কিন্তু আমাদের যে রকম খুশি সে রকম আঁকব।

আমাদের আঁকা হলে বুঝতে পারবেন আপনার মুখটা আপনার না।

তবে কার? তোদের কি মনে হয়?

সেই মুখ একজন মুক্তিযোদ্ধার।

মুক্তিযোদ্ধার! ঠিক আছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ যুদ্ধ করেছে তাদের কারো না কারো মুখের সঙ্গে মিলে যাবে।

হ্যাঁ, যাবে যাবে।

ছোটোদের উৎফুল্ল কণ্ঠ ধ্বনিত হয়। আমিনউদ্দিন আনন্দে চোখ বুজে। ভাবে, এ জীবন আনন্দের এ জীবন উচ্ছ্বাসের। তাই কি? আবার ওর ভাবনায় ঢুকে যায় যুদ্ধক্ষেত্র। ওর সামনে এগিয়ে আসেন আব্রাহাম লিংকন। তিনি বলছেন, স্বাধীনতার স্বপ্ন ছোটো করে দেখতে নাই আমিনউদ্দিন।

আপনি তো মাত্র তিন মিনিটের একটি বক্তৃতা দিয়ে ইতিহাসের পাতায় উঠে এসেছেন। অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল। হা-হা করে হাসেন তিনি। যুদ্ধক্ষেত্রের গোলাগুলির মাঝে তার হাসি অমলিন থাকে। গোলার শব্দ ম্লান করে দিয়ে সে হাসি ভরিয়ে তোলে মুক্তিযোদ্ধা আমিনের বুক। ও বলতে থাকে, ইতিহাস থেকে আমরা জানি যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ার গেটিসবার্গে মাত্র কয়েকদিনের গৃহযুদ্ধে আট হাজার লোক নিহত হয়েছিল। যুদ্ধের চার মাস পরে তাদের স্মরণে নির্মিত হয়েছিল স্মৃতিসৌধ। তাঁদের স্মরণে আয়োজিত সভায় আপনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তা গেটিসবার্গ অ্যাডরেস নামে খ্যাত। আমি মনে করি ইতিহাস জানা খুব জরুরি। বেঁচে থাকার জন্য স্বাধীনতার বিকল্প কিছু নেই। আব্রাহাম লিংকন আপনি ইতিহাসের অমর মানুষ। স্বাধীন দেশে বাস করার যে ধারণা আপনি দিয়েছেন তা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চেতনায় সোনার হরফ।

আবার হা-হা হাসিতে ভরে যায় যুদ্ধক্ষেত্র। আমিন শুনতে পায় তার কণ্ঠস্বর জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার, জনগণের জন্য সরকার। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুণ আব্রাহাম লিংকন।

আমার প্রার্থনা তোমরা যেন যুদ্ধে জয়ী হতে পার। তোমাদের স্বাধীন দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে জনগণের সরকার।

তখন সিলেটের ধলই সীমান্তে মুন্সী রউফ তার মেশিনগান থেকে অনবরত গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছেন। পাকিস্তানি সেনারা নানা কৌশলে এগিয়ে আসছে। চারদিক ঘিরে ফেলেছে। মুন্সী রউফ অন্যদের বলছে, আমি গুলি চালিয়ে শয়তানদের দমিয়ে রাখছি। তোমরা পিছু হটে যাও। অন্যরা পিছু হটে যায়। মেশিনগান থেকে গুলিবর্ষণ করে শত্রুদের ছিন্নভিন্ন করে, কিন্তু একসময় ওদের গোলা এসে পড়ে মুন্সী রউফের ওপর। শহিদ হন তিনি। সেজন্যই নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, স্বাধীনতা অর্জনের কোনো সহজ পথ নেই। স্বাধীনতার দাবি রক্ত আর মৃত্যু। সে জীবন দেয় আপামর জনসাধারণ।

আমিনউদ্দিন চোখ খুললে দেখতে পায় ছেলেমেয়েরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমিন সোজা হয়ে বসে।

একজন ডাকে, স্যার।

আমিনউদ্দিন ওর দিকে তাকায়। ও চিন্তা করতে চায় যে ও কতদিন ধরে এই ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকা শেখাচ্ছে। গত পনেরো বছরে অনেকে আঁকা শিখেছে। বড়ো হয়েছে। চলে গেছে অন্য কোথাও। কাজের খোঁজে শহরে গিয়েছে, কিংবা বিদেশে। কারো বিয়ে হয়ে চলে গেছে অন্য গ্রামে। বাবার বাড়িতে এলে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে। বলে, আমাদের গাঁয়ে আপনার মতো স্যার নাই। থাকলে আমার ছেলেটাকে ছবি আঁকা শেখাতাম স্যার। ছোটোবেলায় আপনার কাছে ছবি আঁকা শিখেছিলাম বলে আমি অনেক কিছু সুন্দর করে করতে পারি। আমিন ওদেরকে স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা শুনিয়েছে। এখন ওর সামেন একদল ছেলেমেয়ে। এখন ওর সামনে সময় ১৮৬৩ সালের নয়। যখন আব্রাহাম লিংকন বলেছিলেন, আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা আমেরিকা মহাদেশ গড়েছিলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা ও জনগণের জীবনমানের সমতা। এই লক্ষ্য নিয়ে তারা যুদ্ধ করেছিল। গৃহযুদ্ধে আমাদের শত-শত মানুষ জীবন দিয়েছিল। মানুষই একটি দেশের শক্তি। তাদেরকে পূর্ণ জীবনের অধিকার দিতে হবে।

স্যার, আপনি দেখবেন না আপনাকে কীভাবে এঁকেছি?

হ্যাঁ, দেখবতো। দাও।

ওরা একটা একটা করে ওর সামনে কাগজ দিয়ে যায়। কাগজগুলো গুছিয়ে আমিন বলে, আজ তোমাদের ছুটি।

কাল আমাদের স্কুল আছে। আপনি কি ক্লাসে স্বাধীনতার কথা পড়াবেন স্যার? আপনি কত সুন্দর করে শহিদদের কথা বলেন। আমরা সেইসব গল্প নিয়ে যাই অনেকের কাছে।

নিয়ে যাও অনেকের কাছে?

হ্যাঁ স্যার, তাইতো করি। বাড়ি গিয়ে মাকে বলি সবার আগে। তারপরে অন্যদেরকে বলি।

ঠিক আছে আগামীকাল তোমাদেরকে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের গল্প শোনাব। সেইসঙ্গে নেলসন ম্যান্ডেলার। তিনি বলেছিলেন, স্বাধীনতা লাভ কঠিন। কোনো সহজ পথে স্বাধীনতা হয় না।

ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে বলে, কোনো সহজ পথে স্বাধীনতা হয় না।

এই কথাটা বলতে বলতে তোমরা বাড়ি চলে যাও।

যদি আমরা গানের সুরের মতো টেনে টেনে বলি?

বলো, সেতো আরও ভালো।

ওরা চলে যেতে থাকে। দুজন ফিরে এসে বলে, আপনি বাড়ি যাবেন না স্যার?

তোমরা যাও। আমি একটু পরেই যাব।

পরক্ষণে ভাবে, ওদেরকে বাড়ি যেতে বলা সহজ। নিজেকে বলা সহজ নয়। কখনো ঘর ওকে টানেনি। নিঃসঙ্গতার বোঝা বুকের মধ্যে পর্বত সমান। বেঁচে থাকার আনন্দ-বেদনা যুদ্ধদিনের স্মৃতি। যুদ্ধক্ষেত্র, শত্রুর পরাজয়, আহতদের আর্তনাদ, শহিদের...। এখানে ঘর নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে ঘর থাকে না, ঘরের স্বপ্ন থাকে। আমিনউদ্দিন ওদের চলে যাওয়া দেখে। ওরা নিজ নিজ ঘরে যাচ্ছে। ঘরে বাবা-মা-ভাইবোন আছে। তারা ভালোবাসার মানুষ। ভালোবাসার মানুষ ছাড়া ঘর হয় না। সেই অর্থে ও আসলে একজন ঘরহীন মানুষ। ওর মাথার ওপরে শুধু ছাদ আছে, বিছানা আছে, খাবার আছে। আর কিছু নাই। ঘরের মানুষ নাই, ভালোবাসা নাই। তারপরও ছাদের নিচে ফিরতে হয়। বেঁচে থাকার এটাই নিয়ম।

ওরা চলে গেলে আমিনউদ্দিন নিজের ক্যানভাসের দিকে তাকায়। ওখানে কি সোহেলির মুখটা ফুটে ওঠে কখনো? যাকে ও স্বাধীনতার পরে কামালপুরের বাঙ্কার থেকে উদ্ধার করেছিল। মেঘালয়ের সীমান্ত বর্ডারে বিধ্বস্ত সোহেলি ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি কোথায় যাব? আমিনউদ্দিন বলেছিল, আপনার বাড়িতে । উদভ্রান্ত সোহেলি বলেছিল, মৃত্যু কি খুব কঠিন? আপনার রাইফেলে গুলি আছে? আমিন চুপ করে থাকলে সোহেলি আবার বলেছিল, একটি গুলি খরচ করুন আমার জন্য। আমি তো জানি আমার বাড়ি নেই, দেশও নেই। আমি কোথাও যাব না। আমিন গম্ভীর স্বরে বলেছিল,

আমি আপনাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব।

আপনার বাড়িতে? কে আছে?

বাবা-মা-ভাইবোন সবাই আছে। আমি বিয়ে করিনি।

তারা আমাকে মানবে?

মানবে না। আমি মানাব। আমি আপনাকে ভালোবাসা দেব। আপনি তো দেশের জন্য নিজের সবকিছুই দিয়েছেন। আপনিও যুদ্ধ করেছেন। যা কিছু ঘটেছে তার জন্য আপনার নিজের কোনো দায় নেই। দায় এই জাতির।

সেদিন প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সোহেলি।

আমিনের খুব ইচ্ছে হয়েছিল ওকে গভীর মমতায় বুকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু চারপাশে লোক জমে যাওয়ায় সে কাজটি করা হয়নি। একজন ভারতীয় ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করে তার জিপে সোহেলিকে নিয়ে এসেছিল ময়মনসিংহে। ও কিছুতেই ওর বাড়ির ঠিকানা বলেনি। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় ওকে রাখা হয়েছিল। রাতের অন্ধকারে ও পালিয়ে গিয়েছিল। পরদিন ওর লাশ পওয়া গিয়েছিল ব্রহ্মপুত্র নদীতে।

এখনো সোহেলির মুখ ওর ক্যানভাসের একটি বড়ো জায়গা। ও মনে করে সোহেলি শহিদ। স্বাধীনতার জন্য যা দেবার তার সবটুকু দিয়েছে সে। কিছুই বাদ রাখেনি ও। সোহেলির মৃত্যু আমিনের ক্যানভাসে মৃত্যুর সৌন্দর্য।

সেই দুপুরে ঘরে ফিরে ওর খুব মন খারাপ থাকে। কোনো কাজে মন বসে না। সোহেলিকে মনে রেখে ওর আর বিয়ে করা হয়নি। কাউকে ভালোবাসতেও মন চায়নি। ষাট বছরের নিঃসঙ্গ জীবন কেটেছে স্কুলে পড়িয়ে, ছবি এঁকে, ছেলেমেয়েদের ভালোবেসে। অনেক রাতে ক্যানভাসের সামনে বসলে ফুটে উঠতে থাকে ভিন্ন ছবি। যেন ক্যানভাসটি মিছিলের নগরী। হাজার হাজার মানুষ মুষ্টিবদ্ধ হাত নিয়ে এগিয়ে আসছে। বর্ণবাদী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ আমেরিকার কৃষ্ণ-মানুষেরা। কৃষ্ণাঙ্গ নেতা মার্টিন লুথার কিং শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করছেন সাধারণ মানুষকে। বলছেন, আই হ্যাভ আ ড্রিম...। বব ডিলান আর জন বয়েজের বিপ্লবী গানের সুরে উত্তাল জনসমুদ্র। সময় ১৯৬৩। দিন ২৮শে আগস্ট। তিনি বলেছিলেন, জনগণের অধিকার অর্জনের কথা। বলেছিলেন, আমি স্বপ্ন দেখি জন্মসূত্রে সব মানুষ সমান। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতে হয়। সাদা আর কালো দিয়ে বৈষম্য করা অন্যায়। ক্যানভাস থেকে মাথা তুললে আমিনের মনে হয় ঘরজুড়ে আলো ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মার্টিন লুথার কিং। দু'চোখে বিস্ময় ছড়িয়ে আমিনউদ্দিন বলে, আপনি?

তোমাকে দেখতে এসেছি শিল্পী। বাঙ্কার থেকে উঠে আসা মেয়েটিকে ভালোবাসা দিয়ে মানবতার ঘাটতিকে জয় করেছ শিল্পী। জানোইতো ম্যান্ডেলা বলেছিলেন, স্বাধীনতা অর্জনের কোনো সহজ পথ নেই।

সোহেলিকে স্বাধীনতা অর্জনের কঠিন পথে যেতে হয়েছিল মিস্টার মার্টিন।

হ্যাঁ, হয়েছিল। আমি জানি। যুদ্ধের এটাই নিয়ম।

কৃষ্ণ মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে আপনাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। এটা মৃত্যুর সৌন্দর্য।

মার্টিন লুথার কিং মৃদু হেসে বলেন, তুমি ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতার কথা বলছ এটি অনেক বড়ো কাজ। ওদেরকে অনবরত বলে যেতে হবে স্বাধীনতার কথা।

আমি ইতিহাসের কথা বলতে ভালোবাসি।

ঘরের আলো নিভে যায়। ও বুঝতে পারে লোডশেডিং। ঘরে কেউ কোথাও নেই। ক্যানভাসজুড়ে আঁকা হয়েছে একজন মানুষের রক্তাক্ত শরীর। তিনি কি আব্রাহাম লিংকন নাকি মার্টিন লুথার কিং নাকি বঙ্গবন্ধু? আমিনউদ্দিন চার্জার লাইট জ্বালিয়ে ঘরের আলো ফিরিয়ে আনে। ও জানে আজ ৭ই মার্চ, ১৯৭১ নয়। ২০১৫। স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেদিনের রেসকোর্স ময়দান ছিল লোকে লোকারণ্য। একদিকে বঙ্গবন্ধুর জলদ গম্ভীর কণ্ঠে ভেসে আসছে উদ্দীপিত ভাষণ, অন্যদিকে পাকিস্তান সরকার মাথার ওপর ওড়াচ্ছে হেলিকপ্টার। আমিনের মনে হচ্ছিল সব মানুষের সঙ্গে ও হেঁটে যাচ্ছিল দিগন্তের পথে। কোথাও কোনো বাধা ছিল না। স্বাধীনতার লক্ষ্যে স্বপ্নের পথে হেঁটে যাচ্ছিলেন শেখ মুজিব। আবার সেই যুদ্ধক্ষেত্র– আবার সেই রক্ত আর মৃত্যুর দেশ। শেখ মুজিব বলছেন, আমরা পিছু তাকাব না সোনার মানুষেরা। যেতে হবে অনেক দূর। ও বলেছিল, বঙ্গবন্ধু আমি আমিন। মায়ের এক ছেলে। মাকে একা রেখে যুদ্ধ করতে এসেছি। তিনি বলেছিলেন, আমাদের মায়েরা ঘরে ঘরে দুর্গ গড়েছেন। তাদের চোখে জল নেই। আগুন আছে। তোমরা এই আগুন নিয়ে লড়াইয়ের মাঝে বীর যোদ্ধা। আমাদের মেয়েরা বীর যোদ্ধা। যুদ্ধ সবার।

হ্যাঁ, যুদ্ধ সবার। সোহেলি তোমার হাত ধরে আমি হেঁটে যাই যুদ্ধক্ষেত্রে। আমি বলব না, আই হ্যাভ আ ড্রিম। আমরা বলব, উই হ্যাভ আ ড্রিম। স্বপ্ন ছাড়া বেঁচে থাকা অর্থহীন সোহেলি। আমি এখনও স্বপ্ন দেখি। ছেলেমেয়েদের বলি, স্বাধীনতা মানে মৃত্যুর অমর গান। শহিদের মৃত্যু নেই। বঙ্গবন্ধু বলতেন, বাংলার দুঃখী মানুষকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। ওরা আমাকে মারবে না। বিশ্বাসঘাতকরা নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সে রাতে ঘরে আর বিজলি বাতি জ্বলল না। আমিন আঁকাজোঁকা বন্ধ রেখে আলমারির ড্রয়ার থেকে যত্ন করে রাখা চিঠিটি বের করে। মাত্র তিনটি লাইন লিখেছিল সোহেলি: প্রিয় মুক্তিযোদ্ধা, আমি যাচ্ছি। আপনার হৃদয়ের সবটুকু আমি পেয়েছি। স্বাধীনতার এই ভালোবাসা নিয়ে আমি আর দুচোখ ভরে এই দেশটা দেখব না। ইতি সোহেলি। চিঠিটি বুকের ওপর রেখে শুয়ে থাকে আমিন। ঘুম আসে না। দুচোখ ভরে অন্ধকার ভালোবাসার প্রগাঢ় অনুভূতি দেয়। এই মুহূর্তে অন্ধকার ওর কাছে আলোর চেয়ে বেশি। ওর মনে হয় বঙ্গবন্ধু এই ঘরেই আছেন। বুকে গুলি নিয়ে মানুষের স্বপ্নের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। কোথাও যাননি। ক্যানভাসে ফুটে আছেন।

পরদিন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেডের ক্রিকেট মাঠে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলে অধিনায়ক যখন নিজেদের বিজয়কে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসর্গ করে তখন আমিনের মনে হয় ও সোহেলির হাত ধরে হেঁটে যাচ্ছে। ওরা এখন অস্ট্রেলিয়ার পথে। আমিন সোহেলিকে বলছে, দেখ ওরা বাংলাদেশকে কোথায় উঠিয়েছে। একদম আকাশের কাছাকাছি। তোমার আমার যুদ্ধটা এরকমই ছিল সোহেলি। আমরা পৃথিবীর মানচিত্রে একটি দেশ যুক্ত করেছি। ওরা আমাদেরকে মনে করছে। তোমার-আমার যুদ্ধকে। চলো ওদের খেলার মাঠ থেকে ঘুরে আসি। মুক্তিযোদ্ধা সোহেলি তোমার হাতটা বাড়াও। আমি ধরি।

আমিনউদ্দিনের কানে ভেসে আসে উল্লাসধ্বনি। ছেলেমেয়েরা বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে দৌড়াচ্ছে। দুচোখ ভরে ওদের আনন্দ উপভোগ করে ও। নিজের দুহাত বুকের ওপর চেপে রাখে। শুনতে পায় বিশ্ব নেতাদের কণ্ঠস্বর। সবাই মিলে বলছেন, উই হ্যাভ আ ড্রিম...। আমিনের দুচোখ জলে ভরে যায়। বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে আসা সোহেলি ওর সামনে। চারদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে বিজয়ের ধ্বনি। ওর ক্যানভাসে বিমূর্ত একাত্তর।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়

রফিকুর রশীদ

বাঙালির সুদীর্ঘকালের লড়াই সংগ্রামের রক্তখচিত ইতিহাস এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের গৌরবদীপ্ত রাজনীতির গায়ে শিল্পসুষমা যুক্ত করে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি এনে দিয়েছেন যে অমর কবি, তাঁর নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। কেন তিনি শ্রেষ্ঠ? হাজার বছরের কথাই বা আসে কেন? আমরা তো দেখেছি ১৯৭১ সালে এই দেশে নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। বিপুল রক্তক্ষয়ী সেই মহান যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শারীরিক অনুপস্থিতি সত্ত্বেও গোটা বাঙালি জাতি বুকের রক্ত দিয়ে, নারীর সম্ভ্রম দিয়ে দেশের ভেতরে অবরুদ্ধ জীবনে এবং দেশের বাইরে শরণার্থী জীবনে অপরিমেয় দুঃখকষ্ট আর নিদারুণ যন্ত্রণা-অপমান সহ্য করে বিশাল সাহস আর শৌর্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে দখলদার পাকিস্তান বাহিনীকে হঠিয়ে বিজয় অর্জন করেছে। তবু তিনিই শ্রেষ্ঠ? তিনিই বাঙালির মহান নেতা?

হ্যাঁ, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে একাত্তরেই, এতে কোনো সংশয় নেই। বঙ্গবন্ধুর শারীরিক অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাঁর নামেই যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে, একথাও সর্বজন স্বীকৃত। নামে শুধু নয়, মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কিছু সংঘটিত হয়েছে তাঁরই নেতৃত্বে। প্রথম সরকার গঠিত হয়েছে, সেই সরকারের অধীনে সারা দেশে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, দেশত্যাগী শরণার্থীদের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা সংগৃহীত হয়েছে, বহির্বিশ্বে সহযোগিতা, সমর্থন ও স্বীকৃতি আদায়ের তৎপরতা পরিচালিত হয়েছে অনুপস্থিত সেই নেতার নেতৃত্বেই। মনে রাখতে হবে, অগ্নিগর্ভ একাত্তর তাঁকে সৃষ্টি করেনি, বহু বছরের রাজনৈতিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতার সঙ্গে নিজস্ব প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক শিল্পসুষমার সমন্বয় ঘটিয়ে ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধুই রচনা করেছেন মুক্তির স্বপ্নমাখা অন্যরকম একাত্তর। ১৯৭১ সালেরও বহু পেছন থেকে দেখতে হবে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা। ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ অধ্যায় থেকে ২৩ বছরের পাকিস্তানি শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই-সংগ্রাম এবং বিভিন্ন মেয়াদে প্রায় ১৪ বছর নিজের কারাভোগের মধ্য দিয়ে তিনি একদিকে যেমন নিজের ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরেছিলেন আকাশস্পর্শী অনতিক্রম উচ্চতায়, তেমনি তাঁর প্রাণপ্রিয় বাঙালি জাতিকেও একাত্তরের ভার বহনের যোগ্য করে তুলেছিলেন। তাঁর সেই স্বনির্মিত সুউচ্চ ব্যক্তিত্বই গড়ে তোলে তাঁর অসামান্য ভাবমূর্তি, যা সত্যিকারের শরীরী মূর্তির চেয়ে মোটেই কম কিছু প্রভাবশালী নয়। এই ভাবমূর্তির সর্বপ্লাবি ঔজ্জ্বল্য এবং প্রভাববিস্তারী ক্ষমতা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা থাকলে তখন মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে মহান নেতার শারীরিক উপস্থিতি-অনুপস্থিতি নিয়ে অভব্য এবং অবান্তর প্রশ্ন আর উঠবে না। শারীরিক উপস্থিতির কার্যকারিতাকেও যে অনেক সময় অতিক্রম করতে পারে ভাবমূর্তির উপস্থিতি ও আদর্শিক উপস্থিতি, তেমন একাধিক প্রমাণ বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের বাঁকে বাঁকে ছড়িয়ে আছে, দেখতে চাইলেই বেশ দেখা যায়, বিশেষ শ্রম স্বীকারেরও প্রয়োজন নেই। মোটা দাগের গোটা দুই উদাহরণ দেওয়া খুব প্রাসঙ্গিক হবে বলেই এখানে উল্লেখ করছি। ১. বাহান্নোর ভাষা-আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের কারাগারে বন্দি। কারাগারের মতো সুরক্ষিত নিরাপত্তা বেষ্টনির মধ্যে আটকে রেখেও সরকারের স্বস্তি নেই, তাঁকে অতি সংগোপনে পাঠাচ্ছে নারায়ণগঞ্জ হয়ে গোপালগঞ্জের কারাগারে। জেলখানায় বন্দি রেখেও একুশের আন্দোলন থেকে বঙ্গবন্ধুকে কি বিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব হয়েছিল? উত্তর পাওয়া যাবে ভাষা সৈনিক গাজীউল হকের বর্ণনায়:

> ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে, তখন শেখ মুজিবুর রহমান জেলে বন্দী থাকা অবস্থায়ও নিশ্চুপ ছিলেন না। পরামর্শ দিয়েছেন এবং কারাগারে বন্দী থেকেও আন্দোলনে শরিক হয়েছেন। ... ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে ৩০শে জানুয়ারি সন্ধ্যায় শামসুল হক চৌধুরীর উদ্যোগে ঢাকা বার লাইব্রেরি মিলনায়তনে আহূত সভায় সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু তখন চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ৩রা ফেব্রুয়ারি শামসুল হক চৌধুরী, আব্দুস সামাদ আজাদ ও ডা. গোলাম মওলার মাধ্যমে মুজিব ভাই সংবাদ পাঠালেন যে, ২১শে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল ডেকে মিছিল করে ব্যবস্থাপক পরিষদ সভা ঘেরাও করা যায় কিনা বিবেচনা করে দেখতে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের মিছিল শেষে বেলতলায় ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী হরতাল ঘোষণা করা হলো।

এবার আসতে চাই উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবসহ আরো অনেকে তখন আইয়ুব শাহীর কারাগারে বন্দি। কারাগারের মধ্যেই চলছে বিচারের নামে প্রহসন। পাকিস্তান ভাঙার অভিযোগে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা (সরকারের ভাষায়) শেখ মুজিবের বিচার হচ্ছে, অথচ আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি অবিচলিত কণ্ঠে তাঁর জবানবন্দিতে বলেন:

> আগেও বলেছি, এখনও বলছি, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আমি চাই। পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করার বিরুদ্ধে আমৃত্যু আমার আন্দোলন চলবে। কোনো বুলেটের বেয়নেটের সাধ্য নেই যে সেই আন্দোলন রোখে। ৬-দফার দাবি আদায়ের জন্য আমি লড়াই চালিয়ে যাব। প্রতিরক্ষার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্যই তা করেছি। পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য করিনি।

শেখ মুজিব কখনোই বিচ্ছিন্নতাবাদী ছিলেন না। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে জনগণের বাঁচার দাবি এবং আত্মরক্ষার দাবি উপলব্ধি করেন এবং জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সেই দাবি আদায়ে তৎপর হন। ১৯৬৬ সালে লাহোরে বিরোধী দলীয় সমাবেশে উপস্থিত হয়ে সেই বাঁচার দাবিই উত্থাপন করেছিলেন ৬-দফা দাবির প্রস্তাবের মাধ্যমে। আইয়ুব খান সে দাবি মানেননি। শেখ মুজিবসহ শত শত নেতাকর্মীকে জেলখানায় পুরে জব্দ করতে চেয়েছেন। তাতে ফল হয়েছে উলটো। বন্দি মুজিবের জনপ্রিয়তা

বেড়েছে নদীর জোয়ারের মতো। মওলানা ভাসানীর মতো বর্ষীয়ান নেতা এক সময় ঈর্ষাকাতর হয়ে ৬-দফার ভুল ব্যাখ্যা করেছেন, ৬-দফার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রশংসায় মুখর হয়েছেন, অথচ সেই ৬-দফার সূত্র ধরেই যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে গণ-আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়, ভাসানী তখন সে জোয়ার থেকে নিজেকে আর সরিয়ে রাখেননি, বরং দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো এগিয়ে এসেছেন, সেই গণ-জোয়ারের সম্মুখভাবে দাঁড়িয়ে দুটি বিষয় উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। একটি হলো ঘোষিত কর্মসূচির প্রতি শেখ মুজিবের অবিচল দৃঢ়তা এবং লক্ষ্যের প্রতি একাগ্রতা। দ্বিতীয়টি হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের এবং শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলের মুক্তির দাবিতে গড়ে ওঠা গণ-আন্দোলনের নাড়ির স্পন্দন উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। অতঃপর উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের পুরোভাগে এসে নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে গণ-অভ্যুত্থানই ঘটিয়ে ফেলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে হত্যা করা হলে আন্দোলনের তীব্রতা প্রবল বৃদ্ধি পায়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে–

> ১৬ ফেব্রুয়ারি মওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানে বিক্ষুব্ধ বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, প্রয়োজনবোধে করাচী বিপ্লবের মতো জেলের তালা ভেঙে শেখ মুজিবকে নিয়ে আসবেন। সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত জনতার পক্ষ থেকে স্লোগান ওঠে, 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো।' লাখো মানুষের কণ্ঠের এই আওয়াজ চারিদিক প্রকম্পিত করে তোলে। মওলানা ভাসানীর ইমামতিতে উপস্থিত ছাত্রজনতা সার্জেন্ট জহুরুল হকের গায়েবানা জানাজা পড়েই শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

অবশেষে জয় হয়েছে গণ-আন্দোলনের। প্রত্যাহার করা হয়েছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। শেখ মুজিবসহ কথিত সকল আসামি মুক্তি লাভ করেছেন। শেখ মুজিবের শারীরিক অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাঁরই সূচনা করা গণ-আন্দোলন উনসত্তরে এসে গণ-অভ্যুত্থানে রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং তারই ফলে পাকিস্তানের বুকে চেপে বসা আইয়ুব শাসনের জগদ্দল পাথর নেমে যায়। এই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যমণি শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা প্রদানের আয়োজন করা হয় রেসকোর্স ময়দানে, ২৩শে ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯)। ঐতিহাসিক এই দিনে–

> রেসকোর্সের সংবর্ধনায় জনতার ঢল নামে। বক্তৃতা পর্বের শেষে উপস্থিত ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন।

কোনো প্রকার হঠকারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ধরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সারা জীবন রাজনীতি করেছেন। দেশের গণমানুষের প্রাণের স্পন্দন তিনি খুব ভালো বুঝতেন, কারণ তাঁর রাজনীতিতে জনগণের শক্তিই ছিল মুখ্য চালিকাশক্তি। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন তিনি। আর সে কারণে জনগণও তাঁকে গভীরভাবে ভালোবেসেছে, আপনজন হিসেবে গ্রহণ করেছে অন্তরের অন্তস্তলে। তাইতো নেতা জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য যে পথ নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর শারীরিক উপস্থিতি-অনুপস্থিতি বিবেচনা না করে সবাই সেই নেতৃনির্দেশ পালনে সচেষ্ট হয়েছে। যেমন বাহান্নোর ভাষা-আন্দোলনে, তেমনি উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে তাঁর শারীরিক উপস্থিতি প্রত্যক্ষভাবে ছিল না বটে; জনগণের সামনে ছিল তাঁর আদর্শ, কর্মসূচি, পথনির্দেশ সর্বোপরি তাঁর আপোশহীন ভাবমূর্তি; ফলে জনগণ ঠিকই আন্দোলন সফল করেছে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সার্থক করে তুলেছে।

পাকিস্তান নামক অস্বাভাবিক জোড়াতালিনির্ভর রাষ্ট্র জন্মের পর থেকে অনিয়মতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়েছে, অথচ সেই রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে থেকেই বাঙালি নেতা শেখ মুজিব নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার রাজনীতিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সুস্থ রাজনীতি চর্চার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। নিজের দল আওয়ামী লীগকে ধর্মীয় বাতাবরণের খোলস থেকে বের করে এনেছেন, দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা ভাসানীর সঙ্গে মতভিন্নতা দেখা দিলেও বঙ্গবন্ধু নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই নিজের দল গুছিয়েছেন, দলকে গণমুখী চারিত্র্য দিয়েছেন, গণ-মানুষের অধিকার আদায়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগকেই সর্ববৃহৎ গণভিত্তিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। পাকিস্তানের রাজনীতির একেবারে গোড়ার দিকে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগের সম্বল ছিল ইসলামিক স্লোগান, আর কৃষক শ্রমিক পার্টির একমাত্র অবলম্বন শেরে বাংলা ফজলুল হকের ভাবমূর্তি। কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে তুলে ধরতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ঔপনিবেশসুলভ শাসন ও শোষণের কথা, বাঙালির অর্থনৈতিক সংকট ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের কথা। আওয়ামী লীগের ভিত্তি পূর্ব বাংলার মাটিতে। দেশের সাধারণ মানুষ– মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র নির্বিশেষে তাদের অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক দাবি-দাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আওয়ামী লীগের পেছনেই সমবেত হয়। একেবারে শুরু থেকেই আওয়ামী লীগ ধর্মীয় জিগির এবং জজুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের গতিশীল এবং সৃজনশীল নেতৃত্ব বাঙালির আত্মজাগরণ এবং স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন-সংগ্রামের প্রতিটি বাঁক বদলের ধাপে ধাপে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দলকে যেমন শক্তিশালী দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছে, তেমনি সাধারণ মানুষের অন্তরে জেগে ওঠা প্রত্যাশা ও স্বপ্ন পূরণে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অবস্থান রচনায় সক্ষম হয়েছে। ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবি ঘোষিত হলে নানাবিধ বিরূপ অপপ্রচার এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপরে অত্যাচার-নির্যাতন, জেল-জুলুম নেমে আসা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের অন্তরের গভীরে স্বাধীনতার স্বপ্নকুসুম মুকুলিত হয়ে ওঠে, অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে গোটা জাতি। বাঙালির ভালোবাসায়-শ্রদ্ধায়-আবেগে একজন শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু, বাঙালির আশাভরসার নির্ভরযোগ্য নেতা, হয়ে ওঠেন গোটা জাতির মুক্তির মহানায়ক।

জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, লড়াই-সংগ্রামের সঙ্গে মিলেমিশে একাত্ম হতে পারলে তবে হয় জননেতা, গণমানুষের নেতা। আবার সেই নেতাও পারেন গোটা জাতির মনে স্বপ্নের বীজ বুনতে, দুস্তর দুর্গম পথ পাড়ি দেবার প্রত্যয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলতে। জনতার নেতা শেখ মুজিব এই কাজটি করেছেন গভীর আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে। পাকিস্তানি জামানার দীর্ঘ তেইশ বছরের উত্তপ্ত আন্দোলন সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে দীর্ঘকালের অধিকারহারা শোষিত-বঞ্চিত মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করার কারণে তাঁকে সরকারি রোষানলে পড়ে বারংবার হতে হয়েছে নির্যাতিত, জীবনের প্রায় চৌদ্দটি বছর (বিভিন্ন মেয়াদে) কাটাতে হয়েছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। তবু তিনি মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্য থেকে একটুও বিচ্যুত হননি, লড়াকু জীবন পরিচালনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। বরং এই নিপীড়ন-নির্যাতন-দুর্ভোগ জনগণের বুকের গভীরে তাঁকে ভক্তি ও ভালোবাসার আসন বিছিয়ে দিয়েছে। দিনে দিনে তিনি পরীক্ষিত, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য আপনজন হয়ে উঠেছেন। ফলে এই জনগণও দুঃসময়ে তাঁকে ছেড়ে যাবার কথা

কিছুতেই ভাবতে পারেনি। বরং শারীরিকভাবে অনুপস্থিত থাকলেও আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনায় তাঁর দেওয়া পথনির্দেশই কঠোরভাবে অনুসৃত হয়েছে। জনগণ সংগ্রামী তৎপরতা দিয়ে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে– তারা সব সময় সব অবস্থাতেই আছে তাদের নেতার সঙ্গে। পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের নিষ্ঠুর নির্যাতন, দমন-পীড়ন স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে দুর্বহ করে তুলেছে, তবুও তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন থেকে তারা একটুও পিছু হটেনি। স্বাধিকার-আন্দোলন যে ক্রমশ স্বাধীনতা-আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে, আন্দোলনের সেই স্রোতও তারা বেগবান করে তুলেছে। শক্তিশালী আন্দোলনের প্রবল ধাক্কাই তো জেলের তালা ভেঙে শেখ মুজিবকে মুক্ত করেছে, প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের মুখেই তো স্বৈরশাসক আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। নতুন সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া খান

যুদ্ধরত বীর মুক্তিযোদ্ধা

এই উত্তপ্ত আন্দোলনকে প্রশমিত করতেই তো সত্তর সালে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা পর্যন্ত দিয়েছেন। বাঙালি জাতির মুক্তির মহানায়ক অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ধরেই জাতিকে এগিয়ে এনেছেন এতদূর। ফলে সত্তরের নির্বাচনে অংশগ্রহণও তাঁর সেই আন্দোলনের অংশ হিসেবেই গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় সাংবাদিক অমিতাভ গুপ্ত লেখেন:

> নির্বাচনের আগে শেখ মুজিব বারবার তাঁর সহকর্মীদের, তাঁর সমর্থকদের সামনে বলেছেন, পাকিস্তানের প্রায় সূত্রপাত থেকেই একের পর এক ডিকটেটর গদি দখল করে পূর্ব বাংলাকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসেছে। অবস্থা চরমে উঠেছে আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খানের অর্থাৎ দুই মিলিটারি জেনারেলের আমলে। এই শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে দেশকে বাঁচাতেই হবে এবং এই নির্বাচনেই হয়তো আমাদের সামনে শেষ সুযোগ।

গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য সত্তরের নির্বাচনকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন শেখ মুজিব। নির্বাচনে জয়লাভ করে জাতীয় পরিষদ বসে ৬-দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করা যাবে, সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত্বশাসনের অধিকার সংবলিত সেই সংবিধান অনুযায়ী দেশ চালানো যাবে। কিন্তু আশঙ্কা তো ছিলই– জঙ্গি শাসনের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে কি-না, নির্বাচনের পর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তর হবে কি-না, সামরিক শাসকেরা নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যাবে কি-না এসব নিয়ে। তবু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী শেখ মুজিব সামরিক শাসক ইয়াহিয়ার নির্বাচনি ঘোষণায় আস্থা এনেছেন, ইয়াহিয়াকেও একটা সুযোগ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস বলে– জঙ্গি শাসক ইয়াহিয়া খান সেই সুযোগের ভয়ানক অপব্যবহার করেছেন। নির্বাচনের অভাবনীয় ফলাফলে একদিকে যেমন তার কাণ্ডজ্ঞান বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, অন্যদিকে তেমনি পিপলস পার্টির নেতা ভুট্টো সাহেবের অনৈতিক চাপ এবং ক্ষমতা লাভের হীন চক্রান্ত সামলাতে না পেরে নিরস্ত্র বাঙালির উপরে চাপিয়ে দেন অসম সশস্ত্র যুদ্ধ। নিরুপায় বাঙালি বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে, চাপিয়ে দেওয়া এই অসম যুদ্ধকেই তারা মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে– মুক্তিযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানোর পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু আহূত আলোচনা-বৈঠকেও নিয়মিত যোগ দিয়েছেন; নির্বাচনে জয়লাভের পরও সংখ্যাগরিষ্ঠতার আস্ফালন না দেখিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ধরেই এগিয়েছেন; স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য প্রবল চাপ ছিল ছাত্র-জনতার, তবু তিনি ধৈর্য ধরেন। কিন্তু জঙ্গি শাসক ইয়াহিয়া আলোচনা-বৈঠকের নামে কালক্ষেপণ করে এবং দেশের বিশাল নিরস্ত্র জনগোষ্ঠীর উপরে অতর্কিত সশস্ত্র হামলা পরিচালনার জন্য তলে তলে অস্ত্র-সৈন্য-গোলাবারুদ এনে মজুদ করে যে শঠতাপূর্ণ আচরণ করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাস তার তুলনা মেলা ভার। শুধু কি তাই, ২৫শে মার্চে এক রাতের মধ্যে ঢাকা নগরীতে পরিকল্পিতভাবে সশস্ত্র সেনাবাহিনী নামিয়ে যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, তা সভ্যতার সকল অহংকার চূর্ণ করে দেয়। কোনো প্রকার নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে অসামরিক নাগরিককে নির্বিচারে হত্যা করার জন্য ইয়াহিয়া যখন সামরিক বাহিনীকে সশস্ত্র অবস্থায় নামিয়ে দেয়, তখন বঙ্গবন্ধুর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। তখন তিনি আক্রান্ত জনগণকে আত্মরক্ষার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে বলেন। নিজে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলার মাটি থেকে দখলদার পাকিস্তান বাহিনীকে হঠাবার জন্য দেশবাসীকে নির্দেশ প্রদান করেন। মুজিবভক্ত দেশবাসী প্রাণ বাজি রেখে সে আদেশ পালন করেছে। নেতার প্রত্যক্ষ অনুপস্থিতি সত্ত্বেও দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে তারা দেশকে করেছে হানাদারমুক্ত, বিজয় এনেছে সগৌরবে।

স্বায়ত্তশাসন আর স্বাধিকারের দাবিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাকে বেগবান করে অধিকার বঞ্চিত শোষিত-লাঞ্ছিত জনগণকে সেই ধারায় যুক্ত করার মধ্য দিয়ে তাদের বুকে স্বাধীনতার স্বপ্ন বুনে দেন বঙ্গবন্ধু। তারপর তারা আর পিছু তাকায়নি, চরম ত্যাগ আর অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে দীর্ঘকালের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছে, স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দিয়েছে স্বাধীনতার রূপকার মহান নেতা বঙ্গবন্ধুকে। একটি পরাধীন জাতির বুকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার স্বর্ণদুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে জন্ম নেওয়া এবং সামরিক শাসনের মধ্যে বেড়ে ওঠা সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তানের পেটের মধ্যে থেকে একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের মানুষকে আঘাতে আঘাতে প্রস্তুত করে এগিয়ে নেওয়া এ বড়োই গভীর এবং নিবিড় রাজনৈতিক শিল্পকলা। পরম মমতায় দেশের মানুষকে ভালোবাসলে তবেই এই শিল্পকলার সার্থক শিল্পী হওয়া যায়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সেই মহন শিল্পীর আঁকা বিশাল ক্যানভাসের ছবি, এ যেন রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রচিত অমর মহাকাব্য। বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সৃজনশীল নেতৃত্বই গণসম্পৃক্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির জাতিরাষ্ট্র স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অনিবার্য করে তোলে– এ নিয়ে আজ আর কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। বঙ্গবন্ধু আর বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন সত্তা হয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্যেই নিহিত আছে মুজিব নামের রক্তগোলাপের পরিপূর্ণ বিকশিত রূপ।

লেখক: প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক ও অধ্যাপক, গাংনী কলেজ, গাংনী, মেহেরপুর

Declaration of Independence

'THIS MAY BE MY LAST MESSAGE, FROM TODAY BANGLADESH IS INDEPENDENT. I CALL UPON THE PEOPLE OF BANGLADESH WHEREVER YOU MIGHT BE AND WITH WHATEVER YOU HAVE, TO RESIST THE ARMY OF OCCUPATION TO THE LAST. YOUR FIGHT MUST GO ON UNTIL THE LAST SOLDIER OF THE PAKISTAN OCCUPATION ARMY IS EXPELLED FROM THE SOIL OF BANGLADESH AND FINAL VICTORY IS ACHIEVED.'

[Message embodying declaration of Independence sent by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to Chittagong shortly after midnight of 25th March, i.e. early hours of 26th March, 1971 for transmission throughout Bangladesh over the ex-EPR transmitter.]

Source: Bangabandhu Speaks, A Government Publication, 1972 (BGP-71/72-2787F-3M)

স্বাধীনতার ঘোষণা

'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারীর মোকাবিলা করার জন্যে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।'

সূত্র : বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা, ২০১২

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো

নির্মলেন্দু গুণ

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মুক্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে–
'কখন আসবে কবি?' 'কখন আসবে কবি?'
এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না,
এই বৃক্ষে– ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না,
এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।
তাহলে কেমন ছিল সেদিনের সেই বিকেল বেলাটি?
তাহলে কেমন ছিল শিশু পার্কে, বেঞ্চে, বৃক্ষে,
ফুলের বাগানে ঢেকে দেওয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি?
জানি, সেদিনের সব স্মৃতি মুছে দিতে
হয়েছে উদ্যত কালো হাত।
তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ
কবির বিরুদ্ধে কবি,
মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ,
বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল,
উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান,
মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ...।
হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি,
শিশু পার্কের রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি
একদিন সব জানতে পারবে– আমি তোমাদের কথা ভেবে
লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প।
সেদিন এই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর;
না পার্ক না ফুলের বাগান,– এসবের কিছুই ছিল না,
শুধু একখণ্ড অখণ্ড আকাশ যে রকম, সে রকম দিগন্ত প্লাবিত
ধু-ধু মাঠ ছিল দূর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সবুজময়।
আমাদের স্বাধীনতাপ্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশে ছিল
এই ধু-ধু মাঠের সবুজে।
কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে এই মাঠে ছুটে এসেছিল
কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক, লাঙল জোয়াল কাঁধে
এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক, পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে
এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক, হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে
এসেছিল মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, করুণ কেরানী, নারী, বৃদ্ধ, বেশ্যা,
ভবঘুরে আর তোমাদের মতো শিশু পাতা-কুড়ানীরা দল বেঁধে।
একটি কবিতা পড়া হবে তার জন্য সে কী ব্যাকুল প্রতীক্ষা মানুষের।
'কখন আসবে কবি?' 'কখন আসবে কবি?'
শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা,
জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা–;
কে রোধে তাঁহার বজ্র কণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শুনলেন তাঁর
অমর কবিতাখানি:
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
সেই থেকে 'স্বাধীনতা' শব্দটি আমাদের।

বিজয় এবং বিজয়

জাকির আবু জাফর

তারও আগের গানটিও ছিল আমাদের সম্ভ্রান্ত বিজয়ের
ছিল আমাদের স্বকীয়তায় পল্লবিত বৃক্ষের সারি
আমাদের ইতিহাসের এক আশ্চর্য নাম ষোলো ডিসেম্বর
তোমরা তো জানোই কিভাবে বিজয় শব্দটি
আমাদের স্বাধীনতার উৎসব নিশ্চিত করেছে
বিজয় দিয়েছে একটি সবুজ মানচিত্রের সুখ
যেভাবেই দেখ একটি এমন এক বিজয়
যে আমাদের দিয়েছে
আরো বিজয়ের ধ্বনি
মৌমাছির মন্ত্রমুগ্ধ গান সেও কি বিজয়ের এবং
বিজয় উঁচিয়ে অজস্র সংগ্রামের পরিপূর্ণ নদী?
যার বুকে রক্তের আগুন! বারুদগন্ধী স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস?
বিজয় বিজয় বলে আমিও ধরেছি গান
আমিও বিছিয়েছি অযুত সংগীতের সেতার
শোনোনি আমার কণ্ঠের গীতিকা?
দেখ শর্ষের মাঠের ওপর বাতাসের ঢেউ
সেও তো বিজয় ধ্বনির এক আশ্চর্য নিশান
আগামী পৃথিবী তোমাকে ডাকছে–
ডাকছে শ্যামল এই বাংলাদেশ
যার মমতায় বিঁধে আছে আমাদের যাবতীয় স্বপ্নের ঘ্রাণ
বিজয়ই তো আমাদের স্বপ্নের কথা বলতে শিখিয়েছে
এসো কণ্ঠে কণ্ঠে রেখে বলো– বিজয় বিজয়
আমাদের তোমাদের সকলের বিজয় এবং
বিজয়।

পাখির গানে সূর্য জাগে

শাফিকুর রাহী

কোন রূপসী আকাশ কোলে আঁকলো রূপের এ আলপনা,
সৌন্দর্যেরই সপ্তকলায় ধ্যানি কবির রূপ বর্ণনা।
পারুল-কুমার-নিঝুম বনে রোদ্রপলাশ বট-শিমুলে,
শীতল পরশ বিছিয়ে বৃক্ষ সোমেশ্বর ও সুরমাকূলে।
অরণ্যেরই শোভা বাড়ে নানান বন্য ফুলে ফলে,
কী আনন্দে উঠল মেতে দুষ্টুরা সব দলেবলে
মেঘের কোলে চাঁদ-সুরুয আর এ কোন খেলা তারার হাটে,
কী অপরূপ স্বর্গশোভা গাঁও গেরামে দিঘির ঘাটে।
গিরির বুকে ঝরনাধারা, ঢেউ খেলে যায় কর্ণফুলি
জাম-জারুলে নৃত্য করে ঘুঘু টিয়ে ও বুলবুলি।
কার যে অমন মহত মহান আরাধনায় এই লোকালয়
সাজলো মাগো কাজল মাটির এ বিছানায় সব মধুময়।
কোথায় বলো অমন রূপের ঝরনাধারায় যায় বয়ে যায়
শত শত নদনদী আর সমুদ্র ধায় উপত্যকায়।
শ্যামলিমায় মায়ার বাঁধন– পাখির গানে সূর্য জাগে,
সাঁঝে আবার ঘরে ফেরা পাখির জিকির দারুণ লাগে।
উদার উদাস আকাশ দাওয়ায় চাঁদের মাসি বাজায় বাঁশি,
ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুকে হাসি গানে আমরা ভাসি।
সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে যুদ্ধজয়ের অহংকারে
আকাঙ্ক্ষারই আলোকছটায় স্বপ্ন গড়ি অন্ধকারে।

শেখ হাসিনা তুমি অনন্যা

খান আসাদুজ্জামান

শেখ হাসিনা তুমি অনন্যা
স্বদেশে প্রবাসে
তুমি প্রোজ্জ্বল সারা বিশ্বে।
তুমি সিদ্ধান্ত গ্রহণে চৌকসা
হারতে জানো না তুমি সহসা
নির্ভীক মহীয়ান
তুমি মহামতি সারা বিশ্বে।
তুমি বজ্রের মতো সুকঠিন
কুসুম কোমল তুমি চিরদিন
মাতৃত্বে মমতায়
তুমি মহীয়সী সারা বিশ্বে।
জয় করেছ তুমি জনতার মন
উজাড় করেছ আপন জীবন
নিপীড়িত জনতার
তুমি মাতৃরূপা সারা বিশ্বে।

বাঙালির বিজয়

বাবুল তালুকদার

চারদিকে যুদ্ধ মহাযুদ্ধ
থেমে থেমে গুলিবর্ষণ
মানুষ ছোটাছুটি করে দিগ্‌বিদিক
এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যায়
জীবন বাঁচানোর তাগিদে।
একাত্তরের পাকসেনাদের অত্যাচার
সারা বাংলাদেশ জুড়ে
রাজাকার, আলবদর, আলশামস
ঘরবাড়ি পুড়ে দেয়
পালিয়ে বেড়ায় মানুষ।
আলো ছেড়ে অন্ধকারে কাটায় দিন
নয়টি মাস যেন এভাবে চলে যায়
প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত
ঘুম নেই, খাওয়া নেই, গোসল নেই
চোখেমুখে কষ্ট আর বেদনার ছাপ,
নীল আকাশ ভারি হয়ে আছে আজও–
মুক্তিযোদ্ধা জীবন বাজি রেখে
ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশ ও মাটি রক্ষায়।
নয়টি মাস যুদ্ধ শেষে ছিনিয়ে আনে
একটি বিজয়, একটি দেশ,
একটি লাল-সবুজের পাতাকা।

ঢাকা লিট ফেস্ট

ইফফাত রেজা

৮ই নভেম্বর ২০১৯ সালে শুরু হয় তিন দিনব্যাপী ঢাকা লিট ফেস্ট। এই আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য বাংলার সঙ্গে বিশ্ব সাহিত্যের মেলবন্ধন।

বাংলা ভাষা বিশ্বের সপ্তম ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। আন্তর্জাতিকভাবে আয়োজিত এই সাহিত্য সম্মেলন মূলত পাঠক, প্রকাশক, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের মাঝে দূরত্ব ঘোচাতে সচেষ্ট হয়। তিনদিনের এই লিট ফেস্ট শুরুতেই বাংলা একাডেমি সবুজ প্রাঙ্গণ ছিল সাহিত্যমোদিদের অফুরান সমাবেশ। নবম লিট ফেস্টে সমাবেত হয়েছে নানা দেশ থেকে আগত লেখক। বাংলাদেশের পাঠক বুদ্ধিজীবী লেখকদের সঙ্গে নানা আলোচনায় উৎসবের নির্ধারিত বক্তৃতার অংশ নেন তারা। সাহিত্যাঙ্গনের অভিজাত এই আয়োজন ৯ বছর পেরিয়ে একদশকে পা রাখবে। এখন পর্যন্ত এদেশে এটাই শিল্প-সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো আন্তর্জাতিক আয়োজন।

৭ই নভেম্বর ২০১৯ ঢাকা লিট ফেস্টের অতিথিরা উৎসবের উদ্‌বোধন করেন

অধিবেশনের প্রথম দিনের আয়োজনে সাহিত্য অনুরাগীদের বিপুল উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। এবার উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ বুকার জয়ী বাঙালি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখক মনিকা আলী। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি ঢাকাস্থ এক দৈনিককে সাক্ষাৎকারে বলেন, আমি অভিভূত বাংলাদেশের মানুষের সাহিত্যের প্রতি এই অনুরাগ বাঙালির উন্নত সাংস্কৃতিক রুচির পরিচয় বহন করে। প্রথম দিন বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে উৎসবের উদ্‌বোধন করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। তিনি বলেন, এই উৎসব বিশ্বসাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার উৎসব।

ঢাকা লিট ফেস্ট 'হে উৎসব' নামে যাত্রা শুরু করেছিল ৯ বছর আগে। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বিদেশ থেকে আসা সাহিত্যিকদের প্রতি রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়টি সারা বিশ্বে তুলে ধরার আহ্বান জানান। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ও কবি হাবিবুল্লাহ সিরাজী বলেন, এবারের উৎসব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শতবর্ষ উপলক্ষে উৎসর্গ করা হয়েছে। এ কারণে এ আয়োজন বিশেষভাবে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। উৎসবের পরিচালক সাফাদ সায বলেন, মুক্তচিন্তা এবং বাকস্বাধীনতার জন্য এ উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম। এ উৎসব আমাদের সাহিত্যকে বিশ্বাঙ্গনে আরো পরিচিত করে তুলবে। এবারের আয়োজনে দেশ-বিদেশের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানের পর প্লানারি ফিকশন

'রেজিস্ট অর রিফিউজ'-এর মধ্য দিয়ে আয়োজনের ধারাবাহিক পর্ব শুরু হয় বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ অডিটোরিয়ামে। এতে উপস্থিত ছিলেন মনিকা আলীসহ পাঁচ দেশের পাঁচজন নারী লেখক। অন্যরা হচ্ছেন– ব্রাজিলীয় লেখক মারিয়া ফিলো সেনা বইসো লেপেসকি, ফিনল্যান্ডের মিন্না লিন্ডগ্রেন এবং ব্রিটিশ-ব্রাজিলীয় লেখক জারা রদ্রিগেজ ফাউলার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ভারতীয় লেখক সুমনা রায়।

উদবোধনী দিনের বড়ো আকর্ষণ ছিল জেমকন সাহিত্য পুরস্কার প্রদান। এবছর কথাসাহিত্য পুরস্কার পেল– অভিষেক সরকার ও কবিতায় রফিকুজ্জামান রনি।

মনিকা আলী ও প্রিয়ঙ্কা দুবে দুজনেই বিশ্বজুড়ে আলোচিত তাদের সৃষ্টির জন্য। মনিকা আলী বর্তমানে ইংরেজি সাহিত্যে অন্যতম বেস্ট সেলার ঔপন্যাসিক। তিনি ম্যান বুকার পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। তার লেখা 'ব্রিকলেন','ইন দ্যা কিচেন' ও 'দ্য আনটোল্ড স্টোরি'– তিনটি উপন্যাসই বিশ্বজুড়ে বিপুল সাড়া ফেলেছে। প্রিয়ঙ্কা দুবে ভারতের একজন সাংবাদিক। ভারতের ধর্ষণ, নারীর প্রতি সহিংসতা নিয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ভিত্তিক গ্রন্থ 'নো নেশন ফর উইমেন' তাকে বিশ্বজুড়ে পরিচিত করে তোলে। এই দুই জন লেখিকা প্রথমবারের মতো ঢাকায় আসেন।

শেষবেলায় ছন্দপতন ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের ঝাপটায়

ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের ঝাপটায় শেষ দিনের শেষ বেলা কিছুটা বিধ্বস্ত হয়েছে ঢাকা লিট ফেস্ট। তুমুল বৃষ্টির ফলে শেষ বেলায় সেশনগুলো বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। তৃতীয় দিনের সকালের অধিবেশন শুরু হয় ইসকনের সংগীত দলের ভজন-কীর্তন দিয়ে। এরপর শুরু হয় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। বৃষ্টির মধ্য দিয়েই সকাল ১০টায় শুরু হয় শেষ দিনের অধিবেশন। সকালের পর্বে বাংলা একাডেমির কসমিক টেস্টে 'পাওয়ার অব পিকচার' সেশনে উপস্থিত ছিলেন– গ্রাফিক নভেলিস্ট ও কার্টুনিস্ট ফাহিম আঞ্জুম ও চলচ্চিত্র-বিজ্ঞাপন নির্মাতা আরবার আক্তার। সঞ্চালক ছিলেন কার্টুনিস্ট সৈয়দ রাশাদ ইমাম। বিকেল তিনটায় মঞ্চের জুটি ও ব্যক্তি জীবনের জুটি ফেরদৌসী মজুমদার ও রামেন্দু মজুমদার আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ মঞ্চে বসেন জীবন ও পেশার গল্প নিয়ে। এ পর্ব সঞ্চালনা করেন নাট্যকার ও শিক্ষক আবদুস সেলিম।

লেখক: প্রাবন্ধিক

যুদ্ধশিশু

ড. শিল্পী ভদ্র

বীরাঙ্গনা মায়েরা যেমন হারিয়ে গেছেন আমাদের সমাজের অতল অন্ধকারে, যুদ্ধশিশুরাও তেমনি হারিয়ে গেছে এই বিশাল পৃথিবীর সুবিশাল ব্যাপ্তিতে। কেউ মনে রাখেনি তাদের কথা– ফরিদ আহমেদ (মুক্তমনার মডারেটর), তিনি বাংলাদেশের সন্তান; গুণী, মেধাবী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি বীণা ডি'কস্টা লিখিত 'বীরাঙ্গনা নারী' এবং 'যুদ্ধশিশু' প্রবন্ধসমূহ পড়ে কথাগুলো বলেছেন।

বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়ান স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকতায় নিয়োজিত ড. বীনা ডি'কস্টা বিভিন্ন এডোপশন এজেন্সি, বাংলা ওয়েবসাইট এবং সংবাদপত্রে আবেদন জানিয়েছিলেন, যুদ্ধশিশুদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। খুব অল্প কয়েকজনই তাদের জীবন কাহিনি জনসম্মুখে প্রকাশ করতে আগ্রহী ছিল। বীনা ডি'কস্টাকে লেখা ই-মেইলে এক যুদ্ধশিশু লিখেছিল–

> আমার দত্তক বাবা ছিল মহা বদমাশ এক লোক। সারাক্ষণই আমাকে অপমান করার চেষ্টা করত সে... আমি বছর চারেক আগে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম... আমি সবসময়ই ভাবি যে আমি কেন এই ক্যানাডিয়ান দম্পত্তির কাছে দত্তক হয়েছিলাম, যারা আমাকে দত্তক নেয়ার তিনমাসের মধ্যেই তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছিল... আমার শৈশব ছিল বিভীষিকাময়। আমার যখন খুব প্রয়োজন ছিল তখন আমার নিজের দেশ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আমার দিক থেকে। আর সে কারণেই আমি বাংলাদেশকে ঘৃণা করি। আমি মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে কাঁদি, কারণ আমার কোনো শিকড় নেই। একারণেই আমি চেষ্টা করছি যেখানে আমি জন্মেছি সেই দেশ সম্পর্কে কিছুটা জানতে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে গণ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বাঙালি রমণীরা। কতজন যে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন তার সঠিক পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। বীণা ডি'কস্টা তার 'Bangladesh's erase past' প্রবন্ধে জানাচ্ছেন, সরকারি হিসাব অনুযায়ী একাত্তরে ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছিল দুই লক্ষ নারীকে। একটি ইটালিয়ান মেডিক্যাল সার্ভেতে ধর্ষণের শিকার নারীর সংখ্যা বলা হয়েছে চল্লিশ হাজার। লন্ডন ভিত্তিক International Planned Parenthood Federation (IPPF) এই সংখ্যাকে বলেছে দুই লাখ। অন্যদিকে যুদ্ধশিশুদের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সমাজকর্মী ড. জিওফ্রে ডেভিসের মতে, এই সংখ্যা এর চেয়েও অনেক বেশি। সুজান ব্রাউনমিলার ধর্ষিতার সংখ্যা চার লাখ বলে উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো সূত্র মতে সংখ্যাটা প্রায় সাড়ে চার লাখের কাছাকাছি হতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারীরা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্বর পাকহানাদার, তাদের দোসর আলবদর-আলশামস-রাজাকারদের দ্বারা বীরাঙ্গনা নারীদের গর্ভে যেসব শিশুসন্তান জন্মেছে, তাদেরই নাম 'যুদ্ধশিশু'। মুক্তিযুদ্ধে প্রায় তিন লক্ষ মতান্তরে চার বা সাড়ে চার লক্ষ নারী ধর্ষণের শিকার হন। এই যুদ্ধশিশুরা অক্টোবর ১৯৭১ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৭২-এর মাঝের সময়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের মায়েরা সমাজ, পরিবারের ভয়ে ও লজ্জায় অনন্যোপায় হয়ে জন্মের পরই অনেকে শিশুদের পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। অনেকে শিশুকে জন্ম দিয়েই আত্মগোপন করেন, কেউ আত্মহত্যা করেন; কেউবা আবার অসুস্থ হয়ে ধুকে-ধুকে মারা যান। পরিচয়হীন এই যুদ্ধশিশুদের অধিকাংশেরই স্থান হয় কোনো মাতৃসদনে, রাজধানীর মাদার তেরেসা আশ্রয়কেন্দ্রে কিংবা কোনো অনাথ আশ্রম ও সেবাকেন্দ্রে।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এনবিসি টেলিভিশনের ধর্ষিতা নারীদের ওপর করা একটি ভিডিও রিপোর্ট তুলে দিয়েছেন ফরিদ আহমেদ। পাকিস্তান আর্মি, পরিকল্পিতভাবেই বাঙালি মহিলা এবং মেয়েদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছেন; তার প্রমাণ পাওয়া যায় ২০০২ সালের মার্চ মাসের বাইশ তারিখে *ডন* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি আর্টিকেল থেকে। যেখানে কোট করা হয়েছে–

> প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালে সরাসরি বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য পাকিস্তান আর্মিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যশোরে ছোট্ট একদল সাংবাদিকের সাথে কথা বলার সময়, তিনি এয়ারপোর্টের কাছে জড়ো হওয়া একদল বাঙালির দিকে অঙুলি নির্দেশ করে বলেন, 'আগে এদেরকে মুসলমান বানাও'। এই উক্তির তাৎপর্য সীমাহীন। কারণ, উচ্চ পর্যায়ের সামরিক অফিসারদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, বাঙালিরা খাঁটি মুসলমান নয়। এই ধারণার সঙ্গে আরো দুটো স্টেরিওটাইপ ধারণাও যুক্ত ছিল– বাঙালিরা দেশপ্রেমিক পাকিস্তানি নয় এবং তারা হিন্দু-ভারতের সাথে অনেক বেশি ঘনিষ্ট।

ইয়াহিয়া খানের এই উক্তিতে উৎসাহিত হয়ে পাকিস্তান আর্মি, বাঙালি মেয়েদেরকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে সাচ্চা মুসলমান বাচ্চা পয়দা করাতে মেতে ওঠে। পাকিস্তানি সৈন্য এবং তার এদেশীয় দোসররা শুধু যত্রতত্র ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি। জোর করে মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে গিয়েছে ক্যাম্পে। দিনের পর দিন আটকে রেখে হররোজ ধর্ষণ করেছে। পালাতে না পারার জন্য শাড়ি খুলে নগ্ন করে রাখা হতো তাদেরকে। সিলিং-এ ঝুলে আত্মহত্যা রোধে তাদের চুল কেটে দিত।

পাকিস্তান আর্মির দোসর রাজাকার এবং আলবদররা জনগণকে বিশেষ করে, হিন্দু সম্প্রদায়কে সন্ত্রস্ত করে দেশ ছাড়া করে। তাদের সম্পত্তি এবং জমিজমা দখলের জন্য ধর্ষণকে বেছে নিয়েছিল তারা।

পাকিস্তান আর্মির উচ্চপদস্থ অফিসাররা, ব্যাপক হারে ধর্ষণের ব্যাপারে জানতেন এবং এতে তাদের প্রচ্ছন্ন সম্মতির ব্যাপারে জানা যায়, নিয়াজীর এক মন্তব্য থেকে। নিয়াজী একাত্তরে সংগঠিত ধর্ষণের ঘটনা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে একটি অসংলগ্ন উক্তি করেছিলেন– এরূপ আশা করতে পারেন না যে, সৈন্যরা থাকবে, যুদ্ধ করবে এবং মৃত্যুবরণ করবে পূর্ব পাকিস্তানে আর শরীরবৃত্তীয় চাহিদা নিবৃত্ত করতে যাবে ঝিলামে!

প্রথম আলো ব্লগে আইরিন সুলতানা তার প্রবন্ধ ১৯৭১: বীরাঙ্গনা অধ্যায়-এ সুসান ব্রাউনমিলারের গ্রন্থ Against Our Will: Men, Women and Rape থেকে অনুবাদ করেছেন।

Brownmiller লিখেছিলেন–

> একাত্তরের ধর্ষণ নিছক সৌন্দর্যবোধে প্রলুব্ধ হওয়া কোনো ঘটনা ছিল না আদতে; আট বছরের বালিকা থেকে শুরু করে পঁচাত্তর বছরের নানী-দাদীর বয়সী বৃদ্ধাও স্বীকার হয়েছিল এই লোলুপতার। পাকসেনারা ঘটনাস্থলেই তাদের পৈচাশিকতা দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়নি; প্রতি একশ জনের মধ্যে অন্তত দশ জনকে তাদের ক্যাম্প বা ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হতো সৈন্যদের জন্য। রাতে চলত আরেক দফা নারকীয়তা। কেউ কেউ হয়ত আশিবারেও বেশি সংখ্যক ধর্ষিত হয়েছে! এই পাশবিক নির্যাতনে কতজনের মৃত্যু হয়েছে, আর কতজনকে মেরে ফেলা হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা হয়ত কল্পনাও করা যাবে না (Brownmiller, p. 83)।

ভাস্কর্যে একাত্তরে বাংলার নারীদের ওপর চালানো বর্বরতা, মুজিবনগর

ধর্ষিতা নারী গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং কতজন শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল তাও পুরোপুরি অনিশ্চিত। সামাজিক অপবাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেক মা-ই সেই সময় করেছিলেন আত্মহত্যা। অসংখ্য গর্ভবতী মহিলা চলে গিয়েছিলেন ভারতে বা অন্য কোথাও গোপনে সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য। অনেক শিশু জন্মেছিল ঘরে দাইয়ের হাতে– যার কোনো রেকর্ড নেই। দুঃখজনক হচ্ছে যে, নির্ভরযোগ্য এবং ত্রুটিহীন কোনো পরিসংখ্যানই নেই। ফলে, যুদ্ধশিশুর সংখ্যা কত ছিল তারজন্য আমাদেরকে নির্ভর করতে হয় অনুমান এবং ধারণার উপর। সামান্য কিছু দলিলপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সরকারি এবং বেসরকারি সংগঠনের কাছে। কিছু কিছু আছে বিদেশি মিশন এবং মিশনারি সংস্থাগুলোর কাছে।

সরকারি এক হিসাবে জন্মগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা বলা হয়েছে তিন লাখ। কিন্তু সেই পরিসংখ্যানের পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ড. ডেভিসের মতে প্রায় দুই লক্ষ রমণী গর্ভবতী হয়েছিলেন। কিন্তু এই সংখ্যা সম্পূর্ণ অনুমানের ভিত্তিতে করা, কোনো গবেষণা থেকে প্রাপ্ত নয়।

সাংবাদিক ফারুক ওয়াসিফ তার 'সেইসব বীরাঙ্গনা ও তাদের নাপাক শরীর' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন–

> ১৯৭২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তার কাজের ওপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৎকালীন দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার মতে, সরকার উদ্যোগ নেওয়ার আগেই ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার নারীর ভ্রূণ স্থানীয় দাই, ক্লিনিকসহ যার পরিবার যেভাবে পেরেছে সেভাবে 'নষ্ট' করেছে।

ড. এম এ হাসান তার প্রবন্ধ 'The Rape of 1971: The Dark Phase of History'-তে বলেন, সারা দেশের গর্ভপাত কেন্দ্র এবং হাসপাতালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দশ শতাংশের চেয়েও কম সংখ্যক ধর্ষিতা সেগুলোতে ভর্তি হয়েছিলেন। বেশিরভাগেরই ঘরেই গর্ভপাত ঘটানো হয়েছে এবং সামাজিক পরিস্থিতির কারণে তা গোপন রাখা হয়েছে। এছাড়া, যে সমস্ত মহিলারা সেপ্টেম্বরের পরে গর্ভবতী হয়েছেন বা যাদের গর্ভাবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল তারা কেউই গর্ভপাত কেন্দ্র বা হাসপাতালে যাননি।

তিনি তার প্রবন্ধে সুসান ব্রাউনমিলারের বই সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন–

> বিখ্যাত ফেমিনিস্ট লেখক Susan Brownmiller-এর 'Against Our Will: Men, Women and Rape' বইতে আছে–
>
> During the nine-month terror, terminated by two-week armed intervention of India, a possible three million persons lost their lives, ten million fled across the border to India, and 200,000, 300,000 or possibly 400,000 women (three sets of statistics have been variously quoted) were raped (মিলার, ১৯৯৩: ৮০)।

বইটিতে উল্লেখ আছে–

> Accurate statistics on the number of raped women who found themselves with child were difficult to determine but 25,000 is the generally accepted figure (মিলার, ১৯৯৩: ৮৪)।

সুসান ব্রাউনমিলারের লেখাটা পাকিস্তানিদের ভয়াবহ বর্বরতার প্রামাণ্য দলিল:

> Khadiga was regularly abused by two men a day; others, she said, had to service seven to ten men daily. (Some accounts have mentioned as many as eighty assaults in a single night, a bodily abuse that is beyond my ability to fully comprehend, even as I write these words) (মিলার, ১৯৯৩: ৮৩) ।

ড. এম এ হাসান তার প্রবন্ধে আরও লিখেছেন–

> তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্পের অধীনে ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয় আট খণ্ডে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও দলিলপত্র। এটিই মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র আনুষ্ঠানিক তথ্যকোষ, যাতে এই নারীদের বিবৃতি আছে। মোট ২২৭ জনের মৌখিক জবানবন্দির মধ্যে ২৩ জন নারী। তাঁদের মাত্র ১১ জন যৌন নিপীড়নের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। এসব দলিলে একাত্তরে মেয়েদের ওপর ধর্ষণের নৃশংসতার কিছুটা আভাস আছে, কিন্তু তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না।...

সুসান ব্রাউনমিলারের অ্যাগেইনস্ট আওয়ার উইল: মেন, উইমেন অ্যান্ড রেপ, সিরাজুল ইসলাম ও মিয়া শাজাহান সম্পাদিত বাংলাপিডিয়া: বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ ও অন্যান্য দলিলপত্রের ভিত্তিতে ধর্ষিত নারীর সংখ্যা ৪০ হাজার থেকে আড়াই লাখ, গর্ভপাতের সংখ্যা ২৩ হাজার থেকে ৫০ হাজার এবং যুদ্ধশিশুর সংখ্যা ৪০০ থেকে ১০ হাজারের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানে আসতে না পারায়, বিষয়টি অমীমাংসিতই থেকে যায়।

ক্যানাডিয়ান ইউনিসেফ কমিটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর যুদ্ধপূর্ব এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। রেডক্রস প্রতিনিধি এবং ইউনিসেফের লোকজনের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অটোয়ার মূল অফিসে জানান যে, বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া যুদ্ধশিশুর সংখ্যা আনুমানিক দশ হাজার। সুসান ব্রাউনমিলারের মতে, সন্তান জন্ম দিয়েছিল এমন বীরাঙ্গনার সংখ্যা পঁচিশ হাজার।

গীতা দাস তার মুক্তমনায় প্রকাশিত 'তখন ও এখন' ধারাবাহিকের ২৪তম পর্বে পাকিস্তান আর্মি কর্তৃক নির্যাতিতা তার কিশোরী মাসী প্রমিলার করুণ পরিণতির কথা বর্ণনা করেছেন। সেই লেখায় ফরিদ আহমেদ নিম্নোক্ত দীর্ঘ মন্তব্য করেছিলেন–

> মুক্তিযুদ্ধের করুণতম অধ্যায়ের নাম হচ্ছে বীরাঙ্গনা নারী। যুদ্ধে সকল পক্ষেরই শত্রুর পাশাপাশি কোথাও না কোথাও মিত্রও থাকে। কিন্তু এইসব অসহায় নারীদের মিত্রপক্ষ বলে কিছু ছিল না। সকলেই ছিল তাদের শত্রুপক্ষ, তা সে শত্রুই হোক কিম্বা মিত্র নামধারীরাই হোক। যুদ্ধের সময় নয়মাস তাদেরকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী, আলবদর, আলশামস, রাজাকার আর বিহারীদের কাছে শারীরিকভাবে ধর্ষিত হতে হয়েছে। আর যুদ্ধের সময় বা পরে যারা তাদের মিত্র হওয়ার কথা ছিল, পরম স্নেহে বা ভালোবাসায় বুকে টেনে নেবার কথা ছিল, সেই বাপ-চাচা, ভাই বেরাদারেরাই তাদেরকে ধর্ষণ করেছে মানসিকভাবে, আরো করুণভাবে,আরো কদর্যরূপে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বীরাঙ্গনাদেরকে তাচ্ছিল্য করে এর কাছাকাছি উচ্চারণের চরম অবমাননাকর একটা নামেও ডেকেছে অনেকে। আমি একে বলি সামাজিক ধর্ষণ। সামাজিক এই ধর্ষণ শারীরিক ধর্ষণের চেয়ে কম কিছু ছিল না বীরাঙ্গনাদের জন্য।

আমাদেরই কারণে যে পঙ্কিলে তাদেরকে পতিত হতে হয়েছিল অনিচ্ছুকভাবে, মমতা মাখানো হাত দিয়ে তাদের গা থেকে সেই পঙ্কিল সাফসুতরো করার বদলে নিদারুণ স্বার্থপরতা এবং হিংস্রতার সঙ্গে আমরা তাদেরকে ঠেলে দিয়েছিলাম আরো গভীর পঙ্কিলের মাঝে। পাছে না আবার গায়ে কাদা লেগে অশুদ্ধ হয় আমাদের এই বিশুদ্ধ সমাজ। অনিচ্ছাকৃত যে গর্ভাবস্থা তারা পেয়েছিলেন শত্রুর কাছ থেকে, সমাজের রক্তচক্ষু এবং ঘৃণার কারণে তা লুকানোটাই ছিল সেই সময় সবচেয়ে বেশি জরুরি কাজ। সমাজকে বিশুদ্ধ রাখতে তাদের কেউ কেউ গর্ভনাশ করেছেন নীরবে, কেউ কেউ আবার নিজের জীবননাশ করেছেন সংগোপনে। আর যারা তা পারেননি, তারা লোক চক্ষুর অন্তরালে সন্তান জন্ম দিয়ে চলে গেছেন অজানার পথে। জন্ম মুহূর্তেই চিরতরে ছিন্ন হয়ে গেছে মা আর তার সন্তানের নাড়ীর টান। দেবশিশুর মতো সেই সব যুদ্ধশিশুরাও এখন কে কোথায় তার কিছুই জানি না আমরা। এর দায়ভার কার? আমাদের এই সমাজের নয় কি?'

দেশ স্বাধীনের পরেই পরিবারের সম্মানের কথা ভেবেই নিজেদেরকে লুকিয়ে ফেলেছিল বীরাঙ্গনা নারীরা। এই নিষ্ঠুর সমাজের কাছে কোনো চাওয়া-পাওয়া ছিল না তাদের। নিয়তির কাছে সঁপে দিয়েছিল তারা নিজেদেরকে। যে দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাদেরকে একাত্তরে; তার যাতনা ভুলে থাকা রীতিমতো অসাধ্য ছিল তাদের জন্য। কিন্তু নিজের সমাজও তাদেরকে গ্রহণ করেনি সহজভাবে। 'বীরাঙ্গনা' নামের উপাধি তাদের সম্মানের চেয়ে অসম্মান হয়ে এসেছিল বেশি। কোনো কিছুর প্রত্যাশাই তারা করেনি আমাদের কাছ থেকে। তারপরও কি কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে মনের গহীন কোণে কোনো আশা ঝিলিক দিয়ে উঠেনি তাদের মনে। আশা কি জাগেনি, যে দেশের জন্য তারা এত অপমান আর যন্ত্রণা সয়েছেন সেই দেশের কেউ একজন সামান্য একটু সম্মান দেখাবে তাদের। সামান্য একটু মমতা দিয়ে জানতে চাইবে তাদের সুখ-দুঃখের কাহিনি। নীলিমা ইব্রাহিমের 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' গ্রন্থে বীরাঙ্গনা রীনা তার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন–

> একটি মুহূর্তের আকাঙ্ক্ষা মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত রয়ে যাবে। এ প্রজন্মের একটি তরুণ অথবা তরুণী এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, বীরাঙ্গনা আমরা তোমাকে প্রণতি করি, হাজার সালাম তোমাকে। তুমি বীর মুক্তিযোদ্ধা, ঐ পতাকায় তোমার অংশ আছে। জাতীয় সংগীতে তোমার কণ্ঠ আছে।

যুদ্ধশিশু

> এদেশের মাটিতে তোমার অগ্রাধিকার। সেই শুভ মুহূর্তের আশায় বিবেকের জাগরণ মুহূর্তে পথ চেয়ে আমি বেঁচে রইবো। ...

নীলিমা ইব্রাহিম তার 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি'র ভূমিকায় ৩০-৪০ জন মেয়ের উল্লেখ করেছেন, যারা আত্মসমর্পণকারী বা বন্দি পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে ভারতে চলে গিয়েছিলেন (আমি বীরাঙ্গনা বলছি, নীলিমা ইব্রাহিম, জাগৃতি, ১৯৯৮)।

ধর্ষিতা মহিলাদের গর্ভপাতের জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঢাকায় পৌঁছান ব্রিটিশ, আমেরিকান এবং অস্ট্রেলিয়ান ডাক্তাররা। তখন 'সেবাসদন নামে' বেশ কিছু গর্ভপাত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে তারা বাংলাদেশি ডাক্তারদের সহযোগিতায় গর্ভপাত করান। সেই সময়কার সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ যেমন বিচারপতি কে. এম. সোবহান, মিশনারিজ অব চ্যারিটির সুপারভাইজার মার্গারেট মেরি, ড. জিওফ্রে ডেভিসের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, ঢাকার বিভিন্ন ক্লিনিকে দুই হাজার তিনশ গর্ভপাত করানো হয়েছিল। দেশব্যাপী বাইশটি 'সেবাসদন'-এ প্রতিদিন তিনশ' থেকে চারশ' শিশু জন্ম নিত।

যুদ্ধশিশু শামা জামিলা ঢাকার মিশনারিজ অব চ্যারিটিতে

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ধর্ষিতা নারীদেরকে 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাদেরকে নিজের মেয়ে হিসেবে উল্লেখ করেন।

যেসব সংস্থা বা মানুষ এই এডোপশনের ব্যবস্থায় জড়িত ছিলেন তাদের বেশ কয়েকজন তখন কাজ করতেন ভারতে। এমন একটি কানাডীয় দম্পতি হচ্ছেন– রবার্ট ফেরি এবং হেলকি ফেরি। রবার্ট ফেরি ছিলেন একজন কানাডীয় চিকিৎসক, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি ভারতে স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সেখানকার বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনারত হেলকি ফেরির সাক্ষাৎ পান, তারপর তাদের বিয়ে হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতে থাকার কারণে মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা এবং নারী-শিশুর দুর্দশা নিয়ে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন তারা।

তাই কানাডায় ফিরে এসে তারা ১৯৭২ সালে, যুদ্ধশিশুদের দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে কাজে লেগে যান। কানাডায় ৭টি পরিবারকে রাজি করান; সেখান থেকেই শিশুদের ব্যাপারে প্রথমে খবরটা জানাজানি হয়। কিন্তু কানাডীয় সরকারের দীর্ঘসূত্রিতা হেলকি ফেরিকে দারুণভাবে হতাশ করে। তখন হেলকি ফেরি খাদ্য অনশন শুরু করেন কানাডীয় শিশু মন্ত্রণালয়ের কাজের ঢিলেমির প্রতিবাদে। সাড়ে তিনদিন পরে তিনি অনশন ভাঙেন। কানাডীয় সরকার আশ্বাস দেন, তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। গ্লোব অ্যান্ড মেইলের ১৯৭২ সালের ২১শে জুন তারিখের খবর–

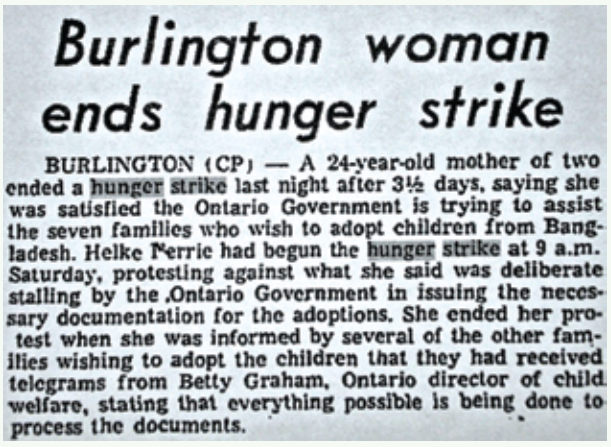

Burlington woman ends hunger strike

BURLINGTON (CP) — A 24-year-old mother of two ended a hunger strike last night after 3½ days, saying she was satisfied the Ontario Government is trying to assist the seven families who wish to adopt children from Bangladesh. Helke Nerric had begun the hunger strike at 9 a.m. Saturday, protesting against what she said was deliberate stalling by the Ontario Government in issuing the necessary documentation for the adoptions. She ended her protest when she was informed by several of the other families wishing to adopt the children that they had received telegrams from Betty Graham, Ontario director of child welfare, stating that everything possible is being done to process the documents.

এরপর, ১৯৭২-এর জুলাই মাসে রবার্ট ফেরি এবং হেলকি ফেরি বাংলাদেশে আসেন অনাথাশ্রম ঘুরে যুদ্ধশিশু সংগ্রহে। তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখেন চিকিৎসক রবার্ট। প্রথম খবরটির একমাস পরে, জুলাই মাসের ২০ তারিখের খবরে জানা যায়, ফেরি দম্পতি বাংলাদেশ থেকে রওনা হয়েছেন কানাডার পথে; সঙ্গে ১৫ জন শিশু– যাদের বয়স ৩ সপ্তাহ থেকে ৮ মাস। অন্টারিও, কুইবেক, নোভা স্কোশিয়া এবং সাসকাচুয়ান প্রদেশের বিভিন্ন নতুন বাসায় ঠাঁই হবে শিশুগুলোর।

সেই সময় বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় এই শিশুরা সমাজে তৈরি করেছিল ভয়াবহ সংকট এবং সমস্যা। কেউ কেউ এই শিশুদেরকে বলেন 'অবাঞ্ছিত সন্তান', কেউ বলেন 'অবৈধ সন্তান', কেউ বলেন 'শত্রু শিশু' আবার কেউ বা নিদারুণ ঘৃণায় উচ্চারণ করেন 'জারজ সন্তান' বলে। ফলে এই সংকট থেকে কী করে মুক্তি পাওয়া যায় সেটাই হয়ে উঠে সেই সময়কার আশু চিন্তার বিষয়। সেই চিন্তা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়কেও ছুঁয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত অনুরোধে জেনেভা ভিত্তিক International Social Service (ISS/AB)-এর ইউএস ব্রাঞ্চ সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে বাংলাদেশ সরকারকে যুদ্ধশিশুদের বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য। সরকারি দুটি সংগঠন Central-Organization for Women এবং Rehabilitation and Familz Planning Association কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে থাকে ISS-এর পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের পুরো পর্যায় জুড়ে।

তাছাড়া, বিদেশি নাগরিকদের সহজে যুদ্ধশিশুদের দত্তক নিতে পারার জন্য ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশে প্রজ্ঞাপিত হয় The Bangladesh Abandoned Children (Special Provisions) Order। বাংলাদেশ থেকে যুদ্ধশিশুদের দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে সর্বপ্রথম আগ্রহ দেখায় 'কানাডা'। মাদার তেরেসা এবং তার সহকর্মীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং বাংলাদেশ সরকারের শ্রম এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চেষ্টায় দুটো কানাডিয়ান সংগঠন দত্তক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। এর মধ্যে একটি ছিল মন্ট্রিয়লভিত্তিক অলাভজনক আন্তঃদেশীয় দত্তক প্রতিষ্ঠান Families for Children এবং অন্যটি ছিল একদল উৎসাহী কানাডিয়ানের গড়া টরন্টোভিত্তিক অলাভজনক দত্তক প্রতিষ্ঠান Kuan-Yin Foundation। কানাডা ছাড়াও যেসব দেশ যুদ্ধশিশুদের দত্তক নিতে এগিয়ে এসেছিল তারা হচ্ছে– যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, সুইডেন এবং অস্ট্রেলিয়া। এছাড়া, অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থাও এগিয়ে এসেছিল সেই সময়।

'৭১-এর যুদ্ধশিশু: অবিদিত ইতিহাস' গ্রন্থটি মুস্তফা চৌধুরী কর্তৃক ইংরেজিতে লিখিত Unconditional Love: Story of Adoption of 1971 War Babies নামীয় গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ। এ গ্রন্থটি ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের 'একাডেমিক প্রেস অ্যান্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি' কর্তৃক প্রকাশিত হয়। মুস্তফা চৌধুরী একজন কানাডাবাসী বাংলাদেশি। তিনি কানাডার ফেডারেল সরকারের একজন কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন। '৭১-এর যুদ্ধশিশু: অবিদিত ইতিহাস' গ্রন্থটি তার কুড়ি বছরের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফল। গ্রন্থটিতে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জন্ম নেওয়া ১৫ জন যুদ্ধশিশুর জীবনকাহিনি তুলেছেন। কানাডার ১৪টি পরিবার ১৯৭২-এ এই ১৫ জন শিশুকে দত্তক নিয়েছিল। এই ১৫ জন শিশুর নাম: শিখা, ওমর, অরুণ, সাবিত্রী, বাথল, রাণী, জরিনা, অনিল, সমর, রাজিব, মলি, রেজিনা, আমিনা, রুফিয়া ও প্রদীপ। যুদ্ধশিশুদের প্রথম ব্যাচ ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে কানাডায় পৌঁছলে তা মিডিয়ার ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করে।

লেখক: সাহিত্যিক ও গবেষক

মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যা
বাঙালি শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আত্মদান

সুষমা ফাল্গুনী

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ইতিহাসের নৃশংসতম ও বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ। বাঙালি বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদগণ এই পরিকল্পিত নিধনযজ্ঞের শিকার হন। পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশনা ও মদদে একশ্রেণির দালালরা বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য ও নেতৃত্বহীন করার হীন চক্রান্তে এই হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে। বুদ্ধিজীবীরা জনগণকে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করার কাজে বরাবরই ছিলেন তৎপর এবং তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের স্বৈরাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণকে আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেন। এ কারণে পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবীরা বরাবরই ছিলেন পাকিস্তানি শাসকদের বিরাগভাজন। বাঙালি জাতিকে বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়ায় পরিণত করার লক্ষ্যে চলে এ নীলনকশার বাস্তবায়ন।

শহিদ বুদ্ধিজীবী

জাতিকে পদানত, বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার নানা আয়োজনে ভরপুর ছিল পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসনকাল। এই আয়োজনে ধর্ম হয়েছিল তাদের ঢাল ও তলোয়ার। অন্যদিকে এর বিপরীত ধারা বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে বাঙালি সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক চর্চা অপরিহার্য। এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন বুদ্ধিজীবীগণ। বাঙালির জাতীয়তাবাদী জাগরণ একদিকে বিকশিত হয়েছিল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বাতাবরণে, অন্যদিকে জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা বা আত্মাকে ক্ষুরধার করেছিল অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবীরা। বাংলা একাডেমি প্রণীত 'শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ' গ্রন্থ অনুযায়ী বুদ্ধিজীবী অর্থ 'লেখক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, সকল পর্যায়ের শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, ভাস্কর, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, চলচ্চিত্র ও নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সমাজসেবী ও সংস্কৃতিসেবী'। পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে প্রেরণা সঞ্চার করেছেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মতো বুদ্ধিজীবীরাও। রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের পাশাপাশি বুদ্ধিজীবী-সমাজের বৌদ্ধিক প্রেরণায় শাণিত হতে থাকে বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন। রাজনৈতিক চেতনার পাশাপাশি বাঙালিকে সাংস্কৃতিক চেতনায় জাগ্রত রাখার পশ্চাতে বুদ্ধিজীবীদের প্রেরণাই ছিল সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। বাঙালি জাতিকে পঙ্গু করে দেওয়ার লক্ষ্যেই বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা রচনা করে পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামসসহ মুসলিম লীগ, জামায়াত আর ছাত্রসংঘের অসংখ্য নেতাকর্মী। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে একাত্তরে অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশে যে গণহত্যা শুরু হয়, তার অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিলেন বুদ্ধিজীবী মহল। তাই প্রথম রাত থেকে শুরু করে একেবারে শেষদিন পর্যন্ত বুদ্ধিজীবী নিধন প্রক্রিয়া চলেছে পরিকল্পিতভাবে। পরিকল্পিত পন্থায় এই নিধন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। কারণ তারা ভেবেছিল এসব কীর্তিমান মানুষকে হত্যা করা হলে বাঙালি জাতীয়তাবোধ ধ্বংস হবে।

২৫শে মার্চে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞে মেতেছিল। অসংখ্য নিরীহ নিরস্ত্র নরনারীর সঙ্গে ওরা হত্যা করেছিল দেশের অনেক বরেণ্য ব্যক্তিকে। ঢাকায় নিরীহ জনগণের ওপর পাকবাহিনীর আক্রমণের সময় থেকেই শুরু হয় বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ। পাকিস্তানি সেনারা তাদের অপারেশন সার্চলাইট কর্মসূচির আওতায় চিহ্নিত বুদ্ধিজীবীদের খুঁজে বের করে হত্যা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককে ২৫শে মার্চ রাতেই হত্যা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে তারা দেশের প্রতিটি অঞ্চলে নির্বিচারে গণহত্যা ও নারী ধর্ষণ করে। শেষ আঘাতটি আসে যখন বাংলাদেশের মাটিতে তারা চূড়ান্ত পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে। এই হত্যা অভিযানটি মূলত পরিচালিত হয় ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণের তিনদিন আগে। পরিকল্পিত এই হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত পরিণতি আসে ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১, যে দিন তারা একমাত্র ঢাকা নগরীতেই দুইশরও বেশি বুদ্ধিজীবীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে নিষ্ঠুর পন্থায় হত্যা করে। ঢাকায় এ হত্যাকাণ্ড শুরু হয় এবং ক্রমে ক্রমে তা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে, বিশেষত জেলা ও মহকুমা শহরে সম্প্রসারিত হয়। কেননা তারা স্পষ্ট দেখে- চরম বিপর্যয় আসন্ন, পরাজয় একেবারেই সন্নিকটে- তখনই তারা সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে তৎপরতা আরো জোরদার করে।

হত্যা মিশনে নিযুক্ত অস্ত্রধারীরা গেস্টাপো কায়দায় তালিকাভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে তুলে আনে, তাদের চোখ বাঁধে, তারপর ঢাকার মোহাম্মদপুর, নাখালপাড়া, মিরপুর, রাজারবাগের বিভিন্ন টর্চার সেলে নিয়ে যায়। কারফিউ বহাল থাকায় লোকজন ঘরের বাইরে থাকে না বলে সুবিধে হয় হত্যাকারীদের। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে, গুলি করে এসব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয় এবং রায়েরবাজার, মিরপুরের আলোকদি, কালাপানি, রাইনখোলা ইত্যাদি জায়গায় লাশ ফেলে রাখা হয়। ১৬ই ডিসেম্বরের পর মুক্তিবাহিনী যখন ঢাকা শহরে প্রবেশ করে তখন তারা এদের লাশ দেখতে পায় বিভিন্ন নালা-ডোবায়। এদের প্রায় প্রত্যেকের হাত ও চোখ বাঁধা, শরীরের বিভিন্ন অংশে বেয়নেটের নির্বিচার আঘাতের চিহ্ন। এঁদের অনেককে শনাক্ত করা যায়নি।

ঢাকা বা অন্যান্য বড়ো বড়ো শহরই কেবল নয়, বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলেই অগণিত বধ্যভূমি আছে, যেখানে বাঙালির শ্রেষ্ঠ

শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, মিরপুর, ঢাকা

বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে ফেলে রাখা হয়েছে। এঁরা তাঁদের প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু আদর্শচ্যুত হননি। বাংলাদেশের জন্মে এঁদের অবদান অনস্বীকার্য। প্রখ্যাত লেখক ও কীর্তিমান চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হানকে হত্যা করা হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর। ৩০শে জানুয়ারি ১৯৭২ তিনি তার ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে মিরপুরে গিয়েছিলেন। আর ফিরে আসতে পারেননি।

সব শহিদ বুদ্ধিজীবীর পরিচয় দূরের কথা, তাঁদের প্রকৃত সংখ্যাই নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। তবে তবে বিভিন্ন পরিসংখ্যানে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী বাংলাপিডিয়ার বর্ণনামতে, প্রাপ্ত তথ্যসূত্র থেকে শহিদদের মোটামুটি একটা সংখ্যা দাঁড় করানো যায়। এঁদের মধ্যে ছিলেন ৯৯১ জন শিক্ষাবিদ, ১৩ জন সাংবাদিক, ৪৯ জন চিকিৎসক, ৪২ জন আইনজীবী, ৯ জন সাহিত্যিক ও শিল্পী, ৫ জন প্রকৌশলী ও অন্যান্য ২ জন মোট ১,১১১ জন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের দোসর আলবদর, আলশামস ও রাজাকার বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন তাদের অন্যতম হচ্ছেন– দার্শনিক ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ড. আনোয়ার পাশা, ড. আবুল খায়ের, ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, অধ্যাপক রাশেদুল হাসান, অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, ড. সন্তোস চন্দ্র ভট্টাচার্য, ড. সিরাজুল হক খান ও অধ্যাপক সায়েদুল হাসান। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দার, অধ্যাপক মীর আব্দুল কাইয়ুম। এছাড়াও আছেন ডা. মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী, ডা. আব্দুল আলীম চৌধুরী, সাংবাদিক-সাহিত্যিক শহীদুল্লাহ কায়সার, সিরাজউদ্দিন হোসেন, নিজামুদ্দিন আহম্মদ, সেলিনা পারভীন, আলতাফ মাহমুদ, জহির রায়হান এবং রনদাপ্রসাদ সাহাসহ অন্যরা।

বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহান স্বাধীনতাযুদ্ধকালে পাকিস্তানবাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত 'বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ' নামের একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) তৈরি করেছে, যাতে প্রথমে দেশের ১৭৬টি বধ্যভূমি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও পরে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে ১২৯টি বধ্যভূমি সংরক্ষণ এবং সেখানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

জানা যায় যে, বুদ্ধিজীবী নিধনের নীলনকশা পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর নেতৃত্বে অন্যূন দশ জনের একটি কমিটি কর্তৃক প্রণীত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর গভর্নর হাউজে ফেলে যাওয়া রাও ফরমান আলীর ডায়েরির পাতায় বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটি তালিকা পাওয়া যায় যাঁদের অধিকাংশই ১৪ই ডিসেম্বরে নিহত হন। পাকবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজীর সার্বিক নির্দেশনায় নীলনকশা বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেন ব্রিগেডিয়ার বশির, লেফটেন্যান্ট কর্নেল হেজাজী, মেজর জহুর, মেজর আসলাম, ক্যাপ্টেন নাসির ও ক্যাপ্টেন কাইউম। চরম ডানপন্থি ইসলামি আধাসামরিক আলবদর ও আলশামস বাহিনীর সশস্ত্র ক্যাডাররা পাকবাহিনীর অস্ত্র সাহায্য নিয়ে তাদেরই ছত্রছায়ায় এই বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে।

রাজনীতি বিশ্লেষকদের মতে, একাত্তরে ত্রিশ লাখ শহিদদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের বেছে বেছে হত্যার ঘটনা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তারা শহীদ হন এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার লক্ষ্যে বুদ্ধিজীবী নিধনের এই পরিকল্পনা করে। তালিকাভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের চোখ বেঁধে নিয়ে হত্যা করে। তারা স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকে এভাবেই অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে চেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. জিল্লুর রহমান এক স্মৃতিচারণে লিখেছেন, 'বিজয়ের মাত্র দুই দিন আগে, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১, আলবদরের সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে বা বিভিন্ন ঠিকানা থেকে যাঁদের অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং পরে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দিয়ে রায়েরবাজারে ও মিরপুরে হত্যা করে, দেশের একাত্তরের অসংখ্য শহিদদের মধ্যে তাঁরা একটি আলাদা দলভুক্ত। তাঁরা এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার শিকার। হানাদার বাহিনী যখন দেখল তাদের চরম বিপর্যয় আসন্ন, তারা দাঁড়িয়ে আছে পরাজয়ের কিনারে, তখনই তারা সেই পরিকল্পনা কার্যকর করে, তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের ধরে নিয়ে যায় চোখ বেঁধে, এ কাজে তারা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে, সবাইকে হত্যা করে তারা স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকে হত্যা করার পাশবিক আনন্দ লাভ করে।'

'প্রকৃত ইতিহাস জানাতে হবে' শীর্ষক এক প্রবন্ধে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন রায়েরবাগ বধ্যভূমি সম্পর্কে লেখেন– 'যারা ইতিহাসের কথা জানে না, তাদের ইতিহাস জানাবে কে? এই প্রায় নিরক্ষর দেশে আশা করতে পারব না, সবাই সঠিক ইতিহাসটি জানবে। তাদের প্রকৃত ইতিহাস জানানোর দায়িত্ব আমাদের সবার। স্মৃতিসৌধের এ চত্বর কাজে লাগিয়ে প্রতিদিন এখানে প্রজেক্টরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের নানা কিছুর ভিডিও প্রদর্শনী দেখানো হোক। কয়েকজন গাইড নিয়োগ করা হোক, যাঁরা দর্শনার্থীদের ইতিহাস শোনাবেন।'

বাংলাদেশে ১৪ই ডিসেম্বর শোকাবহ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির উদ্দেশে আমরা সকলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রাখায় ব্রতী হব এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশের উন্নয়নে ব্যাপৃত হব– এই প্রার্থনা করি। একইসঙ্গে প্রত্যাশা করি– সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্মৃতিময় সকল স্থাপনা যথযথভাবে সংরক্ষণ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রচারে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আমরা যে যার অবস্থান থেকে বুদ্ধিজীবীদের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশের উন্নয়নে কায়মনবাক্যে আন্তরিক সচেষ্ট হব– যা হবে তাদের উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

লেখক: শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক

মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা

মিজানুর রহমান মিথুন

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী তাদের এদেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় নারকীয় গণহত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। তাদের এই গণহত্যা বিশ্বের আন্তর্জাতিক বিশ্বস্ত গণমাধ্যমগুলো ফলাও করে প্রচার করে। পাকিস্তানিদের এই গণহত্যার বীভৎস দৃশ্য দেখে বিশ্ব বিবেক থমকে দাঁড়ায়। এ গণহত্যা বিশ্ব ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে ঠাঁই পেয়েছে। ইতিহাস তার সত্য বার্তা শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের মাঝে বহন করে নিয়ে যায়। এটাই হচ্ছে ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম। ইতিহাসের সত্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

১৯৭১ সালের পাকিস্তান কর্তৃক এই গণহত্যা বিশ্বের আলোচিত ঘৃণ্য গণহত্যার মধ্যে একটি। যা বিশ্বের সব প্রান্তের শান্তিকামী মানুষের জানা রয়েছে। ১৯৭৪ সালের ত্রিদেশীয় চুক্তির বদৌলতে বাংলাদেশে আটক ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী সামরিক কর্মকর্তার বিচার থেকে সরে দাঁড়ায়। সে সময় পাকিস্তানের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তারা অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ত সেনা কর্মকর্তাদের বিচার করবে। পাকিস্তানের বিচারপতি হামিদুর রহমান কমিশনও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অভিযুক্ত করে তাদের বিচারের জন্য সুপারিশ করে। পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারাও তাদের লেখায় বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধাপরাধের বিষয়টি স্বীকার করেছে। পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে সে সময়ে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে শত শত রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় ছিল অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসা সামরিক সরকার।

একাত্তরের গণহত্যার খণ্ডচিত্র

১৯৭১ সালের পাকিস্তানিদের গণহত্যা। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যার ভয়াবহতার সঙ্গে সম্ভবত জার্মানদের হাতে সোভিয়েত যুদ্ধ বন্দি ও ইহুদিদের নিধন এবং রোয়ান্ডার গণহত্যারই একমাত্র তুলনা করা যেতে পারে। স্বাধীনতার দাবিতে যুদ্ধরত পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক সরকারের সেনাবাহিনী। তারা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এই গণহত্যা মিশন চালিয়েছিল।

১৯৭০ সালের আগস্টে পূর্ব পাকিস্তানে স্মরণকালের ইতিহাসের ভয়াবহতম বন্যা দেখা দেয়। এতে শত শত মানুষ প্রাণ হারায়। অনেক মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। মানুষের জীবন ধারণের জন্য ত্রাণসামগ্রীর অতি জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু তখনকার পাকিস্তানি শাসকরা ত্রাণের ব্যাপারে অবহেলা করে। ফলে এদেশের গণমানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রতিবাদ জানায়। তারা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন এবং সারা দেশে সামরিক শাসনের অবসানের দাবি করে। ডিসেম্বর মাসের জাতীয় নির্বাচনে তারা বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

১৯৭১ শুরুতেই পাকিস্তানের সেনা প্রধানরা সিদ্ধান্ত নেন যে, আওয়ামী লীগ এবং তার সমর্থকদের গুড়িয়ে দিতে হবে। এদেশের মানুষের অধিকারের দাবির আন্দোলন দমন করতে গণহত্যা চালানো দরকার। এ বছর ফেব্রুয়ারি এক কনফারেন্সে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন– 'ওদের তিরিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা কর, তাহলে বাকি সবাই নতি স্বীকার করবে।' (রবার্ট পেন, ম্যাসাকার [১৯৭২], পৃষ্ঠা ৫০)। এরপর ২৫শে মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার পরেই তারা চূড়ান্ত গণহত্যা চালায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করে শত শত ছাত্রকে হত্যা করা হয়। ঢাকার পথে পথে পাকিস্তানের জল্লাদ বাহিনী হত্যার নেশায় ঘুরে বেড়ায়। এক রাতের মধ্যে ৭,০০০ জন মানুষকে হত্যা করে। হত্যাযজ্ঞ শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যে ঢাকা শহরের অর্ধেক বাসিন্দা পালিয়ে যায়। চট্টগ্রামের জনসংখ্যাও অর্ধেক কমে যায়। একটি আনুমানিক হিসাব অনুসারে, মিলিটারির হাত থেকে বাঁচার জন্য এপ্রিল মাসে পূর্ব পাকিস্তানজুড়ে প্রায় তিন কোটি মানুষ অসহায়ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছিল (পেন, ম্যাসাকার, পৃ. ৪৮)। এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়। এর ফলে ভারতের ওপর ভয়ানক চাপ সৃষ্টি হয়।

এদেশের পুরুষ হত্যা পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের যুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। পুরুষদের ধরে ধরে নির্বিচারে হত্যা করেছে। অ্যান্থনি মাসকারেন হাসের এদেশের গণহত্যা বিষয়ক লেখা থেকে জানা যায়, 'এই গণহত্যার মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। যারা এই গণহত্যার লক্ষ্যবস্তু ছিলেন তারা হলেন, ইস্ট পাকিস্তান রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স, পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনীর কর্মীরা এবং স্বাধীনতার যোদ্ধারা, হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন, আওয়ামী লীগের সমস্ত পদাধিকারী থেকে নীচু তলার সদস্য-স্বেচ্ছাসেবক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক, শিক্ষক প্রভৃতি বাঙালি বুদ্ধিজীবী।' (অ্যান্থনি মাসকারেন হাস, দ্য রেপ অব বাংলাদেশ [দিল্লি, বিকাশ পাবলিকেশন্স], ১৯৭২, পৃ. ১১৬-১৭)।

সুতরাং গণহত্যার সাথে যে লিঙ্গ এবং সামাজিক অবস্থানের সম্পর্ক ছিল এটা স্পষ্ট। বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক, শিক্ষক, বিভিন্ন পদাধিকারী এবং অবশ্যই যোদ্ধারা স্বাভাবিকভাবেই বেশিরভাগ পুরুষ ছিলেন। তাদের কারণে পরিবারের অন্যান্যরাও অত্যাচারের শিকার হয়ে মারা গিয়েছিলেন।

এদেশের গণহত্যার ঘটনাকে 'জেন্ডারসাইড' ও 'এলিটোসাইড' বলে ধরা যায়। এই দুই ধরনের আক্রমণের শিকার বহুলাংশে ছিলেন পুরুষরা। দেশের বাঙালি যুবক ও কিশোর আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল। রওনক জাহানের বক্তব্য অনুসারে, 'স্বাধীনতার যুদ্ধ চলাকালীন সমস্ত সক্ষম যুবক, তরুণকেই মুক্তিযোদ্ধা বলে সন্দেহ

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ২৫শে মার্চ ২০১৯ কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে গণহত্যা দিবসে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি আয়োজিত 'আলোর মিছিল'-এ অংশ নেন–পিআইডি

করা হতো। সে সময়ে হাজার হাজার যুবক তরুণদের গ্রেপ্তার ও অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছিল। এই হত্যার কারণে শেষ পর্যন্ত ছোটো ও বড়ো শহর পুরুষ-শূন্য হয়ে গিয়েছিল। এরা সবাই হয় ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, কেউ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। ইতিহাসবিদ জে রামেল এ প্রসঙ্গে লিখেছেন– 'পাকিস্তানি সেনারা অল্প বয়সি ছেলে, যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারে, তাদের খুঁজে বেড়াতো। এই ধরনের কিশোর-তরুণদের গণহারে ধরে নিয়ে যাওয়া হতো এবং তারপরে আর কোনোদিন তাদের দেখা মিলত না। পুরুষদের লাশ নদীতে ভাসত, পড়ে থাকত মাঠে অথবা সেনা ছাউনির কাছে। এর ফলে পনেরো থেকে পঁচিশ বয়সের কিশোর-যুবক সবাই আতঙ্কিত হয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চলে যেত। আবার কেউ কেউ ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল (ডেথ বাই গভর্নমেন্ট, পৃষ্ঠা ৩২৯)।

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের গণহত্যা ইহুদিদের ওপর নাৎসি অত্যাচারের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই ভয়ংকর ঘটনার উল্লেখ করে রামেল জানিয়েছেন, 'গণহত্যা চলাকালীন হিন্দুদের খুঁজে বের করে ঘটনাস্থলেই মেরে ফেলা হতো। পাকিস্তানি সৈন্যরা পুরুষদের পরীক্ষা করে দেখত তাদের সুন্নত করা আছে কিনা। যদি তা থাকত, তবে বাঁচত, নচেৎ মৃত্যু।'

ঢাকা শহরে এবং তার আশপাশে পরিকল্পিতভাবে অসামরিক পুরুষদের বাছাই করে ধরা এবং তাদের হত্যা করার ঘটনার বর্ণনা দিয়ে রবার্ট পেন লিখেন, 'ঢাকার কাছাকাছি এমন সব জায়গায় সৈন্যরা গণহত্যার অভিযান চালিয়েছিল, যেখানে সাধারণত সাংবাদিকদের যাওয়া-আসা নেই। ঢাকার কাছেই বুড়িগঙ্গার ধারে হরিহর পাড়ায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা চালোনোর জন্য তিনটি জিনিস খুঁজে পেল। এর একটি জেলখানা, জেলখানাটি ছিল নদীর ধারে। যেখানে বেশ কিছু মানুষকে আটকে রাখা যাবে, একটি উন্মুক্ত জায়গা, যেখানে বন্দিদের খুন করা যাবে এবং অন্যটি লাশ গায়েব করার উপায়। নদীর পাড়ে হত্যার পরে মৃতদেহগুলি খুব সহজেই নদীতে ভাসিয়ে দিত। রাতের পর রাত সেই হত্যার তাণ্ডব চলেছিল। সাধারণত বন্দিদের ছয় অথবা সাত জন করে এক সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে নদীর পানিতে নামতে বলা হতো। পাড় থেকে তাদের ওপর তীব্র বৈদ্যুতিক আলো ফেলা হতো, আর পাড়ের ওপর থেকে গুলি ছোড়া হতো। এক দল বন্দিকে এইভাবে গণহারে হত্যা করার পরে আরেক দলকে নিয়ে আসা হতো এবং এই প্রক্রিয়া চলতে থাকত। সকালে গ্রামের মাঝিদের দিয়ে দেহগুলি দড়ি কেটে মাঝ নদীতে ফেলে দিয়ে আসা হতো। অন্যদিকে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানির বেশ বড়ো একটি গুদামও তারা হত্যাস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিল। (পেন, ম্যাসাকার [ম্যাকমিলান, ১৯৭৩] পৃ. ৫৫)।

এভাবে সারা দেশে দীর্ঘ নয় মাস এদেশে গণহত্যা চালানো হয়েছিল। পাকিস্তানিদের এই গণহত্যার ইতিহাস বাংলাদেশের মানুষ কোনো দিন ভুলতে পারবে না। নতুন প্রজন্মকে এই গণহত্যার ইতিহাস থেকে দেশপ্রেমের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

লেখক: সহ-সম্পাদক, জাগোনিউজ২৪.কম

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনে সঙ্গে থাকবে ইউনেস্কো

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেস্কো) ২০২০ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন করবে। ২৭শে নভেম্বর সন্ধ্যায় গণভবনে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন বিষয়ক এক প্রস্তুতি সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কথা ঘোষণা করেন। সভায় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মণি বলেন, ২৫শে নভেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কো সদর দফতরে সংস্থার চল্লিশতম সাধারণ পরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগামী ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী একসঙ্গে পালন করবে বাংলাদেশ। এলক্ষ্যে আগামী ২০২০-২০২১ সালকে 'মুজিববর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনে প্রতিটি পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়কেই প্রাধান্য দিচ্ছে সরকার।

দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো বর্ণাঢ্য আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর কর্মসূচি উদ্‌যাপন করা হবে প্রতিটি বিভাগ, জেলা, থানা ও ওয়ার্ড পর্যায়ে। ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬শে মার্চ পর্যন্ত গৃহীত এই কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের বাইরেও পালন করা হবে নানা কর্মসূচি। এজন্য দুটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্টজন– স্পিকার, প্রধান বিচারপতি, রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষাবিদ, শিল্প-সংস্কৃতি-ক্রীড়া ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মীয় নেতারা রয়েছেন। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে বিশ্বখ্যাত ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান, আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রধানদের আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। মুজিববর্ষে বিশেষ দিবসগুলোতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিশেষ কর্মসূচি পালন, বঙ্গবন্ধুর নামে আন্তর্জাতিক মানের বইমেলা আয়োজন, সেমিনার, প্রচার ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ, আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্র নির্মাণ, নাট্যোৎসব আয়োজনসহ বিভিন্ন উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: মুনিরা হক

ফায়ার সার্ভিস শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ

মিয়াজান কবীর

বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মী বাহিনী 'গতি, সেবা, ত্যাগ'-এর মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত। ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। ১৯৪৩ সালে ১লা জানুয়ারি 'বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস' নামে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর ১৯৪২ সালের ১৬ই জুলাই 'সিভিল ডিফেন্স'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৮২ সালে এই দুটি প্রতিষ্ঠান আত্মীকরণ হয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হিসেবে গড়ে ওঠেছে। সেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দিন থেকে আর্তমানবতার সেবায় যে-কোনো দুর্যোগ দুর্ঘটনায় সবার আগে সবার পাশে থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।

১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালির ওপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালায়, তখন ফায়ার সার্ভিসের অকুতোভয় অগ্নিসেনাদল মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে গড়ে তোলে প্রতিরোধ। এমনিভাবে পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশনের অগ্নিসেনারা প্রকাণ্ড অর্জুন গাছ কেটে পলাশীর মোড়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। পাকিস্তানি বাহিনী যখন রাজধানী ঢাকার বুকে নারকীয় হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠে। তখন লালবাগ-পলাশী অভিমুখে অভিযান চালাতে গিয়ে পলাশী মোড়ে অগ্নিসেনাদের ব্যারিকেডে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে হানাদার বাহিনী। তখন বর্বর বাহিনী পলাশী ব্যারাক ফায়ার স্টেশনে ঢুকে প্রহরারত সেন্টিসহ ছয়জন অগ্নিসেনাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

সারা দেশে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ফায়ার কর্মী বাহিনী গড়ে তোলে প্রতিরোধ। শুধু তাই নয়–অগ্নিসেনাদল বিভিন্ন সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অসম সাহসিকতার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করতে থাকে। দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অনেক অগ্নিসেনা নিজের জীবন উৎসর্গ করেন দেশ ও জাতির জন্য। এসব বীর শহিদ মুক্তিযোদ্ধা অগ্নিসেনাদের স্মৃতির স্মরণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্স, মিরপুরে নারকেল বীথিঘেরা সবুজ চত্বরে গড়ে ওঠেছে 'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ'। ১৫ ফুট উচ্চতার ফায়ার সার্ভিস শহিদ স্মৃতিস্তম্ভটি শহিদ অগ্নিসেনাদের নাম ফলক বুকে ধারণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাথা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই শহিদ স্মৃতিস্তম্ভটির নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয় ২০১২ সালের মার্চ মাসে। দৃষ্টিনান্দনিক শহিদ স্মৃতিস্তম্ভটির নকশা প্রণয়ন করেন স্থপতি এ আর খন্দকার তাজউদ্দীন আহমেদ।

মুক্তিযুদ্ধের এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের স্মারক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে উৎসর্গিত শহিদদের স্মৃতির স্মরণে নির্মিত শ্রদ্ধার প্রতীক শহিদস্তম্ভটি।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সেতো অমলিন। শহিদের স্মৃতির স্মরণে গড়ে ওঠেছে স্মৃতিস্তম্ভ। শহিদ স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণশৈলিতে প্রতীকী হচ্ছে আলোক প্রদীপ।

সুদীর্ঘকাল দুঃশাসন, নির্যাতন, নিপীড়ন আর বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে গর্জে ওঠে বীর বাঙালি। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রামী বাঙালি হাতে তুলে নেয় হাতিয়ার। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ শেষে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতা। একাত্তরে ভয়াল রাতে আঁধার পেরিয়ে আলোর ঝরনায় আলোকিত হয়ে ওঠে সোনার বাংলাদেশ। অর্জিত হয় লাল সবুজের পতাকা। উদ্ভাসিত আলোর প্রতীকী হচ্ছে প্রদীপ। আলোক প্রদীপ জ্বেলে জ্বেলে শহিদের স্মৃতির স্মরণে গায় বন্দনার গান।

ফায়ার সার্ভিস শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা অর্পণ

শহিদ স্মৃতিস্তম্ভটি সাদা, কালো আর লাল এই তিনটি রঙের সমাহারে বাঙময় হয়ে ওঠেছে। এই তিনটি রঙের রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য। ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে শহিদের কচি বুকের তাজা লাল রক্তে রঞ্জিত হয় সবুজ বাংলাদেশ। সেই শহিদের বুকের লাল রক্ত হিসেবে স্তম্ভটির বেদিতে ব্যবহৃত হয়েছে লাল রং। শোকের ছায়া কালো রং। এই শোকের ছায়া কালো রঙে মোড়ানো রয়েছে আলোক স্তম্ভটি। আর শান্তির প্রতীক হিসেবে সাদা রং ব্যবহৃত হয়েছে স্তম্ভটির কার্নিশে।

নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে চিরঞ্জীব করে রাখতে নির্মিত হয়েছে এই শহিদ স্মৃতিস্তম্ভটি। ২০১২ সালের ২৫শে মার্চ শহিদ স্মৃতিস্তম্ভটি উদ্‌বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহেরা খাতুন। ২০১২ সালের ১৮ই নভেম্বর শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়াও জাতিসংঘের বিশেষ দূত মার্গারেটা ওয়ালস্ট্রম এই শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পুষ্প অর্পণ করেন।

এই শহিদ স্মৃতিস্তম্ভটি একাত্তরের প্রতীক, মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক, গণহত্যার প্রতীক, স্বাধীনতার প্রতীক, মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধার প্রতীক। এই শহিদ স্মৃতিস্তম্ভটি দেশ ও জাতির আর মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় আগামী প্রজন্মকে প্রেরণা যোগাবে যুগ-যুগান্তর। বীর শহিদ অগ্নি সেনাদের শ্রদ্ধায় কবিতার ভাষায় উচ্চকিত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়:

তোমরা ছিলে বীর বাঙালি
ছিলে অগ্নিসেনা,
দেশের মাটি ভালোবেসে
শোধ করেছ দেনা।
গাইলে বুকের রক্ত ঢেলে
স্বাধীনতার গান,
ছড়িয়ে দিয়ে চতুর্দিকে
মুক্ত আলোর বান।
ইতিহাসে থাকবে বেঁচে
তোমরা চিরদিন,
বাংলা মায়ের বীর ছেলেরা
দীপ্ত অমলিন।

লেখক: সাহিত্যিক ও গবেষক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই ডিসেম্বর ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৭ ও ২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

২০১৭ ও ২০১৮ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান

ফারিহা রেজা

৮ই ডিসেম্বর ২০১৭ ও ২০১৮ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। চলচ্চিত্রকে সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন– চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সবচেয়ে দ্রুত মানুষের মাঝে মেসেজ পৌঁছানো যায়। সেজন্য জীবনধর্মী সুন্দর সমাজ ও দেশ গঠনমূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হবে। এমনভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হবে যেন নতুন প্রজন্ম সন্ত্রাস, মাদক ও জঙ্গিবাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে। অনুষ্ঠানে সিনিয়র থেকে শুরু করে বর্তমান প্রজন্মের শিল্পী, নির্মাতা, কলাকুশলীদের উপস্থিতিতে মুখর হয় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র। চলচ্চিত্র শিল্পের গৌরবোজ্জ্বল অবদানের জন্য স্বীকৃতিস্বরূপ শিল্পীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্যসচিব আবদুল মালেক। প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী আজীবন সম্মাননা তুলে দেন এটিএম শামসুজ্জামানের হাতে। এর পর শুরু হয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আজীবন সম্মাননা স্মারক তুলে দেন নায়িকা সালমা বেগম সুজাতা, অভিনেতা প্রবীর মিত্র ও এম এ আলমগীরের হাতে। এরপর ধারাবাহিকভাবে অন্যান্যদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পুরস্কার প্রদানের পর প্রধানমন্ত্রী সকল বিজয়ীকে শুভেচ্ছা জানান। বিজয়ের মাসে সকল শহিদকে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা চলচ্চিত্রের উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু করেছি। আমাদের অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। আমাদের অনেক সিনেমা দর্শক হারিয়ে গেছে। কীভাবে সিনেমা দর্শকদের হলে ফিরিয়ে আনা যায়, এর জন্য নানা ধরনের উদ্যোগ হাতে নিয়েছি। আমি নিজেও হল মালিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমার মনে হয় দর্শক ফেরাতে হলে সিনেমাকে ডিজিটালাইজড করতে হবে। বিশেষ করে দেশের জেলা-উপজেলা পর্যায়েও সিনেমা হলগুলো ডিজিটাল করতে হবে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। এখন মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। তাদের জন্য সময় উপযোগী বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'শিল্পকলার সবগুলো মাধ্যমের ভেতরে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম চলচ্চিত্র। এর মাধ্যমে মানুষের মনে ব্যাপক পরিবর্তন আনা সম্ভব। মানুষের মনে গভীর দাগ কাটতে পারে এই চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হবে মানুষের জন্য। দেশের জঙ্গিবাদ আমরা প্রতিরোধ করেছি। শুধু আইনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। চলচ্চিত্র এখানে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। সেদিকে আপনারা আরো বেশি নজর দেবেন। প্রত্যেকটি কাহিনি যখন তৈরি হবে সেটা যেন জীবনভিত্তিক হয়। দেশের অনেক শিল্পী বাইরে গিয়েও ভালো কাজ করছে। দেশেও যেন তারা ভালো কাজ করে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন– বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ হচ্ছে, বাংলাদেশ ভারতের যৌথ প্রযোজনায়। আমরা ভারতের প্রখ্যাত নির্মাতা শ্যাম বেনেগালকে পরিচালক হিসেবে মনোনীত করেছি। এছাড়া বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অনেক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে হবে। বাস্তবতার নিরিখে সিনেমা দেখা হয় না বলে জানান

৮ই ডিসেম্বর ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৮'র শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র 'পুত্র'-এর পদক গ্রহণ করেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী। তবে বিদেশে যাওয়ার কালে বিমানে বসে দেশের সিনেমা দেখেন তিনি। দেশের সিনেমা প্রধানমন্ত্রীকে মুগ্ধ করে বলে তিনি জানান।

দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জমকালো আয়োজনে গান পরিবেশন করেন মমতাজ, নকীব খান, সামিনা চৌধুরী, কনা ও খুরশীদ আলম। ইভান শাহরিয়ারের পরিচালনায় নৃত্যে দর্শক মাতান চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস, ববি, মাহিয়া মাহি, জায়েদ খান, নুসরাত ফারিয়া ও তমা মির্জা। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় মুখ ফেরদৌস ও পূর্ণিমা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই ডিসেম্বর ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৭ ও ২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র অভিনেতা প্রবীর মিত্রকে আজীবন সম্মাননা পদক প্রদান করেন–পিআইডি

২০১৭ সালে যারা পেলেন পুরস্কার

২০১৭ সালের জন্য আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনয়শিল্পী এটিএম শামসুজ্জামান ও সালমা বেগম সুজাতা। এ বছরের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ঢাকা অ্যাটাক (কায়সার আহমেদ ও সানী সানোয়ার)। অন্যান্য পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন– শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক বদরুল আনাম সৌদ (গহীন বালুচর), শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার যৌথভাবে শাকিব খান (সত্তা) ও আরিফিন শুভ (ঢাকা অ্যাটাক) অর্জন করেন। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী: নুসরাত ইমরোজ তিশা (হালদা), অভিনেতা পার্শ্বচরিত্র: মো. শাহাদাৎ হোসেন (গহীন বালুচর), অভিনেত্রী পার্শ্বচরিত্র: সুবর্ণা মুস্তাফা (গহীন বালুচর) ও রুনা খান (হালদা), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা খলচরিত্র: জাহিদ হাসান (হালদা), কৌতুক চরিত্র: ফজলুর রহমান বাবু (গহীন বালুচর)। শিশুশিল্পী: নাইমুর রহমান আপন (ছিটকিনি)। শিশুশিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার পান অনন্য সামায়েল (আঁখি ও তার বন্ধুরা)। তুমি রবে নীরবে ছবির সংগীত পরিচালনার জন্য পুরস্কৃত হন এম ফরিদ আহমেদ হাজরা। ধ্যাততেরিকি ছবির নৃত্য পরিচালনায় পুরস্কৃত হন ইভান শাহরিয়ার সোহাগ। শ্রেষ্ঠ গায়ক মাহফুজ আনাম জেমস (সত্তা) ছবির জন্য পুরস্কৃত হন এবং গায়িকা মমতাজও পুরস্কৃত হন একই ছবির জন্য। গীতিকার সেজুল হোসেন (সত্তা) ছবির জন্য পুরস্কৃত হন এবং সুরকার বাপ্পা মজুমদারও একই ছবির জন্য পুরস্কৃত হলেন। শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার আজাদ বুলবুল (হালদা), শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার তৌকির আহমেদ (হালদা) ও শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা বদরুল আনাম সৌদ (গহীন বালুচর)। সম্পাদনা মো. কালাম (ঢাকা অ্যাটাক), শিল্পনির্দেশনা উত্তম কুমার গুহ (গহীন বালুচর), চিত্রগ্রাহক কমল চন্দ্র দাস (গহীন বালুচর), শব্দগ্রাহক রিপন নাথ (ঢাকা অ্যাটাক), পোশাক সাজসজ্জা রিটা হোসেন (তুমি রবে নীরবে), মেকাপ ম্যান মো. জাভেদ মিয়া (ঢাকা অ্যাটাক) শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেন।

২০১৮ সালে যারা পেলেন পুরস্কার

২০১৮ সালের জন্য আজীবন সম্মানা পেয়েছেন এম এ আলমগীর ও প্রবীর মিত্র। এ বছরের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র 'পুত্র'। এ ছবিটি বিভিন্ন বিভাগে ১১টি পুরস্কার পায়। এটি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছিল। এ ছবির প্রযোজনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণ করেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'গল্প সংলাপ' (বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট), প্রামাণ্য চলচ্চিত্র: রাজাধিরাজ রাজ্জাক (ফরিদুর রেজা সাগর), চলচ্চিত্র পরিচালক: মোস্তাফিজুর রহমান মানিক (জান্নাত), অভিনেতা (প্রধান চরিত্র) ফেরদৌস আহমেদ (পুত্র) ও সাদিক মোহাম্মদ সাইমন (জান্নাত), অভিনেত্রী (প্রধান চরিত্র): জয়া আহসান (দেবী), পার্শ্বচরিত্র অভিনেতা: আলীরাজ (জান্নাত), পার্শ্বচরিত্র অভিনেত্রী: সুচরিতা (মেঘকন্যা), অভিনেতা খলচরিত্র: সাদেক বাচ্চু (একটি সিনেমার গল্প), কৌতুক চরিত্র: মোশাররফ করিম (কমলা রকেট) ও আফজাল শরীফ (পবিত্র ভালোবাসা), শিশুশিল্পী: ফাহিম মুহতাসিম লাজিম (পুত্র), সংগীত পরিচালক: ইমন সাহা (জান্নাত), নৃত্য পরিচালক: মাসুম বাবুল (একটি সিনেমার গল্প), গায়ক: নাইমুল ইসলাম রাতুল (পুত্র), গায়িকা: সাবিনা ইয়াসমিন (পুত্র) ও আঁখি আলমগীর (একটি সিনেমার গল্প), গীতিকার: কবির বকুল (নায়ক) ও জুলফিকার রাসেল (পুত্র) সুরকার: রুনা লায়লা (একটি সিনেমার গল্প), কাহিনিকার: সুদীপ্ত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই ডিসেম্বর ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৭ ও ২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানে জয়া আহসানকে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পদক প্রদান করেন–পিআইডি

সাঈদ খান (জান্নাত), চিত্রনাট্যকার: সাইফুল ইসলাম মান্নু (পুত্র), সংলাপ রচয়িতা: এস. এম. হারুন-অর-রশীদ (পুত্র), সম্পাদক: তারিক হোসেন বিদ্যুৎ (পুত্র), শিল্পনির্দেশক: উত্তম কুমার গুহ (একটি সিনেমার গল্প), চিত্রগ্রাহক: জেড এইচ মিন্টু (পোষ্ট মাস্টার ৭১), শব্দগ্রাহক: আজম বাবু (পুত্র) শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পান। সাদিয়া শবনম শান্তু পোশাক ও সাজসজ্জা (পুত্র) ও ফরহাদ রেজা মিলন মেকাপ ম্যান হিসেবে দেবী ছবিতে পুরস্কৃত হন। শিশুশিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে মাহমুদুর রহমান (মাটির প্রজার দেশে)।

লেখক: প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা রমা চৌধুরী

বিনয় দত্ত

বাংলাদেশের অন্যতম বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা রমা চৌধুরী। এই দেশের জন্য তিনি তাঁর সম্ভ্রম উৎসর্গ করেছেন, উৎসর্গ করেছেন জীবনের অনেক খ্যাতিময় অর্জন। তাঁর ত্যাগের পেছনে লুকিয়ে আছে অনেক অজানা গল্প, অনেক অজানা সত্য।

যে জাতীয় পতাকা আজকে আমাদের কাছে পরম শ্রদ্ধার, যা নিয়ে আমাদের গর্ব সেই জাতীয় পতাকার মাঝে অন্তর্নিহিত হয়ে আছে তাঁর গল্প। রমা চৌধুরী, তারামন বিবি, জয়ন্তী বালা দেবী, আছিয়া বেগমসহ অসংখ্য বীরাঙ্গনাদের গল্প, যাঁরা নিজেদের সবচেয়ে পবিত্র সম্পদটুকু দেশের জন্যে উৎসর্গ করেছেন।

রমা চৌধুরী জীবন সায়াহ্নে বলেছিলেন, 'আমি বাঁচতে চাই।' নতুন করে স্বপ্ন দেখার প্রয়াস নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন। শেষ বয়সে এসে তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপসহ নানান জটিল রোগ। এসব রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের বেডে তিনি স্বপ্ন দেখতেন নতুন করে বাঁচবার। আরো কিছু বলবার, দেশকে নতুন করে কিছু দেবার, দেশের জন্য নতুন উদ্দীপনায় কিছু করার, সারা দেশে তাঁর প্রিয় অনাথাশ্রমের শাখা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

বয়স এবং অসুস্থতা দৃশ্যত রমা চৌধুরীকে ক্লান্ত করলেও মনের শক্তিতে তিনি অসীম শক্তির অধিকারিণী এখনো পর্যন্ত। তিনি অসম্ভব তেজস্বী একজন নারী, যাঁর ছায়াতলে যুগের পর যুগ রইলেও তিনি ছায়া সরাবেন না, বরং পরম মমতায় কোলে তুলে নিবেন।

১৯৪১ সালের ১৪ই অক্টোবর চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার পোপাদিয়া গ্রামে রমা চৌধুরীর জন্ম। মাত্র তিন বছর বয়সে বাবা রোহিনী চৌধুরীকে হারান। মোতিময়ী চৌধুরী শত বাধা পেরিয়ে তাঁকে পড়াশোনার জন্যে অনুপ্রেরণা দিয়ে যান। মায়ের অনুপ্রেরণায় বোয়ালখালীর মুক্তকেশী গার্লস হাইস্কুল থেকে এসএসসি এবং কানুনগোপাড়া কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। তিনি ১৯৫৯ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ডিগ্রি পাস করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হন।

১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। দক্ষিণ চট্টগ্রামের তিনিই প্রথম নারী, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তাই তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানান, 'সুযোগ পেলে আবার ভর্তি হতে চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে মাস্টার্সটা করতে চাই ইংরেজিতে।'

রমা চৌধুরীর জন্ম অন্য সাধারণ নারীদের মতো হতে পারত, স্বামী সংসার, সন্তান-সন্ততি নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে দিন পার করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা পারেননি। কক্সবাজার বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে কর্মজীবন শুরু তাঁর। শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে তিনি বৈবাহিক জীবনে আবদ্ধ হন। এরই মধ্যে আসে উনিশশো একাত্তর, স্বাধীনতা যুদ্ধ।

১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন তিনি চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর বিদুগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবেই কর্মরত ছিলেন। এই সময় তাঁর স্বামী তাঁকে ছেড়ে দেশান্তরী হয়ে যান। সাগর আর টগর দুই সন্তানকে নিয়ে রমা চৌধুরী পৈতৃক ভিটা পোপাদিয়ায় বসবাস শুরু করেন।

১৯৭১ সালের ১৩ই মে সকালবেলা, পোপাদিয়ায় স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা রমা চৌধুরীর বাড়িতে আক্রমণ চালায়। সেদিন পাকিস্তানি এক সৈনিক তাঁর সম্ভ্রম কেড়ে নেয়। তাঁর ওপর চালায় শারীরিক নির্যাতন।

ওই বিভীষিকার বর্ণনা রয়েছে তাঁর 'একাত্তরের জননী' বইয়ে। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'যখন আমাকে নির্যাতন করতে উদ্যত হলো পাকসেনা, তখন জানালার পাশে দাঁড়ানো আমার মা ও দুই ছেলে বারবার আকুতি করছিলেন। ছিল আমার পোষা বিড়াল কনুও। তখন আমি মাকে আমার সন্তানদের নিয়ে সরে যেতে বলেছিলাম।'

সম্ভ্রম হারানোর পর রমা চৌধুরী পাকিস্তানি দোসরদের হাত থেকে পালিয়ে পুকুরে নেমে আত্মরক্ষা করেছিলেন। হানাদাররা তাঁকে না পেয়ে গানপাউডার দিয়ে ঘরবাড়িসহ যাবতীয় সহায়-সম্পদ সবকিছুই পুড়িয়ে দেয়। এই সময় এলাকাবাসী কেউ কেউ তাঁর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর নিজের আত্মীয়রাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। রমা চৌধুরী তাঁর 'একাত্তরের জননী' বইয়ে লিখেছেন, '...আমার আপন মেজো কাকা সেদিন এমন সব বিশ্রী কথা বলেছিলেন, লজ্জায় কানে আঙুল দিতে বাধ্য হই। আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না, দোকানে গিয়ে কিছু খাবারও সংগ্রহ করতে পারলাম না মা ও ছেলেদের মুখে দেবার জন্য।'

ঘরবাড়ি, সহায়-সম্বলহীন বাকি আটটি মাস তিনি দুইপুত্র সাগর, টগর আর বৃদ্ধ মাকে নিয়ে জলে-জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে দিন পার করেছেন। পোড়া ভিটায় কোনোরকমভাবে পলিথিন আর খড়কুটো মাথায় আর গায়ে দিয়ে রাত কাটিয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল সময়ে তাঁর ছেলে সাগর ছিল সাড়ে পাঁচ বছরের। দুরন্ত সাগর মিছিলের পেছনে পেছনে 'জয় বাংলা, জয় বাংলা' বলে ছুটে বেড়াত। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে একসময় সাগর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৯৭১ সালের ২০শে ডিসেম্বর মারা যায়। সাগরের মৃত্যুর ১ মাস ২৮ দিনের মাথায় ৩ বছরের টগরও মারা যায়। ছেলেদের হিন্দু সংস্কারে না পুড়িয়ে তিনি মাটি চাপা দেন। দুই সন্তানের দেহ মাটিতে আছে বলে রমা চৌধুরী জুতা পড়া বন্ধ করে দেন।

ছেলেদের মৃত্যুর স্মৃতি কখনোই তিনি ভুলতে পারেননি। খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে একসময় তাঁর পায়ে ঘা হয়ে যায়। আত্মীয়স্বজনদের জোরাজুরিতে তিনি অনিয়মিতভাবে তখন জুতা পরা শুরু করেন।

পর পর দুইটি সন্তান হারিয়ে রমা চৌধুরীর পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। সন্তান হারানোর কষ্ট যে কতটা কঠিন তা একমাত্র মা'ই জানেন। সেই কঠিন সময়ও তিনি পার করেছেন। প্রিয় সন্তানদের শোক তাকে ভয়ানক কাতর করে তোলে। সেই কাতরতায় তিনি দীর্ঘ সময় পার করেছেন।

প্রথম সংসারের পরিসমাপ্তি ঘটলে রমা চৌধুরী দ্বিতীয়বারের মতো সংসার বাঁধার স্বপ্ন দেখেন। দ্বিতীয়বার সংসার বাঁধতে গিয়ে প্রতারণার শিকার হন। দ্বিতীয় সংসারের ছেলে টুনু ১৯৯৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বোয়ালখালীর কানুনগোপাড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। টুনুর মৃত্যুর পর রমা চৌধুরী একেবারের মতো জুতা ছেড়ে দেন।

যুদ্ধপরবর্তী সময়ে তিনি লেখালেখিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি বলতেন, 'আমার কুষ্ঠিতে লেখা আছে আমি লেখ্যবৃত্তি গ্রহণ করেই জীবিকা নির্বাহ করব। অনেকটা সে কথাকে বাস্তবায়ন করার জন্যই লিখছি। আর এছাড়া এই অবস্থায় আমার অন্য কিছু করারও সুযোগ নেই। বাঁচতে হলে অর্থের প্রয়োজন। আমি কারো গলগ্রহ হতে কখনো পছন্দ করতাম না, এখনো করি না।'

প্রথমে তিনি একটি পাক্ষিক পত্রিকায় লিখতেন। সম্মানীর বিনিময়ে তাঁকে পত্রিকার ৫০টি কপি দেওয়া হতো। সেই পত্রিকা বিক্রি করেই চলত তাঁর জীবনজীবিকা। পরে তিনি নিজেই নিজের লেখা বই প্রকাশ করে বই ফেরি করতে শুরু করেন। তাঁর সমস্ত বইয়ের প্রকাশক আলাউদ্দিন খোকন ছায়াসঙ্গী হিসেবে সবসময়ই তাঁর পাশে থেকেছেন।

প্রবন্ধ, উপন্যাস ও কবিতা সবমিলিয়ে তিনি নিজের ১৮টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে 'রবীন্দ্রসাহিত্যে ভৃত্য', 'নজরুল প্রতিভার সন্ধানে', 'স্বর্গে আমি যাব না', 'চট্টগ্রামের লোকসাহিত্যে জীবনদর্শন', 'শহীদের জিজ্ঞাসা', 'নীল বেদনার খাম', 'সেই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়', 'ভাববৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তিনি নিজেই নিজের বই ফেরি করে বিক্রি করেছেন। নিজের লেখা বইগুলো তিনি সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এ থেকে প্রতি মাসে তাঁর হাজার বিশেক টাকার মতো আয় হতো। এ দিয়েই তিনি থাকা খাওয়ার সংস্থান করেছেন।

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী চেরাগী পাহাড়েই লুসাই ভবনের অবস্থান। সেই ভবনের ৪০৮ নম্বর কক্ষটিতে থাকতেন রমা চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে থাকত চারটি বিড়াল। আর তাঁর ছায়াসঙ্গী আলাউদ্দিন খোকন। এই কক্ষ থেকেই তিনি প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধে নামতেন। লেখালেখির পাশাপাশি তিনি একইসঙ্গে পরিচালনা করেছেন 'দীপংকর স্মৃতি অনাথালয়' নামের একটি অনাথ আশ্রম। প্রচণ্ড কষ্টের জীবন কাটলেও তাঁর দু'চোখে স্বপ্ন ছিল সুখ সমৃদ্ধ বাংলাদেশের।

দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে অনাথ আশ্রম খুলতে চেয়েছিলেন। সকল ধর্মের অনাথরা সেই আশ্রমে থাকবে। মনুষ্য দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে তারা কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। তিনি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন প্রতিনিয়ত।

তাঁর দৃপ্ত ছুটে চলা দেখে সবারই মনোবল বহুগুণে বেড়ে যেত। এই মনোবল নতুন দিনের, নতুন স্বপ্নের, নতুন সত্যের।

২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগ্রহে রমা চৌধুরী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি দেখা করেননি, বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে রমা চৌধুরী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। খালি পায়ে তাঁর সাথে সাক্ষাতে নিজের কষ্টের কথা জানান। প্রধানমন্ত্রী আর্থিক সহযোগিতা করতে চাইলে রমা চৌধুরী বিনয়ের সঙ্গে তা ফিরিয়ে দেন। বরং উলটো তাকে উপহার দিয়ে এসেছিলেন নিজের লেখা 'একাত্তরের জননী' গ্রন্থটি।

সবকিছু হারিয়ে একরকম নিঃস্ব হয়েছেন তিনি। নিজের সন্তানেরা শহিদের মর্যাদা পায়নি, কিন্তু তাঁর কাছে ওরা শহিদ। এই কথাটি তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন।

১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে একবার মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণজনিত রোগে রমা চৌধুরী আক্রান্ত হয়েছিলেন। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গোটা দেড়মাস আলাউদ্দিন তাঁর সেবাশুশ্রূষা করেছেন। এই অসুস্থতায় তাঁর ডান পাশ অবশ হয়ে পড়েছিল, একটি চোখও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই ভয়ানক সময়ে আলাউদ্দিন যেন দেবতারূপে রমা চৌধুরীকে একা টেনে সুস্থ করে তুলেছিলেন।

আলাউদ্দিনের শুশ্রূষায় তিনি আবার চলার শক্তিও ফিরে পান। শুরু হয় আবারো তাঁর পথচলা। কাঁধে ঝোলা, কানে হিয়ারিং এইড লাগানো রমা চৌধুরী হেঁটে যাচ্ছেন চট্টগ্রামের ফুটপাত ধরে। এ দৃশ্য সকলের পরিচিত।

রমা চৌধুরী যেন আলোর পথযাত্রী হয়ে ছুটে বেড়াতেন। বছরখানেক ধরে অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি। সেই সময় চিকিৎসার সুব্যবস্থা করার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন আলাউদ্দিন। কোথাও সহযোগিতা পেয়েছেন, কোথাও পাননি। অবশেষে সরকারি নির্দেশে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর জন্য কেবিনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই সময়ও সার্বক্ষণিক জেগে ছিলেন সেই আলাউদ্দিন। তাঁর ইচ্ছা ছিল শত বছর বেঁচে থাকার। কিন্তু শত বছর আর ছোঁয়া হয়নি এ যোদ্ধার। ২০১৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ভোরে ৭৭ বছর বয়সে রমা চৌধুরী নিজের জীবনের অধ্যায় সমাপ্ত করে দেন।

জীবনের অনেক বড়ো সময় তিনি একাই যুদ্ধ করে এগিয়েছেন। কখনো ভালোবাসা পেয়েছেন, কখনো তীর্যক বাক্যবাণে জর্জরিত হয়েছেন, কখনো তাঁকে কেউ আগলে রেখেছে, কখনো তিনি কাউকে আগলে রেখেছেন, কখনো স্মৃতি তাঁকে ক্রন্দনে ভাসিয়েছে, এখন রমা চৌধুরী নিজেই স্মৃতি হয়ে ফিরছেন আমাদের কাছে।

রমা চৌধুরীর অনেক কিছুই তাঁর লেখার বাকি ছিল। দেশকে অনেক কিছুই দেওয়ার ইচ্ছে ছিল তাঁর। গোটা জীবন স্বনির্ভর, স্বাবলম্বী আর আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন রমা চৌধুরী। দেশব্যাপী অনাথ আশ্রম গড়ার স্বপ্ন নিয়ে তিনি আমাদের ছেড়ে এখন বহু দূরে। হয়ত তিনি দেখছেন, আমরা তাঁকে নিয়ে লিখছি।

তিনি এতটাই তেজস্বী যে, কারো দান দক্ষিণা গ্রহণ করতেন না, নিজের কষ্টের কথা কাউকে মুখ ফুটেও বলতেন না। জীবনের সর্বস্ব হারিয়েও একা দীপ্তিময় ভূমিকায় হেঁটে গিয়েছেন গোটা জীবন। যুদ্ধদিনের বিভিন্ন ঘটনাসহ অসংখ্য ইতিহাসের সাক্ষী ছিলেন তিনি। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, দেখিয়েছেন। তিনি আমাদের সবার প্রিয়, জননী রমা চৌধুরী।

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক

নিবন্ধ

কবিতা ও গানে স্বাধীনতা সংগ্রাম

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

স্বাধীনতা একটি জাতির সবচেয়ে মূল্যবান ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শুধু তাই নয় স্বাধীনতাহীন বেঁচে থাকাটাই মৃত্যুর শামিল। এজন্য বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, 'অসহায় জাত ডুবিছে মরিয়া জানে না সন্তরণ, কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মোর।' পরাধীন জাতিকে কবি অসহায় বলেছেন, তাদের সাঁতার শিখে নদীর কূলে উঠতে বলেছেন। অর্থাৎ তাদের স্বাধীন হওয়ার জন্য যুদ্ধ করে জয়ী হতে বলেছেন। তবে স্বাধীনতা সহজ পথে আসে না। এর জন্য রক্ত দিতে হয়, জীবন দিতে হয়। পৃথিবীতে এমন ইতিহাস অনেক আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যও আমাদের রক্ত দিতে হয়েছে, জীবন দিতে হয়েছে। জীবন দিতে হয়েছে ভাষার জন্যেও। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত জীবন দেওয়ার এই ইতিহাস গড়িয়েছে।

বিজয়ের পর মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিকামী জনগণের ঢাকার উদ্দেশে অব্যাহত অগ্রযাত্রা

আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে মর্যাদার আসনে বসানোর জন্যেও সংগ্রাম করতে হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকেই ষড়যন্ত্র শুরু হয় বাংলা ভাষার বৈষম্য নিয়ে। এই ষড়যন্ত্রে, পাকিস্তানিরা শুধু নয় বাঙালি কতিপয় মুখোশধারী লোকও জড়িত ছিল। বাংলা ভাষাকে তারা অবজ্ঞার চোখে দেখত। ৭ কোটি বাঙালি বাংলায় কথা বলত। অথচ পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের মুষ্টিমেয় মানুষের ভাষা উর্দুকে তারা প্রাধান্য দিয়ে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু বাঙালি তা মেনে নেয়নি। সেই থেকে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৮ সাল থেকে অমানবিক নির্যাতন সহ্য করে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ভাষার জন্যে জীবন দিতে হয়েছে। তবু বাঙালিরা মাথা নত করেনি।

বাঙালিদের অধিকারের দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার মুখ বন্ধ করার জন্য বারবার তাঁকে জেলে নেওয়া হয়েছে। করা হয়েছে মানসিক নির্যাতন। কিন্তু কোনোভাবেই তাঁর মুখ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। জনগণের অধিকার আদায়ের প্রশ্নে তিনি ভয় পাওয়ার মতো নেতা ছিলেন না। নিজের চেয়ে জাতির প্রতি ভালোবাসাই তাঁর কাছে বড়ো ছিল। কোনো বাধাতেই তিনি নত না হওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজানো হয়। কিন্তু বাঙালির তুমুল আন্দোলনের মুখে প্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে কারামুক্ত করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার।

দেশের জন্য, মানুষের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান অবধারিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে, আপামর জনগোষ্ঠীর অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সারা দেশের মানুষ তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে বসতে পারেনি বাঙালি বলে। এখানেও ষড়যন্ত্র করে পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোকে এই পদে বসানো হয়। বাঙালিরা এটা মেনে নিতে পারেনি। ফলে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধই অনিবার্য হয়ে ওঠে। সবার মনের ভেতরে জেগে স্বাধীনতার সুপ্ত অনুভূতি।

বাঙালি জাতির মধ্যে স্বাধীনতার উপলব্ধি জেগে ওঠেছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেতনায়। তিনি নির্ভীকতার সঙ্গে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক জনসমুদ্রে তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন–

> 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

বঙ্গবন্ধু কবি ছিলেন না। কিন্তু বাঙালির দুর্দিনে ও স্বাধীনতার প্রয়োজনে তিনি যেন মুহূর্তের জন্যে এক শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্ম দিয়েছিলেন উপরোক্ত কথাগুলোর মাধ্যমে। কবিতার মতো বঙ্গবন্ধুর এই অমর বাণীর আকর্ষণেই বাংলাদেশের মানুষের জীবনে স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তাকে অত্যন্ত জরুরি করে তুলেছিলেন। আর তাই মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বাংলার বীর সন্তানেরা।

দেশের জন্য জীবন দিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের মনের মাঝে যেমন অমর হয়ে আছেন তেমনি আছেন আমাদের সাহিত্যের বিশাল অঙ্গনজুড়ে। ১৯৫২ থেকে ৭১ পর্যন্ত অসংখ্য জীবনের শোকগাথা আর বীরত্বের কাহিনিতে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী ধারা– সূচিত হয়েছে এক নতুন ইতিহাস।

বাংলা সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে ভাষা আন্দোলন আর স্বাধীনতা সংগ্রামের ছোঁয়া লাগেনি। ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, চলচ্চিত্র, সংগীত, চিত্রশিল্প, কথিকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম অমর হয়ে আছে।

১৯৭১ সালের পর থেকে বাংলাদেশের সাহিত্যে এক নতুন ধারার সূত্রপাত ঘটেছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় সমৃদ্ধ হয়েছে প্রকাশনা শিল্প। এরকম ভয়াবহ ঘটনার পর যে-কোনো দেশের সাহিত্যেই তা ঘটা স্বাভাবিক। কারণ সাহিত্য সমাজের দর্পণ। ভয়াবহ কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা থেকেই হৃদয়স্পর্শী মহৎ সাহিত্যের জন্ম হয়ে থাকে। একাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশের সমস্ত সাহিত্যকে একত্রে জড়ো করে বিচার করা হলেও তাই বলা যাবে। বিশেষ করে কবিতা ও গানের বিশাল অঙ্গন জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতা সংগ্রাম যেভাবে স্থান পেয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তা নিঃসন্দেহে বিরল দৃষ্টান্ত। এমন কোনো কবি নেই যিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে কবিতা বা ছড়া লিখেননি।

বাংলাদেশের প্রবীণ কবিদের পাশাপাশি তরুণদের হাতেও সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ক কবিতা ও গান। যেন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে উঠেছিলেন তাঁরা। প্রবীণ কবিদের মধ্যে যারা অগ্রণী ভূমিকার দাবিদার তাদের মধ্যে জসীমউদদীন, সুফিয়া কামাল, আহসান হাবীব, সিকান্দার আবু জাফর, আবুল হোসেন, শামসুর রাহমান, জাহানারা আরজু, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দীন আল আজাদ, আল মাহমুদ, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সৈয়দ শামসুল হক, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, কায়সুল হক, ফজল সাহাবুদ্দিন, আবদুল মান্নান সৈয়দ, মহাদেব সাহা, নির্মলেন্দু গুণ, রফিক আজাদ, শহীদ কাদরী, হুমায়ুন আজাদ, আসাদ চৌধুরী, সিকদার আমিনুল হক, মাহবুব তালুকদার, শামসুল ইসলাম, মুহম্মদ নুরুল হুদা, ফজল-এ খোদা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তরুণ কবিদের মধ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন তাদের মধ্যে হেলাল হাফিজ, মোশাররফ করিম, দাউদ হায়দার, শিহাব সরকার, রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, রবীন্দ্র গোপ, হাসান হাফিজ, সাহাবুদ্দিন নাগরী, তপঙ্কর চক্রবর্তী, ফজল মাহমুদ, সিরাজুল করিম, জরিনা আখতার, ফেরদৌস নাহার, দেলোয়ার বিন রশিদ, আবদুল বারিক ভূইয়া, হালিম আজাদ, মোহাম্মদ নুরুল আজাদ, ওয়াহিদ রেজা, মোহাম্মদ এমদাদুল হক, সৈয়দা নাজমুন নাহার, চন্দন ঘোষ, জাহাঙ্গীর হাবিবুল্লাহ, সৈয়দ হায়দার, কামাল চৌধুরী, ফজলুল কাশেম, ইউসুফ পাশা, মাহবুব হাসান, মাহমুদ শফিক, শাহাদাত বুলবুল, সৈকত আজগর, মুজিবুল হক কবির, নাসির আহমেদ, ইকবাল আজিজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিধি ১৯৭১ সালের নয় মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯৫২ সালের ভাষা শহিদরাই প্রথম মুক্তিযুদ্ধের বীজ বপন করেছিলেন। এ নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক কবিতা আর গান। আবদুল গাফফার চৌধুরী ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে লিখেছেন–

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।

এই গানটি আজ আমাদের একুশের সংগীত হিসেবে ব্যাপক প্রচলিত। একুশ এলেই ধ্বনিত হয় জনতার কণ্ঠে এই গান।

১৯৬৯ সালে গণ আন্দোলনের সময় পাকিস্তান সরকার জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ঘটায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। ঢাকায়ও হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। পুলিশের গুলিতে মারা যায় আসাদুজ্জামান আসাদ, মতিউর রহমান, ডক্টর শামসুজ্জোহাসহ আরো অনেকে। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তাঁর 'প্রতনু প্রত্যাশা' কাব্যগ্রন্থে এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি করে রেখেছেন। 'শহীদ স্মরণে' কবিতাটি কবি তাঁর ছোটো ভাই আসাদুজ্জামান আসাদকে স্মরণে লিখেন।

মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের অবস্থা দেখে কবিরা যেন তাঁদের কবিত্বশক্তি ভুলে গিয়েছিলেন। পুরো দেশটাই তাদের কাছে একটি 'প্রাণময় মহৎ কবিতা' বলে মনে হয়েছিল।

১৯৭১ সালের হানাদার বাহিনী বাংলাদেশকে যেভাবে লণ্ডভণ্ড করেছে, গ্রামবাংলার চেহারা পালটে দিয়েছে, অনেকে নিজের গ্রামকেও চিনতে পারেনি পরবর্তী সময়ে। পল্লি কবি জসীমউদদীনও তার বাইরে ছিল না। তিনি তার 'দগ্ধ গ্রাম' কবিতায় লিখেছেন–

এইখানে ছিল কালো গ্রামখানি, আর কাঠালের ছায়া,
টানিয়া আনিত শীতল বাতাস কত যে করি মায়া।
সারা গাঁওখানি দগ্ধ শ্মশানে দমকা হাওয়ায় যায়,
দীর্ঘনিঃশ্বাস আকাশে পাতালে ভস্মে উড়িয়া যায়।
তাঁর কবিতায় নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধ এসেছে।

অনীক মাহমুদ 'মুক্তিযুদ্ধ' গ্রন্থে লিখেছেন– পাকিস্তানি সৈনিকদের বাঙালি নিধন তৈমুর লঙ, নাদির শাহের পাশবিকতার চেয়েও জঘন্য ও হীনমন্য। ১৯৭১ সালে যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তারা নিজের জীবনের কথা ভাবেননি। তাদের একটিই লক্ষ্য ছিল মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার মুক্তি। কবি সুফিয়া কামাল তাঁর 'আজকের বাংলাদেশ' কবিতায় লিখেছেন–

দ্বন্দ্ব ও দ্বিধায় কেটে গেছে বহুকাল
কত যে ভয়াল
শ্বাপদ সঙ্কুল মন তিমির নিশীথে
শতাব্দীর অন্তেও সে রহিবে অক্ষয়।

একাত্তরের নয় মাস ধরে নানাভাবে অত্যাচারিত হয়েছে এদেশের জনগণ। বাড়িঘর ছেড়ে জঙ্গলেও থাকতে হয়েছে পশুপাখির সাথে। ঘর থেকে বেরুতে হয়েছে মৃত্যুকে হাতের মুঠোয় নিয়ে। হানাদার বাহিনীর হাতে পড়ে গেলে রক্ষা নেই, মৃত্যু অবধারিত। কবি আহসান হাবীবের 'সার্চ' কবিতায় সে দৃশ্য জীবন্ত হয়ে আছে।

পাকিস্তানি শাসনের ২৪ বছরেও বাঙালিদের সুখ-শান্তি আসেনি। দীর্ঘদিনের এই বৈষম্য নীতির চাকায় পিষ্ট হয়েই বাঙালি হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। এমন চিত্র বিধৃত হয়েছে বাংলাদেশের কবিতায় ও গানে। স্বাধীনতা আমাদের ত্যাগ আর রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের সোনালি ফসল। এর ইতিহাস যেমন করুণ ও মর্মান্তিক, তেমনি আনন্দ ও পরম গৌরবের। তাই কবি শামসুর রাহমান 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় লিখেছেন–

স্বাধীনতা তুমি
শহিদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।
স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে আকূল মেঘনার বুক।

স্বাধীনতার জন্য বাবা সন্তানকে ঠেলে পাঠিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের দিকে। চোখে জল রেখে মাও তার ছেলেকে পাঠিয়েছে দেশ স্বাধীনের জন্য। কবি আবুল হোসেনের 'পুত্রদের প্রতি' কবিতায় তা প্রকাশ পেয়েছে। খ্যাতিমান কবি জাহানারা আরজু'র 'শোনিতাক্ত আখর' কাব্যগ্রন্থে ১৯৫২ থেকে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি উঠে এসেছে। বিশিষ্ট কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ 'মুক্তিযোদ্ধা'

কবিতায় অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার শহিদ হয়ে আত্মদানের কথা উল্লেখ করেছেন। ফজল সাহাবুদ্দীন মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। 'নতুন ভিয়েতনাম' কবিতায় কবি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেছেন। 'মুক্তিযোদ্ধাকে' কবিতায় কবি দুরন্ত দুর্বার গতিতে মুক্তিযোদ্ধারা যে যুদ্ধ করেছে তা বর্ণনা করেছে।

১৯৭১-এর যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর ভূমিকা ছিল আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে বাস করা হিংস্র জানোয়ারের চেয়েও বেশি। সৃষ্টির সেরা মানুষ জাতির প্রতি তাদের কোনো দয়ামায়াই ছিল না। তাদের হিংস্রতা পশুত্বকেও হার মানিয়েছে। 'পরিশুদ্ধ অমল প্রাণের ডাক' কবিতায় কবি কায়সুল হক তা প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশ সবুজ প্রকৃতির দেশ। এর আকর্ষণে যুগে যুগে ইংরেজসহ বহু বিদেশি শাসকের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। লুটেপুটে খেয়েছে এদেশের সম্পদ। কিন্তু বাংলার প্রকৃতিকে হরণ করতে পারেনি তারা। পাকিস্তানি হানাদারদের তাণ্ডবলীলায় দেশ ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হলেও স্বাধীনতার আনন্দে সবকিছুই আবার সজীব হয়ে উঠেছে। কবি কায়সুল হকের 'সতেজ মনোবৃত্তি' বাংলাদেশের কবিতায় নতুন প্রাণ সঞ্চারিত করেছে, চেতনায়ও এনেছে নতুন প্রাণের জাগরণ।

হাসান হাফিজুর রহমান লিখেছেন 'ফেব্রুয়ারি ঢাকা আমার', 'মৃত্যুর বকুল গন্ধ', 'মিছিলের এক মুখ' প্রভৃতি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কবিতা। দেশের জন্য আত্মত্যাগ কবির হৃদয়কে জাগ্রত করেছে। 'মিছিলের এক মুখ' কবিতায় কবি লিখেছেন–

শহিদের সব মুখ একাকার হলো আজ
মিছিলের এক মুখে।
শুধুই একটি মুখ ভাসে আগে
ত্যাগের সাহসী মুখে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মানুষের সঙ্গে তাদের ঘরবাড়িও জ্বালিয়ে ভস্ম করেছে পাক হানাদাররা। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ'র কবিতায় মর্মস্পর্শী বর্ণনায় তা পাঠকচিত্তে নাড়া দিয়েছে।

সৈয়দ শামসুল হক শুধু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। পৃথিবীর বহুদেশের অত্যাচারী শাসকের শোষণের কথা তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। সৈয়দ শামসুল হকের 'গেরিলা' কবিতায় সে দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল তাঁর 'ছবি' কবিতায় লিখেছেন–

আসুন ছবির মতো এইদেশে বেড়িয়ে যান
রঙের এমন ব্যবহার, বিষয়ের এমন তীব্রতা
আপনি কোনো শিল্পীর কাছে পাবেন না।
দীর্ঘ ন'টি মাস দিনরাত পরিশ্রম করে
বানিয়েছি এই ছবি।

স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিতে হয়। রক্ত না দিয়ে স্বাধীনতা না পাওয়াই অস্বাভাবিক।

হুমায়ুন আজাদ 'মুক্তিবাহিনীর জন্যে' কবিতায় লিখেছেন–

তোমার রাইফেল থেকে বেড়িয়ে আসছে ভালোবাসা
সর্বাঙ্গে তোমার প্রেম দাউ দাউ জ্বলে, তুমি পা রাখতেই
ছিড়ে পড়ে চানতারা মার্কা বেঈমান পতাকা।

'সৌন্দর্য-সৈনিকের শপথ প্যারেড' কবিতায় প্রতিবাদী কবি রফিক আজাদ যথার্থই বলেছেন–

ট্রিগারে আঙুল রেখে, পুনর্বার বুঝে নিতে চাই
অধিনায়কের কণ্ঠে উচ্চারিত গাঢ় শব্দাবলি,
শপথ প্যারেডঃ 'তোমাদের মনে রাখা প্রয়োজন
এই যুদ্ধ ন্যায় যুদ্ধ; বিশ্বাসঘাতক নয়, আজ
সত্যের বিরুদ্ধে নয়, আজীবন সপক্ষে লড়াই।

আবদুল মান্নান সৈয়দের 'মুক্তিযুদ্ধ' ও নির্মলেন্দু গুণের 'স্বাধীনতা শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো' কবিতায় স্বাধীনতা সংগ্রামের মুক্তিযুদ্ধ এসেছে অনেকটা প্রতীক ধর্মীয়তায়। শিকদার আমিনুল হক লিখেছেন 'আশায় বাঁচি আশায়।' 'রুধির স্রোতের মধ্যে শায়িত মা আমার' লিখেছেন আল মুজাহিদী। এসব কবিতায় ৭১-এর দুর্দশার কথা উল্লেখিত হয়েছে। শামসুল ইসলাম তাঁর 'বাংলাদেশ-৭১' ও 'অনুজের লাশ' কবিতায় স্বাধীনতা সংগ্রামের হৃদয়স্পর্শী অবস্থার বর্ণনা করেছেন। তিনি 'অনুজের লাশ' কবিতায় লিখেছেন–

আগুন ছিলো মুক্তিসেনার
স্বপ্ন-ঢলের বন্যায়
প্রতিবাদের প্রবল ঝড়ে
কাঁপছিলো সব অন্যায়।

কবি মহাদেব সাহা স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে লিখেছেন 'একজন মুক্তিযোদ্ধার ডায়রী' ও 'একদিন এই ঢাকা' সহ আরো কবিতা। মুক্তিযুদ্ধকালে স্বৈরাচার পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে অরূপ তালুকদার লিখেছেন– 'যুদ্ধত্তোর প্রত্যাবর্তনসহ আরো কবিতা।

একাত্তরের ভয়াবহ রূপ শুধু পুত্রহারা মায়ের বুকেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বোন হারিয়েছে ভাইকে, ভাই হারিয়েছে বোনকে, সন্তান হারিয়েছে তার বাবা-মাকে, স্বামী হারিয়েছে স্ত্রীকে, স্ত্রী হারিয়েছে স্বামীকে, বন্ধু তার বন্ধুকে। এভাবে অনেকেই অন্তত একবার বেদনার অনলে পুড়েছে একাত্তরের সেই নয় মাস ধরে। সেসব কথা আমাদের কবিদের দৃষ্টি এড়ায়নি। নানাভাবে তা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের কবিতা ও গানে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে যে সমস্ত সংগীত প্রচারিত হয়েছে তার প্রতিটিই একেকটি উৎকৃষ্ট কবিতার মর্যাদা লাভ করতে পারে। আর এ পর্যায়ে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের মধ্যে গোবিন্দ হালদার, সলিল চৌধুরী, গাজী মাজহারুল আনোয়ার, শহীদুল ইসলাম, ফজল- এ খোদা, আবদুল লতিফ ও নঈম গওহর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে এমনিভাবে লেখা হয়েছে অসংখ্য কবিতা ও গান। মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা আর গৌরবগাথা নিয়ে কাব্য ও সংগীত রচনার বিষয়টি শুধু বাংলাদেশের কবিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্যদেশের কবিরাও এ বিষয়ে কবিতা ও গান লিখেছেন। এক্ষেত্রে ভারতের খ্যাতিমান কবি অমিয় চক্রবর্ত্তী, অন্নদা শঙ্কর রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে আজ ৪৮ বছর। আজো কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কবিতা ও গান লেখা হয়। অনেক তরুণ কবি আছেন যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি শুধু পরিবারের বড়োদের কাছ থেকে শুনেছে সেই ভয়াবহতার কথা। সেই পাক হানাদারদের বর্বরতা ও অত্যাচারের কথা শুনে বাঙালির রক্ত শরীরে আছে বলেই নিবিড় চিত্তে একাত্তরকে স্মরণ করে কবিতা ও গান রচনা করে ফেলেছে আপন মনে। তা এখনো বাংলাদেশের সাহিত্যে সমাদৃত। তাই স্বাধীনতার কবিতা ও গানকে আমি বলছি চিরঞ্জীব, যা কখনো পাঠক সমাজ থেকে হারিয়ে যাবে না। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, বাঙালি উজ্জীবিত থাকবে, ততদিন চিরঞ্জীব থাকবে স্বাধীনতা সংগ্রামকে নিয়ে লেখা কবিতা ও গান।

লেখক: কলামিস্ট ও সাংবাদিক

একাত্তরের জননী

মোঃ মাজেদুল ইসলাম

মা হলো মহান সৃষ্টিকর্তার এমন একটি দান, যা সবসময় সবার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর শব্দ 'মা'। মা ছাড়া পৃথিবীতে আর এত সুন্দর কোনো শব্দ নেই। মা শব্দটি শুনলেই সবার মনে তার মায়ের চেহারা ভেসে ওঠে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মা সকলের জন্য 'মা'-ই।

প্রতিদিনের মতো সেদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠে প্রকৃতির সুন্দর মনোরম শোভা দুচোখ মেলে দেখলেন তিনি। তখনো বাড়িতে ছোট্ট শিশুরা ঘুমে নিমগ্ন। মনে মনে বললেন, আল্লাহ আমাদের সহায় থেকো। দেশে তখন মুক্তিযুদ্ধ চলছে। বাংলার নিপীড়িত ও নির্যাতিত গণমানুষকে মুক্ত করতে গেরিলা যুদ্ধের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কৌশলের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধারা সারা দেশে যুদ্ধ করছেন। পাকিস্তানি সেনাদের হাত থেকে বাংলাকে মুক্ত না করা পর্যন্ত মরণপণ যুদ্ধ করে জয় ছিনিয়ে আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁরা।

দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ২৭শে মে। আনুমানিক বেলা ২টার সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলার রাধানগর গ্রামে ঢুকে পড়ে। তারা সাধারণ মানুষের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং নির্বিচারে গুলি চালায়। এভাবে নিরস্ত্র ও সাধারণ বাঙালিদের ওপর নির্মম অত্যাচার ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। এলাকার মানুষ বাড়িঘর ফেলে পার্শ্ববর্তী ফসলের মাঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বাঁচাও বাঁচাও বলে আর্তনাদ করতে থাকে। মানুষের বাড়িঘরে লাগানো আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। ভয়ে তাঁর শরীরের রক্ত ঠান্ডা হয়ে আসছিল। অন্তঃসত্ত্বা জননী শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে কোলের শিশু সন্তান দুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে বাড়ির পাশে কাউন খেতে লুকিয়ে ছিলেন।

চারদিকে তখন গুলির শব্দ, প্রাণের ভয়ে মানুষ ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে এলাকা ছেড়ে। কিছুক্ষণ পরেই জানতে পারলেন তাঁর কলেজ শিক্ষক স্বামীসহ চাকরিজীবী ও শিক্ষার্থী সহোদর দুই ভাইকে পাক হানাদার বাহিনী নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করেছে। সুন্দর পৃথিবী থেকে ঝরে গেল তিনটি তরুণ তাজা প্রাণ। বিয়ের মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় স্বামীহারা হলেন তিনি। জীবনে নেমে এল চরম বিপর্যয়। লোকবল ও সময় স্বল্পতার কারণে সেদিন তাঁর স্বামী ও সহোদর দুই ভাইকে একই কবরে সমাহিত করা হয়। ইতোমধ্যে কবরটিকে সরকারিভাবে 'রাধানগর গণকবর' ও গণহত্যাকে 'রাধানগর গণহত্যা' হিসেবে স্মৃতিফলক উদ্‌বোধন করেন লে. কর্নেল কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীরপ্রতীক। মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁর স্বামীর ছোটো ভাইকেও পাক হানাদার বাহিনী নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে।

অন্তঃসত্ত্বা জননীকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছোটো দুটি শিশু সন্তানসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সেদিন প্রতিবেশী দেশ ভারতে চলে যেতে হয়। জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। কিন্তু তাঁকে বাঁচতে হবে তাঁর অনাগত সন্তান এবং ছোটো শিশু সন্তান দুটির জন্য। শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত জননী স্বামীহারা হওয়ার পর যুদ্ধের সেই ভয়াবহতার মাঝে একা একজন নারী হয়েও তিনি সন্তানদের নিয়ে নতুন জীবন শুরু করেন। স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশের কয়েকটি অঞ্চল শত্রুমুক্ত হলে তিনি ভারত থেকে ফিরে আসেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন পূর্বে তৃতীয় সন্তানের জননী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। সন্তান জন্মের সময় জননী নিরাপদে ছিলেন না। সেসময় পাক হানাদার বাহিনী এলাকায় আক্রমণ করে।

আহসান সাবেরা কামাল ১৯৫০ সালের ৩০শে এপ্রিল পঞ্চগড় জেলার রাধানগর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়। বাবা পেশায় ছিলেন একজন চিকিৎসক ও মা গৃহিণী। বাবা-মায়ের আদরের বড়ো কন্যা ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৬ সালে এসএসসি পাস করেন। বেশিদূর লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি তাঁর। সুপাত্র পেয়ে বাবা-মা পরীক্ষা পাসের বছরে কলেজ শিক্ষক মোঃ খাদেমুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। স্বামী ছিলেন একজন সজ্জন ও সাদা মনের মানুষ। এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ।

মহান মুক্তিযুদ্ধে উচ্চশিক্ষিত ও চাকরিজীবী স্বামী শহিদ হলে তিন শিশু সন্তানকে নিয়ে স্বামীর বাড়িতেই নানা প্রতিকূলতা ও অভাবঅনটনের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করেন তিনি। পরবর্তীতে বিদ্যোৎসাহী শ্বশুর আলহাজ্ব খোশ মোহাম্মদ সরকার-এর আন্তরিক সহযোগিতায় ও নিজ প্রচেষ্টায় তিনি আরো শিক্ষালাভ করেন এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। কৃষি ও চাকরির সামান্য আয়ের টাকায় সম্পূর্ণ নিজ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সামাজিক প্রতিকূলতাকে জয় করে তিন সন্তানকে উচ্চশিক্ষায় সুশিক্ষিত করেন। বাবা-মায়ের আদর্শে লালিত হয়ে তিন সন্তান আজ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত।

জননীর সন্তানেরা বিসিএস পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি চাকরিতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রশংসিত। বড়ো ছেলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এমবিবিএস ডিগ্রিসহ পেশাগত উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে বর্তমানে রংপুর মেডিক্যাল কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। দ্বিতীয় ছেলে কৃষি বিজ্ঞানে ডিগ্রি অর্জন করে ড্যানিডা ফেলোশিপ নিয়ে ডেনমার্ক-এ উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত আছেন। ছোটো ছেলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এমবিবিএস ডিগ্রিসহ পেশাগত উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে বর্তমানে রংপুর মেডিক্যাল কলেজে ইউরোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন। ছোটো ছেলে কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে ইতোমধ্যে দেশ বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। দ্বিতীয় ছেলে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। বড়ো ছেলে রক্ত বিজ্ঞানে পারদর্শী এবং ক্যানসার-এর মতো জটিল রোগ নির্ণয়ে ইতোমধ্যে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছেন।

আহসান সাবেরা কামাল সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে উচ্চশিক্ষিত তিন বৌমা ও ছয় নাতি-নাতনিদের সঙ্গে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করছেন। ইতোমধ্যে তিনি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের 'জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ' এর আওতায় 'সফল জননী' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। একাত্তরের জননী গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তোমায়। একইসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, শহিদ, বীরমুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা, একাত্তরের শহিদ জননীসহ সকলকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

লেখক: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব

নিবন্ধ

স্বাধীনতা ও আইনের শাসন

সাহিদা বেগম

স্বাধীনতা ও আইনের শাসনের কাঠামো যে মূলভিত্তিগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রথমেই বলতে হয় স্বাধীনতা কী? স্বাধীনতা শব্দটির অর্থ ব্যাপক। স্বাধীনতা বলতে বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতা হতে পারে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হতে পারে, ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে পারে, বাক স্বাধীনতা হতে পারে। একটি স্বাধীনতা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে সেই রাষ্ট্রের জনগণের আনুষঙ্গিক স্বাধীনতাগুলো এসে যায়।

একটি সার্বভৌম এবং স্বাধীন দেশ এবং জনগণকে পরিচালনার জন্য সরকারের হাতে একটি শাসনযন্ত্র থাকে। এই শাসনযন্ত্রের পদ্ধতিগুলো হচ্ছে আইন। ইতিহাসের ঘটনা বিন্যাস করলে দেখা যায় যে, যখন কোনো রাষ্ট্র আইনের যুক্তি ছাড়া শাসন করে তখন সেই রাষ্ট্র স্বৈরশাসন চালায়। এই অবস্থার পরিবর্তন তখনই সম্ভব যখন রাষ্ট্র বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে এবং বিচার বিভাগ প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতার জন্য দোষী ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী সাব্যস্ত করে তাকে শাস্তিদান করে। বিচার বিভাগের পক্ষেই সম্ভব প্রশাসনের মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ বন্ধ করা। বিচার বিভাগ যখন এই ক্ষমতা আইনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় তখন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের স্বাধীনভাবে বিচারকার্য করার ক্ষমতাই আইনের শাসনের ভিত্তি।

আইনের শাসন কথাটি শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার সাথে মিশে গেছে। শান্তি ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব সরকারের রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন, গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের স্বীকৃতির মাধ্যমে এবং স্বৈরশাসক এটা করেন জনগণের ওপর নির্যাতন চালিয়ে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিচার বিভাগের দায়িত্বই প্রধান। নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগ জনসাধারণের অধিকার রক্ষার জন্য আইনের ব্যাখ্যা দেন। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্র আইনের শাসন দ্বারা দেশ শাসন করার অর্থই হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ওপর কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না করা। আইনের শাসনের উদ্ভবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এটা রাজার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে একদিকে সংসদকে শক্তিশালী করেছে অপরদিকে বিচারপতিদেরও দেশকে স্বৈরশাসন থেকে রক্ষা করার এবং জনসাধারণের অধিকার রক্ষা করতে সাহায্য করেছে।

আইনজীবীরা আইনের শাসন রক্ষায় বিচার বিভাগকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য অনেক রক্ত ঝরেছে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন করা হলেও আমরা সেই সংবিধানকে রক্ষা করতে পারিনি। জনগণই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। একমাত্র গণতান্ত্রিক সংবিধানের মাধ্যমেই একটি জাগ্রত সমাজ প্রতিষ্ঠিত এবং এর মধ্যেই দেশ ও জনগণের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

লেখক: গবেষক ও আইনজীবী, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ

নিবন্ধ

নারী জাগরণের আলোকবর্তিকা বেগম রোকেয়া

ফাতেমা আক্তার হ্যাপি

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে 'বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদূত' বলা হয়। ৯ই ডিসেম্বর সাহিত্যিক, শিক্ষানুরাগী, সমাজ সংস্কারক বেগম রোকেয়ার ১৩৯তম জন্ম ও ৮৭তম মৃত্যুবার্ষিকী। ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের ইতিহাসে বেগম রোকেয়ার অবদান চিরস্মরণীয়। সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পেলেও বাড়িতে বড়ো ভাইদের সহায়তায় পড়ালেখা করেন তিনি। সামাজিক পশ্চাৎপদতা আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, নারী সমাজের বহুমাত্রিক অধিকার আদায় ও নারী শিক্ষার পথনির্দেশক বেগম রোকেয়া। তিনি প্রথমবারের মতো বাঙালি মুসলিম সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অধিকারের দাবি তুলে ধরেন, নারী স্বাধীনতার পক্ষে নিজের মতবাদ প্রচার করেন।

বেগম রোকেয়ার ছিল অদম্য সাহস ও প্রবল আত্মবিশ্বাস। ১৯০১ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর প্রদত্ত অর্থে মাত্র পাঁচ জন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। পরবর্তীতে পারিপার্শ্বিক কারণে ভাগলপুর ছেড়ে বেগম রোকেয়া কলকাতায় মাত্র আট জন ছাত্রী নিয়ে নতুন উদ্যমে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি মেয়েদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন।

সাহিত্যিক হিসেবে বেগম রোকেয়া ছিলেন অনন্য। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও তার লেখনী ছিল সোচ্চার। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে– মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন, পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী প্রভৃতি। এছাড়া রয়েছে ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় মুসলিম সম্মেলনে বেগম রোকেয়া বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন, যা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল দুঃসাহসিক কাজ। তার লক্ষ্য ছিল, নারী শিক্ষার প্রসার, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি এবং মুসলমান সমাজের অবরোধ প্রথার অবসান। নারীকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা প্রদানের স্বীকৃতির লক্ষ্যেই পরিচালিত হয় তার সকল চেষ্টা।

মুসলমান মেয়েদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং তাদের অধিকার আদায়ের জন্য ১৯১৬ সালে বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠা করেন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম বা মুসলিম মহিলা সমিতি'। বেগম রোকেয়াই হচ্ছেন সেই মহীয়সী নারী, যার প্রচেষ্টায় আজকের নারীরা এই অবস্থানে আসতে সক্ষম হয়েছেন।

লেখক: প্রাবন্ধিক

আটাশ বছর হাজার রাতি

লিলি হক

চয়ন মানে কথা ও কবিতার আসর
চয়ন মানে নিয়মিত সাহিত্য বাসর
চয়ন মানে ফুল পাখি প্রজাপতি কলতানে মুখর
প্রেস পেস্টিং বাঁধাই দেনা পাওনা ধূসর
চয়ন প্রকাশন মানেই কাঁধে ব্যাগ শুকনো
রুটি এক আজলা পানি, তবুও সুখ
নতুন সংখ্যা হাতে লেখকের মুখখানি
চয়ন প্রকাশন মানে সকাল সন্ধ্যা নূপুর
চয়ন প্রকাশন মানে মহুয়া বনে
দোয়েল শ্যামার গানের সুর
কম্পিউটারে ঝুঁকে থাকা উপবাস রাত দিন,
প্রুফ দেখা প্রচ্ছদ আঁকা চয়ন সাহিত্য
ম্যাগাজিন মানে সাঁতাশ পেরিয়ে আটাশে পা
অবিরাম হাসি মুখে কাজ করা
রোদ্দুর সকাল সন্ধ্যা নূপুর
চয়ন সাহিত্য মানে এক দশক পূর্তিতে
আনন্দ আড্ডায় শরতের দুপুর
আটাশ বছর হাজার রাতি নির্ঘুম দূর বহুদূর
চয়ন মানে শিল্পীর কণ্ঠে হাসন লালন
ভাটিয়ালি সুর চয়ন মানে দশ দিগন্তজুড়ে
ভালোবাসা কাছে আসা
ভালোবাসা শুধুই ভালোবাসা।

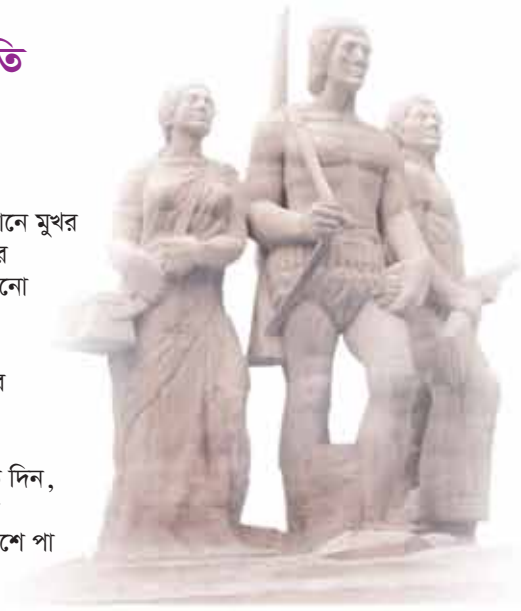

সতেরোই মার্চ ১৯২০

সাঈদ তপু

হাজার বছর ধরে
কিংবা আরো আগে উয়ারী-বটেশ্বরে
তোমারই অপেক্ষায় অনাবাদী আমি
ছলছল চোখে জল
পেঁচিয়ে লতাপাতা বাঁকে বাঁকে থামি।
কখন আসবে তুমি?
আমার সবুজ দেহে লোলুপের চোখ
বণিকের ছলে এসে করে যায় ভোগ
মুক হয়ে থাকি, ভাষা নেই মুখে
চোখের আগুন জল
নদী হয়, খাল হয়
হ্রদ হয়ে বয়ে যায় শেষে
কখন আসবে তুমি জীবরাঙ্গিল বেশে।
আমি শুবু টেনে যাই সময়ের গুণ
এ দেহ যে কতবার হয়েছিল খুন
কত যে ব্যাভিচারী আসে দলে দলে
আত্মাটা মরে নাই তবু
শুধু তোমারই অপেক্ষায় অনাবাদী আমি
একরাশ উচ্ছ্বাস
কখন আসবে তুমি?
কখন উঠবে হয়ে আবাদী এ ভূমি?
অবশেষে ধরাধামে এল সেই দিন
সতেরোই মার্চ উনিশ'শো বিশ
এই দিন থেকে বাজে মুক্তির শিস।

স্বাধীনতা তুমি

আবু তৈয়ব মুছা

স্বাধীনতা তুমি–
লাল গোলাপের একটি ফোঁটা ফুল,
তোমারে পেতে জীবন দিতেও
হয়নি কারো ভুল।
স্বাধীনতা তুমি–
আঁধার রাতে, জোসনা মাখা আলো,
ছিনিয়ে নিতে তোমারে ওগো,
কত যে শহিদ হলো।
স্বাধীনতা তুমি–
সবুজের মাঝে,
সূর্যের রক্তিম পতাকা,
স্বাধীনতা তুমি–
পাকিস্তানের পরাজয়ের নাকে খত দেওয়া,
আগুনে পোড়ানো,
হায়েনার কুশপুত্তলিকা।
স্বাধীনতা তুমি–
ছুঁড়ে ফেলা
তেইশ বছরের শাসন,
স্বাধীনতা তুমি–
জ্বলন্ত চিতায়
শেখ মুজিবের ভাষণ।
আর?
স্বাধীনতা তুমি–
বিশ্বের বুকে
বাংলার মানচিত্রের আসন।

কণায় কণায় ভালোবাসা

মাইন উদ্দিন আহমেদ

তোমার কণায় কণায়
ভালোবাসারা করে খেলা,
ঠোঁটের কোণে এসে মাঝেমাঝে
বসায় দারুণ মায়াবী মেলা।
ওরা কখনো কখনো চলে যায়
চোখের কাজল তীরের পাশে,
আমার দিকে তাকিয়ে ওরা
সমবায় ভঙ্গিতে হাসে।
হঠাৎ ওরা মিছিল করে
হাঁটতে থাকে দেহের ভাঁজে ভাঁজে,
জ্যামিতিক ঢং ঢেউয়ের মতো
তুমিও নড়ে ওঠে মিষ্টি সলাজে।
সুন্দরেরা নৃত্যের তালে ছুটতে থাকে
মাথা থেকে পা, আবার মাথামুখী,
অস্থির অধরা ভালোবাসাদের দেখে
বেহুঁশ হওয়া তক্ আমি খুব সুখী।

শিকারি দেখি আনত

শাহনাজ

সব রকম আখড়া ছাড়িয়ে প্রান্তরে যেখানে ধানের ঢেউ,
সবুজের চৌহদ্দির মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ দোলে।
ক্ষেতের সুবাস পথে মিশে গেছে সবুজের আরো
চারপাশ কী নির্জন!
প্রকৃতির শান্ত স্রোতে, হেঁটে পরাভূত ব্যাধ ফিরে এল।
নিঃসাড় দুনিয়া কত বড়ো আর, দেখি আর ভাবি যদি
শূন্য হয়ে মিশে যেতে পারতাম একা!
প্রকৃতি একাকী থাকতে দেয় মানুষ!
হাসি পায়...
এ কোন অনধিকারে পা ফেলি নৈঃশব্দ আবিষ্কারে
থাকুক প্রাণ-প্রকৃতি নিঃশব্দ বৃক্ষ হয়ে মানুষ!
কার্তুজের সার থাকে জ্যাকেটের খোপে
দো'নলা বন্দুক কাঁধে উলটে রাখা
মাটির দিকে ঝোলানো– অচল যে ঘোড়া!
বিষণ্ন শোভন হাঁটে, সোয়ারিও ঝুলে থেকে ঠান্ডা
চারপাশে ওড়ে ও বসা শীতের পাখি
তৈমূর লঙে ঢঙি এক পা বকটি !
প্রতিটি শব্দের উৎস চেনা যায় ভিন্ন
ছড়িয়েছে প্রশ্রয়ের দীপ্তি মিঠেকড়া সূর্যালোক
মনে হয় আজীবন চোখ মেলে থাকি!

অধরা থেকে গেলাম

ফারিহা নূর

চাঁদের মতো নজর
নীরসও বটে–
পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখেছি
ভেসে যায় সব কিছু
বাতির দাপটে।
প্রকাণ্ড আকাশ
নিভু নিভু নীচু থেকে
তারার খোঁজ মেলে না
ঝকঝকে রাতে,
কে আর দেখছে
যারা চাঁদের বুকে নামে
তারা তুলে নেয় কিছু মাটি
চাঁদ হতে গিয়ে
তাই অধরা থেকে গেলাম।

দোলনা থেকে কবর

তাপসী রাবেয়া

দোলনা থেকে কবর
শিখে তো গেলাম
তবুও তোমায়
কোথায় গেলাম!
বলো,
কীভাবে চাইতে হবে।

১৬ই ডিসেম্বর

নিলু হোসেন

উনিশশো একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর
স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন।
ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে
দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে
অর্জিত এ বিজয় দিয়েছে
আমাদের স্বাধীনতা
লাল-সবুজের একটি পতাকা
স্বাধীন সার্বভৌম দেশ
যার নাম 'বাংলাদেশ'।

প্রেমে প্রশান্তির গান

ইমরুল ইউসুফ

হাইতোলা দুপুর
ক্রমেই বাড়তে থাকে রোদের বয়স
সানশেডে পাখিদের নরম পালক
উড়ে উড়ে বিকেলের অপেক্ষায়
ভাবনার নামতা শেখায়।
আমাদের প্রেমের উঠোনে তখন
বৈশাখের তুমুল ঝগড়া
শহুরে কাকের মতো একরোখা তোমার ক্রোধ
মুহূর্তেই মোমোর মতো গলিয়ে দেয়
কফির উন্মত্ত আত্মঘাতী ধোঁয়া।
ফ্লাড লাইটের বৈষয়িক আলো
হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত
অথচ তোমার আমার প্রেমে
চাঁদের বুড়ির মতো, দূর্বা সবুজ ভোরের মতো
প্রশান্তির গান শোনায়।

প্রত্যাশা মনজুড়ে

ওয়াসীম হক

খেলে যায় আলোছায়া জীবনের মিছে মায়া
খেলে যায় রোদ্রের উজ্জ্বল গান
আছে কাঁদা আছে হাসি তবু কত ভালোবাসি
বিনিসুঁতো গাঁথা মালা এক মন প্রাণ।
জীবনের বাহুডোরে সাঁঝবেলা আর ভোরে
দুঃখ পাখি সুখ পাখি হলো একাকার
ফুলে ফলে ভরা ঘর হুট করে এলে ঝড়
উড়ে যায় ছুড়ে ফেলে স্বপ্ন খামার।
জানে ফুল ঝরে যাবে ফুলদানি খুঁজে পাবে
তবু সেতো ভোর হলে মায়া জড়াবেই
হতাশায় শেষ নয় এই পরিবেশ নয়
প্রত্যাশা মনজুড়ে আলো ছড়াবেই।

এই বাংলাদেশ

রুস্তম আলী

এই সেই দেশ
যে দেশে জন্মেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
শত কোটি জনতার অন্তরাত্মা
বাঙালির প্রদীপ।
এই সেই দেশ
যে দেশে আছে পদ্মা, মেঘনা আর যমুনা
পরাজয় কাকে বলে বাঙালি জানে না।
এই সেই দেশ
যে দেশে সোনালি, রুপালি মাছে করে খেলা
কৃষকের ক্ষেতে ফলে সোনা।
এই সেই দেশ
যে দেশে পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে যায়
নদীতে নৌকায় মাঝি পাল উড়াইয়া
ভাটিয়ালি গান গায়।
এই সেই দেশ
যে দেশের বনে আছে বাঘ আর হরিণ
কেওরা, গড়ান আর সুন্দরীর নাই কোনো শেষ।
এই সেই দেশ
যে দেশে আছে পাহাড় আর পর্বত
ডাবের পানি পিপাসায় শরবত।
এই সেই দেশ তুমি নেও চিনিয়া
যে দেশের বীর বাঙালি
জয় বাংলা ধ্বনিতে
লাল-সবুজের পতাকা আনল ছিনিয়ে।

কুমারী

সাদিয়া সিমরান

চাঁদ হতে গেছিলাম
জোসনা কিরণ বেয়ে
ছুঁয়ে যদি ফেলো
তাহলে যে বুড়ি হয়ে যাব?
সেই অকাল বয়সে
কী সব ভাবনা...
আর একদিন ছুঁয়ে দিতে গিয়ে
দেখেছি পাথুরে নজর স্তব্ধ প্রখর
না ছুঁতে দিয়েছি
না ছুঁতে পেরেছি!
কিছুই পারিনি...

বিজয়ের গান

রবিউল ইসলাম

বিজয়ের মাসে চলো গাই একসাথে
বাংলার মাটি; বাঙালি যত
মুক্ত স্বাধীন; নয় পরাজিত,
মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনায়–
সোনার বাংলাদেশ আঁকব
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ গড়ব।

মানুষের মন

হিরা চৌধুরী

মানুষ সুন্দর, সুন্দর মানুষের মন
মানুষের চেয়ে সুন্দর কিছু নাহি এ ভুবনে।
প্রকৃতি সুন্দর রূপ বৈচিত্র্যের ধারায়
ঝরনা সুন্দর পানির কলকাকলিতে
পাহাড় সুন্দর বিশালতায়
আকাশ সুন্দর নীলিমায়
সাগর সুন্দর ঢেউয়ের গর্জনে
মানুষ সুন্দর বুদ্ধিমত্তা সাহসিকতা
আর একটা শুদ্ধ মনের কারণে।

শীতের গীত

ফায়েজা খানম

হিম হিম বায়ুর স্বাদ
আসছে দেখ তেড়ে।
দিনে গরম, রাতে শীত
কুয়াশার চাদর মুড়ে।
শিশিরের স্নানে লতাপাতা
ভোরের আলোয় দোলে।
ভাঙে চারদিকের নীরবতা
কুয়াশার ঐ ঘোমটা খুলে।
শুরু হলো লেপ-কাঁথার জড়াজড়ি,
কখনো চাঁদর, কখনো সোয়েটার পরি।
কোনো কাজে মন বসে না
শীতের আভাস পেয়ে।
পিঠাপুলিতে মন ভেজাবো
নানুর বাড়ি গিয়ে।
খেঁজুর রসের কলসির লোভে
বালক দৌড়ায় চুপিসারে,
ভূঁইয়া বাড়ির মেজো ছেলেও
নামাজ শেষে খুঁজে তারে।
শুষ্কতার হাত ধরে আসে শীত
প্রকৃতিরা গায় কেবল তারই গীত।

নিবন্ধ

ঋতু বৈচিত্র্যে শীত ঋতু

জাবরীনা রহমান

হেমন্তকে মাঝপথে থামিয়ে প্রকৃতির মঞ্চে দোর্দণ্ড প্রতাপে আবির্ভূত হয় শীত। পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস শীতকাল হলেও অগ্রহায়ণ মাস থেকেই শুরু হয়ে যায় শীতের আনাগোনা। তবে হাড় কাঁপানো শীত বলতে যা বোঝায় তা দেখা পাওয়া যায় পৌষ-মাঘ মাসেই। উত্তুরে বাতাসের শৈত্যপ্রবাহে জীবজগতে শুরু হয় থরথরি কম্পন। কথায় বলে– মাঘের শীতে বাঘ কাঁপে। ঝরা পাতার দীর্ঘশ্বাসে বিষণ্ন হয় পরিবেশ। শীত বার্ধক্যের জড়রূপ পরিগ্রহ করে। মানুষের কর্মজীবনে আনে শৈথিল্য ও জড়তা। শীত রুক্ষ কঠোর শ্রীহীন, কিন্তু নিঃস্ব নয়। কারণ, শীত সোনার ধানে আঙিনা ভরার ঋতু। কবি শীতের এ কর্মব্যস্ত রূপের বন্দনা গেয়ে বলেছেন–

পৌষ তাদের ডাক দিয়েছে,
আয়রে চলে, আয় আয় আয়।

শীতের আগমনে গ্রামবাংলা আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে। মাঠে মাঠে সোনালি ধান আর ক্ষেতে ক্ষেতে সবুজ শাকসবজি যেমন– লালশাক, পালংশাক, ঘৃতকাঞ্চন, ওলকপি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বিটকপি, মূলা, গাঁজর, টমেটোসহ নানারকম শাকসবজি আর ফল-ফলাদিতে গ্রামবাংলার প্রতিটি বাড়ি রমরম করে। খালবিলে কৈ, মাগুর, শৈল, টাকি, পাবদা, পুঁটিসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সমারোহ গ্রাম্য জনজীবনে এক স্বস্তির নিশ্বাস এনে দেয়। কৃষকের ঘরে ঘরে উঠোনে উঠোনে ধানে ভরে যায়। কৃষাণ-বধূরা সেই ধান রৌদে শুকিয়ে ঢেঁকি দিয়ে ধান ভানে। আতপ চাউল গুড়া করে। সেই চাউলের গুড়া দিয়ে নানান রকম পিঠা তৈরিতে বসে যায়। এসব পিঠার মধ্যে– তেলের পিঠা, চিতই পিঠা, ভাপা পিঠা অন্যতম। এসময় খেজুর গাছে গাছে খেজুর রসের ঠিলে নামিয়ে আনে গাছিরা। তখন গ্রামের ঘরে ঘরে খেজুর রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করে বউ-ঝিরা। খেজুর রস ও চালের গুড়া দিয়ে ঘরের মা-বোনেরা তৈরি করে নানারকম পিঠা, পায়েশ। শীতের সকালে মিষ্টি রোদে বসে পিঠা ও মচমচে মুড়ি খাওয়ার মজাই আলাদা। এ স্মৃতিকে স্মরণ করে কবি সুফিয়া কামাল বলেছেন–

পৌষ পার্বণে পিঠা খেতে বসে
খুশিতে বিষম খেয়ে
আরও উল্লাস বাড়িয়াছে মনে
মায়ের বকনি খেয়ে।

শীতের সকাল অন্যান্য সকাল থেকে একটু পৃথক, একটু বৈচিত্র্যময়। শীতের সকাল আসে কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে। শীতের সময় গাছের পাতা ঝরে যায়। ঘন কুয়াশার কারণে সূর্যের দেখা পাওয়া যায় না। যত দূর চোখ যায় কেবল কুয়াশা ঘেরা অন্ধকার প্রকৃতি। এ সময় লেপ-কাঁথা দিয়ে বিছানা ছেড়ে কেউ বাইরে যেতে চায় না। কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে সূর্য আলো ছড়াতে থাকে। হিমশীতল হাওয়া বইতে থাকে ধীরে ধীরে। গাছপালা থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ে শিশির। সূর্যের উত্তাপ না ছড়ানো পর্যন্ত কেউ ঘর ছেড়ে বাইরে বের হতে চায় না। সেসময় সবার গায়ে শীতের পোশাক জড়ানো থাকে। বিভিন্ন জায়গায় মানুষ আগুন জ্বালিয়ে আগুন পোহাতে দেখা যায়। সূর্যের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়লে কুয়াশা কেটে যায়। গ্রামের প্রকৃতির চারদিক থেকে ভেসে আসে সরষে ফুলের মধুর সৌরভ। ঘাসের ডগায়, পাতার কিনারায় রাতের শিশিরকণা সূর্যালোকে ঝলমল করে হাসতে থাকে। শীতকালে নদীনালা, খালবিল, পুকুর, ডোবা সব শুকিয়ে যায়। কৃষকেরা সকাল হতেই গরু আর লাঙল নিয়ে বের হয়ে যায়। তারা ক্ষেতে মুগ, মসুর, ছোলা, অড়হর, সরিষার বীজ বোনে। কিছুদিন পর যখন সেগুলোর কচি পাতা মাথা উঁচু করে তখন চারদিকে বিরাজ করে এক অপূর্ব স্নিগ্ধতা, কোমলতা। এসময় কৃষক শীত কাটানোর জন্য চড়া গলায় গান ধরে–

ওকি গাড়িয়াল ভাই
কত রব আমি পন্থের পানে চাইয়া রে...।

শীতকালে কৃষকের ঘরের চালায় পুঁইশাক দেখতে পাওয়া যায়। কথায় বলে– 'শাকের রাজা পুঁই আর মাছের রাজা রুই' খেতে ভারি মজা। এসময় পুঁইশাকের গাছে ফল আসে। পুঁইশাকের এই ফল অপরিপক্ক অবস্থায় দেখতে খুব সুন্দর দেখায়। শীতকালে গ্রামের প্রায়ই বাড়িতে লাউ গাছ দেখতে পাওয়া যায়। মাচা তৈরি করে

লাউ গাছ তার ওপর বিছিয়ে দিয়ে দেয়। এই লাউ গাছ লাউ ধরার পরে মাচার ফাঁক দিয়ে যখন নীচে ঝুলে পড়ে তখন তা দেখতে চমৎকার লাগে। এভাবে শহরের অনেক বাড়িতেও আজকাল লাউ গাছ লাগাতে দেখা যায়। আর লকলকে এই লাউয়ের ডগা দেখলেই মনে পড়ে যায়–

সাধের লাউ বানাইছে মোরে বৈরাগী
লাউয়ের আগা খাইলাম-গোড়াও খাইলাম
লাউ দিয়ে বানাইলাম ডুগডুগি।

লাউয়ের খোলের একতারা এখন বাঙালি সংস্কৃতির এক অংশ হিসেবে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে চলেছে।

শীতকালে নদীতে জেলেদের মাছ ধরার দৃশ্য উল্লেখ করার মতো। নদীতে জোয়ার আসার আগে ছেলেরা নদীর চরে কিছু দূর অন্তর অন্তর লগি পুঁতে বড়ো লম্বা পাটা জাল টানিয়ে জালের নিচের প্রান্ত মাটিতে পুঁতে উপরের প্রান্ত লগির উপরের দিকে লম্বা রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। নদীতে জোয়ার পূর্ণ হলে রশি টেনে জালের উপরের প্রান্ত উঁচু করে লগির উঁচু মাথার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হয়। ভাটা হয়ে যখন নদীর চর জেগে যায়, তখন দেখা যায় নানারকম সামুদ্রিক মাছ জালের নিচের প্রান্তে আটকে আছে। জেলেরা এসব মাছ ঝুড়ি এবং ডালা ভরে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে।

শীতকালে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্থানে ভ্রমণে বের হয়। এ সময় ধর্মীয় পুন্যার্থীরাও বিভিন্ন তীর্থস্থান ঘুরতে যান। এসময় মুসলিম ধর্মের মানুষেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে তাবলীগ করতে বাহির হন। শীতকাল ভ্রমণের জন্য বিশেষ আরামদায়ক একটি ঋতু। কারণ এসময় গরম কাপড় পরিধান করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহুদূরের পথ ঘোরাফেরায় তেমন কোনো কষ্ট হয় না।

শীতের সময় শহর এবং গ্রামে সর্বত্র ছেলেমেয়ে এমনি বড়োদেরও বনভোজন করতে দেখা যায়। শীতে শহরে বনভোজন করাটা এখন একটা উৎসবে পরিণত হয়েছে। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ এমনকি বিভিন্ন সংগঠনের মানুষজনদের কাছে শীতের বনভোজন করাটা একটা কালচারে পরিণত হয়েছে। তারা একসঙ্গে মিলিত হয়ে শীতের সকালে বা সন্ধ্যায় নানারকম খাবারের আয়োজনের মধ্য দিয়ে বনভোজনের উৎসবে মেতে উঠে। এসময় শহরের বিভিন্ন পিকনিক স্পট বনভোজনের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়।

গ্রামবাংলায় শীতের সন্ধ্যায় যাত্রা, জারি গান, পালা গান, গাজীর গান, মুর্শিদি এবং মারফতি গানের আয়োজন করা হয়। সারারাত্রি ধরে মানুষ এসব গান খুব মনোযোগ হকারে শোনে। এসকল গান লোকায়ত বাংলার এক চিরায়ত ঐতিহ্য বহন করে।

শীতকালে সারা শহরজুড়ে নানা জায়গায় বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন হয়ে থাকে যেমন– পিঠা-পায়েশের মেলা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শীত ঋতু একদিকে আরামদায়ক অন্যদিকে কষ্টের। যাদের গরম কাপড়ের অভাব নেই শীত নিবারণের বস্ত্র আছে, শীত নিরোধক ঘরবাড়ি আছে তাদের কাছে শীতকাল অত্যন্ত আরামদায়ক। অন্যদিকে যাদের গরম কাপড় নেই, পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান নেই, বাসস্থান নেই-আশ্রয় নেই তাদের কাছে শীত ঋতু অতীব কষ্টদায়ক। তারা কেউবা ফুটপাতে, কেউবা রেললাইনের প্লাটফর্মে হাড় কাঁপানো কনকনে শীতে জবুথবু হয়ে রাত্রিযাপন করে। তাই শীতকাল তাদের কাছে সৌন্দর্যের উৎস নয় বরং শীত বিদায়ের অপেক্ষায় থাকে তারা। এ শ্রেণির মানুষের দুঃখ অনুভব করে কবি শামসুল রাহমান বলেছেন–

শীত সকালে লোকটা কাঁপে
কাঁদে সবার পা ধরে।
একটা শুধু ছিল জামা
তা-ও ছিঁড়েছে ভাদরে।
হি-হি শীতে থাকে পড়ে
ডাকে না কেউ আদরে।

সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আলো-আঁধার– এসব নিয়েই আমাদের জীবন। আমাদের এগিয়ে চলা। তাই শীত যেমন কষ্টের তেমনি অনেক কিছু পাওয়ারও ঋতু। আমরা যদি গরিব-দুঃখিদের প্রতি সাহায্য ও মমতার হাত বাড়িয়ে দিই, তাহলে তারাও শীতের কষ্ট কাটিয়ে উঠতে পারবে। আমরা সবাই তখন শীতের আনন্দগুলো ভাগ করে দিতে পারব।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

চালু হয়েছে ভূমি সেবা হটলাইন ১৬১২২

ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি সেবা প্রদানে হয়রানি ও দুর্নীতি বন্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। এলক্ষ্যে চালু করা হয়েছে 'ভূমি সেবা হটলাইন ১৬১২২'। ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর ৯০ দিনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে এটি চালু করা হয়েছে। স্বচ্ছতার সঙ্গে ভূমি সেবা নিশ্চিত করতে এর পাশাপাশি আরও কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে ভূমি মন্ত্রণালয়। হটলাইন চালু ছাড়াও ৯০ দিনের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে– সারা দেশে ই নামজারি কার্যক্রম চালু, রিভিশনাল সার্ভে খতিয়ান অনলাইনে স্থাপন, ভূমি সেবা সপ্তাহ চালু, মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা/দপ্তরের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব নেওয়া। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ভূমি কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে একাধিক কর্মশালা, বিভিন্ন তথ্য সংবলিত বুকলেট বা ব্রুসিয়ার, প্রামাণ্যচিত্র ও নোটিশ তৈরির কাজও করা হচ্ছে।

ভূমি সেবা হটলাইন ১৬১২২ ভূমির দুর্নীতি বন্ধে একটি কার্যকর পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছেন সংশ্লিষ্টরা। ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে এ নম্বর দেশের সব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এই হটলাইন চালু হওয়ায় ভূমি সেবার ক্ষেত্রে অনিয়ম, ঘুষ, দুর্নীতি হয়রানি ও ভোগান্তির কথা ভুক্তভোগী তাৎক্ষণিক জানাতে পারবেন। সারা দেশের যে-কোনো জায়গা থেকে যে কেউ মোবাইল ও ল্যান্ড ফোনে এ নাম্বারে কল করতে পারবেন। ভূমিমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। হটলাইনে কল করলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা/দপ্তরের সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা দেওয়া হবে। এছাড়া ভূমি অধিগ্রহণ, হুকুম, দখল, নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর, কৃষি/অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত, অর্পিত সম্পত্তি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, রেকর্ড রুম, জলমহাল, বালুমহাল, চা বাগান, হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা ও ভূমি জরিপ বিষয়ে সেব দেওয়া হবে। হটলাইন চালুর মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণকে ভূমি সংক্রান্ত সব সেবা প্রদান ও মানুষের দুর্ভোগ কমানো। ১০ই অক্টোবর ভূমি সেবা হটলাইনের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করা হয়। সচিবালয়ের চার নম্বর ভবনের ছয় তলার ৬৩৬ নম্বর কক্ষে এ কল সেন্টার চালু করা হয়েছে।

জাহান ফেরদৌস

প্রতিবন্ধী খাতে সরকারের সাফল্য

আবিদ লিপু

৩রা ডিসেম্বর 'বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস'। প্রতিবছরের মতো এ বছরও সারা দেশে আড়ম্বর পূর্ণভাবে ২৮তম আন্তর্জাতিক ও ২১তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ১৯৯২ সাল থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। শারীরিকভাবে অসম্পূর্ণ মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহযোগিতা জানানোর উদ্দেশ্যেই এই দিবসটির সূচনা হয়। এবছর জাতিসংঘ কর্তৃক এই দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'The future is Accessible'। যার ভিত্তিতে এই দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে– 'অভিগম্য আগামীর পথে'।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই ডিসেম্বর ২০১৯ মিরপুরে জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স 'সুবর্ণ ভবন'-এর উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

সমাজের অনগ্রসর প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে অবহেলিত রেখে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই এই অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ণ, বাস্তবায়ন ও যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারলে এই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সমাজ ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। এলক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ যে সকল দফতর সংস্থার মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে 'জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' তাদের মধ্যে অন্যতম। অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক ও রেফারেল সেবা প্রদান এবং সহায়ক উপকরণ প্রদানের জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অধীনে ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু রয়েছে। এ সমস্ত সেবা কেন্দ্রের আওতায় একটি করে অটিজম ও এনডিডি কর্নার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে রয়েছে এমন ব্যক্তির প্রশিক্ষণ ও কাউন্সেলিং ইত্যাদি কার্যক্রম চালু আছে। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে এ পর্যন্ত নিবন্ধিত সেবা গ্রহীতার মোট সংখ্যা ৪,৭৪,৩৭০ জন এবং সো সংখ্যা ৬২,১৩,০৬৮ জন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের থেরাপিউটিক সেবা প্রদান ছাড়াও সেবা কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিকট কৃত্রিম অঙ্গ, হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্রাচ ইত্যাদি সহায়ক উপকরণ এবং আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিনসহ মোট ৪৫,৫৩৪টি উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ৩২টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ ওয়ানস্টপ থেরাপি সার্ভিস সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বিনামূল্যে নিবন্ধিত থেরাপিউটিক সেবা গ্রহিতার সংখ্যা ৩,১৯,৮৫৩ জন এবং প্রদত্ত সেবা সংখ্যা ৭,১৫,৯২৩ জন। এছাড়া জুন ২০১৭ থেকে বাংলাদেশ সচিবালয়ে একটি মোবাইল থেরাপি ভ্যান ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ক্যাম্পের মাধ্যমে সপ্তাহে ৩দিন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিনামূল্যে থেরাপিউটিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত নিবন্ধিত সেবা গ্রহীতা ১৩২৩ জন এবং প্রদত্ত সেবা সংখ্যা ১৯,৩৬৭ জন। এছাড়া অটিজম রিসোর্স সেন্টার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়নে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠান/ সংস্থাকে অনুদান বিতরণ, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার (এনডিডি) সম্পন্ন ব্যক্তিদের উন্নয়নে স্কুল পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

২০১১ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পোশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা শহরে লালবাগ,উত্তরা ও যাত্রাবাড়ি এবং রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর, সিলেট– এই ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি এবং গাইবান্ধা জেলায় ১টি সহ সর্বমোট ১১টি স্কুল চালু করা হয়েছে। এসব স্কুলে মোট ১৪৭ জন অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুর লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের পিতা-মাতাদের বিভিন্ন প্রকার কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৭,১৪৭ জন অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ম্যানুয়েল ও থেরাপি সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সুরক্ষায় ও অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এবং ট্রাস্ট আইন ২০১৩ প্রণয়ন করেছে। এই নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মে নিয়োগসহ সকল নাগরিক অধিকার ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ৯ জন সেরিব্রাল চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রতিবন্ধী প্রত্যাশী ও কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী মানুষের আসন বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল চালু উপকারভোগীর সংখ্যা ২৮০ জন। ফাউন্ডেশনের কল্যাণ তহবিল থেকে অধিকার বাস্তবায়নের জন্য 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন দুটি সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অবাধ চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রজাতন্ত্রে নিশ্চিত করেছে। পালসি (সিপি) এতিম শিশুদের লালনপালন, শিশু নিবাস পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া চাকরি ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাস ৩২টি করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কর্মরত বেসরকারি সংস্থার মাঝে প্রায় ১৪ কোটি টাকা ঋণ ও অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

পা দিয়ে লিখেই এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে তামান্না

আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে ফাউন্ডেশন চত্বরে ২০১৪ সাল থেকে প্রতিবছর ৫ দিন মেয়াদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা তৈরিকৃত বিভিন্ন হস্তশিল্প, নকশিকাঁথা, তৈরি পোশাক, শাড়ি, খেলনাসামগ্রী, প্লাস্টিক দ্রব্যাদিসহ বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী দ্রব্যসামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়। প্রতিবছর মেলায় ৩৫-৪০টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে থাকে এবং ১০-১৫ লক্ষ টাকার পণ্যসামগ্রী বিক্রি হয়।

অটিজম অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থার পথ সুগম করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০৯ সালে 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা' প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিমালার আওতায় সুইড বাংলাদেশের ৫০টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল, বিপিএফ-এর ৭টি ইনক্লুসিভ স্কুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত প্রয়াস-এর ১টি ও অন্যান্য ৪টি সহ সর্বমোট ৬২টি বিশেষ স্কুলের শিক্ষক/ কর্মচারীর ১০০% বেতন-ভাতা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পরিশোধ করা হচ্ছে। উক্ত স্কুলসমূহে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৯২০০ জন। উক্ত নীতিমালাটি যুগোপযোগী সংশোধন ও পরিমার্জন পূর্বক প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ১০ই অক্টোবর ২০১৯ বাংলাদেশে গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিবছর ১৫ই অক্টোবর বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস সরকারিভাবে যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে শোভাযাত্রা, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মেধাবী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের সম্মাননা ও অনুদান, সাদাছড়ি (স্মার্ট) এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে সাদাছড়ি বিতরণ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২০১৬ ও ২০১৮ সালে প্রতিবন্ধী কর্মসংস্থান মেলা আয়োজন করা হয়। মেলায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুর-১৪ এ জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্সে অটিজমসহ অন্যান্য বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ডরমেটরি, অডিটরিয়াম, ওপিডি, ফিজিওথেরাপি সেন্টার, শেল্টারহোম, ডে-কেয়ার সেন্টার, বিশেষ স্কুল ইত্যাদির সংস্থান রাখা হয়েছে। 'জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্সে' নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প ৩০শে জুন ২০১৮ সালে শেষ হয়েছে।

দেশে একটি আর্ন্তজাতিক প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য সাভার উপজেলাধীন বারইগ্রাম ও দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর মৌজার ১২.০১ একর জমি ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ১২ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ৪৪৯ কোটি ৯৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকার প্রাক্কলন সম্পন্ন ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভাতে পুনর্গঠিত ডিপিপি সংশোধনের বিষয়ে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেনিটেশন, সহজ গমনাগমন, অবাধ তথ্য অধিকার, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সক্ষমতার ভিত্তিতে সকল প্রতিবন্ধী মানুষের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশেরমাধ্যমে তাদের সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, সমাজসেবা অধিদফতর ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

সরকারের তিনটি হেল্পলাইন

সরকারি তিনটি হেল্পলাইন হলো– ১০৯,৯৯৯,৩৩৩। যা থেকে পৃথক পৃথক সেবা পাওয়া যাবে। সেবাগ্রহীতারা নির্দিষ্টভাবে কোন নম্বরে কোন সেবা মিলবে, জানেন না বলে সেবা পেতে বিড়ম্বনায় পড়েন। আবার নতুনভাবে সংশ্লিষ্ট হেল্পলাইনে ফোন দিতে হয় বলে সেবা পেতে দেরি হয়। তাতে অনেক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যায়, সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক আবুল হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, এ তিনটি হেল্পলাইনের যে-কোনোটিতে ফোন দিলে সেবাদাতারা সমস্যার ধরন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হেল্পলাইনে কলটি পাঠিয়ে দেবেন, নতুন করে আর সেবাগ্রহীতাকে ফোন করার ঝামেলায় যেতে হবে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। ফলে দ্রুত ও সহজে সেবা পাওয়া যাবে।

ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯-এ ফোন করে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু সব ধরনের সেবা ও সহায়তা পাওয়া যায়। সপ্তাহের সাতদিন ২৪ ঘণ্টা নম্বরটি খোলা থাকে। বিনামূল্যে এ নম্বরে মোবাইলে ও টি অ্যান্ড টি থেকে ফোন করা যায়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায়, ২০১২ সালের ১৯শে জুন থেকে চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত এই হেল্পলাইনে ২৮ লাখ ৫১ হাজার ২১১টি ফোন এসেছে। এ হেল্পলাইন সেন্টার থেকে এখন পর্যন্ত সাড়ে তিন হাজারের বেশি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়েছে।

২০১৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ পুলিশের অধীন জাতীয় জরুরি সেবা সেন্টার (৯৯৯) চালু করা হয়। ৯৯৯-এ ফোন করে নাগরিকেরা জরুরি মুহূর্তে ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স সেবা নিতে পারে, সবসময় বিনামূল্যে ফোন করা যায়।

তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জাতীয় তথ্য বাতায়নের সব ওয়েবসাইটের তথ্য, সরকারি সেবা পাওয়ার পদ্ধতি, বিভিন্ন জেলা-উপজেলা সম্পর্কিত তথ্যসহ অভিযোগ দেওয়া যাবে।

আহমেদ রিয়া

নিবন্ধ

এইডস নির্মূলে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সম্পৃক্ততা

জেসিকা হোসেন

১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস। প্রতিবারের মতো এবারো বাংলাদেশে দিবসটি পালন করা হয়েছে। এবছর দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে– 'এইডস নির্মূলে প্রয়োজন: জনগণের অংশগ্রহণ'। ১৯৮৮ সাল থেকে এইডসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও জনচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বে এ দিবসটি পালন করে থাকে। পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভবের পর থেকেই শুরু হয়েছে বেঁচে থাকার সংগ্রাম। এ সংগ্রামে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং নানা রোগব্যাধি মোকাবিলা করতে হচ্ছে মানবসমাজকে। এইডস একটি ভয়ানক সংক্রামক রোগ। এইচআইভি নামক ভাইরাস রক্তে প্রবেশ করলে মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন অনেক রোগ একত্রে আক্রমণ করে ওই মানুষকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। এই ঘাতক ব্যাধি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সহজে ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে শতকরা সিংহভাগ নতুন সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে উন্নয়নশীল দেশে। এটি আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের মানুষের জন্য উদ্বেগজনক।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৮ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বে এইচআইভি আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ৩ কোটি ৭৯ লাখ। ২০০৮ সাল থেকে প্রতিদিন নতুনভাবে এক হাজারেরও বেশি শিশু এইচআইভিতে আক্রান্ত হচ্ছে। UNAIDS-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১১ হাজারের কিছু বেশি। এক সমীক্ষা অনুযায়ী, এইডস/এইচআইভিতে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১ হাজার ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। উল্লেখ্য, এইচআইভি জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করার পর এইডস রোগ দেখা যায়। এইচআইভির জীবাণু বহনকারী ব্যক্তির এইডস হতে ৮ মাস থেকে ১০ বছর সময় লাগে। এইচআইভি জীবাণু চার উপায়ে মানবদেহে প্রবেশ করে।

যেমন: ১. এইডস আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সংসর্গের মাধ্যমে, ২. এইডস আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির রক্ত বা রক্তজাত উপাদান সুস্থ ব্যক্তির দেহে পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে, ৩. এইচআইভি সংক্রমিত ইনজেকশনের সুঁচ, সিরিঞ্জ, দাঁতের চিকিৎসায় ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রোপচারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে, ৪. এইডস ভাইরাস আক্রান্ত মা থেকে গর্ভস্থ শিশুর দেহে এবং বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে। এইডসের চিকিৎসার কার্যকর ঔষধ এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তাই প্রতিরোধই প্রধান উপায়। উপরে উল্লেখিত চার বিষয়ে সচেতন থেকে এইডস প্রতিরোধ করা সম্ভব।

বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশে অদ্যাবধি এইচআইভি সংক্রমণের হার তুলনামূলকভাবে কম হলেও ভৌগোলিক অবস্থান, অসচেতনতা, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অনিয়ন্ত্রিত আচরণ, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণার জন্য এইডসের ঝুঁকি বিদ্যমান। তাই প্রতিকারের পাশাপাশি এইডস প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি, কুসংস্কার দূরীকরণ ও মানুষের আচরণ পরিবর্তনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক। মরণঘাতি এ রোগের কোনো প্রতিষেধক এখনো আবিষ্কার না হলেও বর্তমানে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। এইডসের প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং আমৃত্যু এ চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়। তাই এইডস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সহজলভ্য এবং মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে– এ প্রত্যাশা করি।

সরকার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০১২ সাল থেকে এইডস আক্রান্তদের বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান ও এইডস প্রতিরোধে সামাজিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে এইডস নির্মূল করতে হলে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সম্পৃক্ততা খুবই জরুরি। আমি এইডস ও নির্মূলে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং গণমাধ্যমসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

এই দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) এইচআইভি/এইডস বিষয়ক লক্ষ্য অর্থাৎ ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ থেকে এইডস রোগ নির্মূল করার জন্য জাতিসংঘের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা প্রতিটি এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছি। ফলে সম্পূর্ণ সরকারি ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে ১০টি সরকারি হাসপাতাল থেকে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিনামূল্যে এইডসের চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান করা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এটি আরো সম্প্রসারিত হবে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণের হার ০.০১% এর নীচে। এ হার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে এবং এইডস আক্রান্তদের প্রতি সামাজিক বৈষম্য রোধে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থাসমূহের কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। তিনি আরো বলেন, প্রচেষ্টায় রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হবে।

বর্তমান সময়ে দেশের তরুণ তথা যুবক শ্রেণি এইডস রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বেশি। নতুন সমাজ গড়ে তুলতে তারুণ্যের বিকল্প নেই। ঘাতকব্যাধি এইডস আমাদের তরুণ সমাজকে শেষ করে দিক, এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এইডস থেকে নিজেকে এবং সমাজ ও মানবসভ্যতাকেই টিকিয়ে রাখতে হলে এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে। এজন্য ব্যক্তি সচেতনতার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আমরা আমাদের আবাসভূমি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সব ধরনের রোগব্যাধি থেকে নিরাপদ রাখব, এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

লেখক: প্রাবন্ধিক

কালো মেয়ে

নাসিম সুলতানা

তিন ভাইবোনের মধ্যে আদুরী বড়ো। ছোটোবেলায় বাবা-মা আদর করে নাম রেখেছিল আদুরী। এইচএসসি পাস করার পর তার আর পড়ালেখা হলো না। কারণ তার বাবা তাকে আর পড়ালেখা করাবে না। কিন্তু মায়ের মত ছিল আদুরী যেন পড়ালেখা করে। কিন্তু না, তারা আদুরীর বিয়ে দেবার জন্য পাত্র দেখা শুরু করল। পাত্র তো মুখের কথা নয়, যে বাজার থেকে কিনে আনলাম। অনেকেই আদুরীকে দেখতে আসে। কিন্তু তারা কেউই আর এগোয়নি। কারণ আদুরী দেখতে কালো।

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় গায়ের রং ফর্সা হলো সুন্দরী হবার এক নম্বর যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হয়। দুই নম্বর যোগ্যতা হলো লেখাপড়া, তিন নম্বর যোগ্যতা হলো উচ্চতা। চার নম্বর যোগ্যতা হলো ঢাকায় বাড়িঘর আছে কিনা। পাঁচ নম্বর যোগ্যতা হলো যৌতুক কী কী দিবে।

ওই দিন আদুরী পাশের রুম থেকে বাবা-মা'র তর্ক শুনতে পায়। আর সে ভাবে কালো হয়ে জন্মানোও একটা পাপ। আজ লেখাপড়াটা যদি করতে পারত সে যে কালো এটা ভুলে যেত। কারণ তখন ব্যস্ততার মধ্যে আজেবাজে কথা চিন্তা করার সময়ই থাকত না। তবুও সে বসে থাকে না। পাশের বাড়ির রেণু আপার কাছে সেলাইয়ের কাটিং থেকে শুরু করে রান্নাবান্না অনেক কিছু শিখেছে। এছাড়া মায়ের কাজেও সে সাহায্য করে।

ও বাড়ির রেণু একদিন আদুরীর মাকে বলল– খালা গো, তুমি কোনো চিন্তা কইরো না। তোমার আদুরীর ভালো ছেলের সাথেই বিয়ে হইব। কী সুন্দর নাক চোখের গড়ন।

এভাবে অনেক পাত্র আদুরীকে দেখতে আসে। কিন্তু তারা পরে আর কোনো বার্তা পাঠায় না।

আদুরী শুধু ভাবে আর ভাবে। এভাবে আর কত দিন বিয়ের জন্য প্রতীক্ষা করবে। গ্রামে অনেকে তাকে অপয়া বলেও ডাকে।

আকাশে মেঘ হলে বৃষ্টি হয়। তারপর আবার সূর্য ওঠে এবং সব আলোকিত করে দেয় মেঘকে বলে এখন যা, তোর কাজ শেষ।

তেমনি মনে হয় আদুরীর জীবনে হঠাৎ করে আলোর ঝলকানি এল। টাঙ্গাইলের রসুলপুর গ্রামে তারা থাকে। ওদের গ্রামে একরাম চাচা ঢাকায় বড়ো চাকরি করেন। তিনি গ্রামে যে প্রাইমারি স্কুলটি আছে, তার গভর্নিং বডির মেম্বার। তিনি ওইদিন গ্রামের বাড়িতে এসে আদুরীদের বাড়িতে দেখা করতে আসলেন। আদুরীর মা সব কথাই একরাম সাহেবকে বললেন–

তিনি সব শুনে বললেন– বোন, তুমি চিন্তা করো না। আমি আপাতত এই স্কুলে ওকে একটা চাকরি দেবার ব্যবস্থা করছি।

তারপর গ্রামের স্কুলে আদুরীর চাকরিটা হয়ে গেল। দিন এভাবে যেতে থাকল। অনেকদিন পর আদুরীকে হাসতে দেখে বাবা-মা'ও খুব খুশি।

এর কিছুদিন পরের কথা। ও পাড়ার রুবিনার বিয়ে। রুবিনা আদুরীর ছোটোবেলার বান্ধবী। তাদেরই গ্রামে রহিমুদ্দীনের ছেলে সায়েমের সাথে তার বিয়ে। সায়েম ঢাকায় সরকারি চাকরি করে। রুবিনার গায়ের রং ফর্সা। তার মতোই এইচএসসি পাস। রুবিনাকে সাজানোর দায়িত্ব পড়েছে আদুরীর ওপর। তো ঐদিন আদুরী সকাল থেকেই ব্যস্ত।

রুবিনাকে সাজাতে সাজাতে আদুরী কিছুক্ষণের জন্য বেদনায় মলিন হয়ে যায়। তাকেও তো কত ছেলে দেখতে আসে। কিন্তু কালো দেখে সব ফিরে যায়। পরক্ষণেই আদুরী ভাবে ছি-ছি-কী ভাবছে?

রুবিনা তাকে মুখ ভার দেখলে কী মনে করবে। আদুরী হাসিহাসি মুখ করে রুবিনাকে সাজাতে লাগল।

রুবিনাও আদুরীকে বলল– আদুরী, আজকে তোকে খুব সুন্দর লাগছেরে।

আদুরী হেসে বলল– তাই বুঝি? তুই শ্বশুরবাড়ি চলে যাবি তো। তাই আমাকে খুশি করার জন্য একথা বলছিস, আমি যাতে তোর জন্য মন খারাপ না করি।

রুবিনা আদুরীকে জড়িয়ে ধরল। দুজনের চোখে অশ্রু বিন্দু গড়িয়ে পড়ল। আদুরী বলল– না, রুবিনা কোনো মন খারাপ না। তোর মেকআপ নষ্ট হয়ে যাবে না? বলে দুজনই হেসে ফেলল।

রুবিনাকে সাজানো হয়ে গেছে। অন্যদিকে বাবুর্চিদের রান্নাবান্নাও শেষ। যথাসময়ে বরপক্ষ চলে এসেছে।

বাড়ি ভরা লোকজন। বর ও বউ পাশাপাশি বসেছে। ওদের বিয়ে পড়ানোর পর খাওয়াদাওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বরের বন্ধু নাঈম বলল– সায়েম তোদের গ্রামটা তো খুব সুন্দর। হঠাৎ নাঈম খেয়াল করল আদুরী একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে শুনেছে যে আদুরী রুবিনা ভাবির বান্ধবী। মেয়েটা দেখতে একটু ময়লা, কিন্তু নাক-চোখের গড়ন খারাপ না।

এদিকে আদুরী খেয়াল করল তার দিকে লোকটি এভাবে তাকিয়ে কি দেখছে? সরে যাওয়ার আগেই নাঈম বলল, এই যে শুনুন– আপনার নাম কি?

আদুরী কেমন যেন লজ্জা পেল। বলল– আদুরী।

নাঈম বলল– বাহ্ খুব সুন্দর নাম তো।

আদুরী বলল– বাবা-মা আদর করে নাম রেখেছিল আদুরী। কিন্তু এই নামটা রাখা ঠিক হয়নি?

নাঈম কৌতূহল হয়ে জিজ্ঞেস করল কেন কেন? উত্তর না দিয়ে মুখটা ভার করে আদুরী অন্যদিকে চলে গেল।

আদুরী বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখে বরকনে এবং আত্মীয়স্বজনরা চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারণ বৈশাখ মাসের দিন তো, বিকেল হলেই ঝড়বৃষ্টি শুরু হতে পারে। তাড়াতাড়ি ওদের ঢাকা পৌঁছাতে হবে।

তারপর তারা ঢাকা চলে এল, কিন্তু নাঈম আদুরীকে ভুলে না। একটু কালো এই যা। নাক চোখের গড়ন ভালো, আবার উচ্চতাও ভালো। লেখাপড়ায় মনে হয় রুবিনা ভাবির মতোই হবে।

নাঈম অনেক ভেবেচিন্তে বাবা-মা'কে আদুরীর কথাটা জানালো। উত্তরে বাবা-মা বললেন, সংসার করবা তুমি। ভালো যদি মনে কর তো চল আমরা দেখতে যাই।

ব্যাস, নাঈম বাবা-মা'র সম্মতির কথাটা সায়েমকে সব জানালো।

সায়েম সব শুনে বলল– আর দেরি কেন?

শুক্র-শনি অফিস বন্ধ। চল্ আমরা কালকেই রওনা দি।

সায়েম ও নাঈম একই অফিসে চাকরি করে। সেই সুবাদে তাদের বন্ধুত্বও ভালো। রুবিনাও মনে মনে খুশি। আদুরী তার ছোটোবেলার বান্ধবী। একই গাঁয়ে বাড়ি। ওর যদি নাঈমের সাথে বিয়েটা হয় তো ভালোই হবে। আদুরী সুখী হবে। আদুরীও তার মতো ঢাকায় থাকতে পারবে।

পরদিন তারা ভোরবেলায় বের হয়ে রসুলপুর গ্রামে পৌঁছে গেল। আদুরীদের বাড়িতেই খাওয়াদাওয়ার পর্ব সেরে রুবিনা আদুরীকে নিয়ে তাদের বাগানে গেল। সেখানে পুকুর ঘাটে বসে দুজনে কথা বলার সুযোগ পেল।

আদুরী কোনো রকম ভণিতা না করে বলল– আপনি যে আমাকে বিয়ে করার জন্য দেখতে এসেছেন– ভালো কথা। আমার গায়ের রং অনেক কালো। অনেক পাত্র পক্ষ আমাকে দেখতে এসেছে। কিন্তু এই কালো রঙের কারণে কেউ আমাকে পছন্দ করে নাই। তবে আপনি কি জন্য আমাকে পছন্দ করছেন, আবার বিয়ে করার পর বলবেন– যা, তোর বাপের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের (টাকা) যৌতুক এনে দে। তা না হলে তোকে ছাড়ান দেব অথবা মারব।

নাঈম আদুরীর কথা শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

নাঈম বলল– তুমি অনেক সুন্দর করে সত্যি কথাগুলো এমনভাবে বল যে খুব ভালো লাগে। আর যারা সত্যি কথা বলে তাদের মনটাও সুন্দর হয়। গায়ের রঙ আমার কাছে কোনো বিষয় না। তাইতো কবির কথায় বলতে হয়–

কালো সে যে যতই কালো হোক

দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ

আমি মানুষের মনের দাম দেই, বুজেছ। আর তাছাড়া আমারও একটা খুঁত আছে। বলে নাঈম তার মাথার টুপিটা খুলে দেখালো।

আদুরী তাকিয়ে দেখে-নাঈমের মাথায় সামনের দিকে চুল নেই। সে ফিক করে হেসে দিল। হাসতে হাসতে বলল– এটা কোনো ব্যাপার নয়। কারণ আমিও বাহ্যিক চাকচিক্যের চেয়ে মনকেই প্রাধান্য দেই।

তারপর তারা দুজনে দুজনের কথায় হাসতে থাকে এবং পরের সপ্তাহেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়।

শুরু হলো বিবাহিত জীবন। কয়েক বছর পরের কথা। একছেলে একমেয়ে নিয়ে তারা এখন সুখী পরিবার। কালো কিংবা মাথায় টাক– তাদের সংসার জীবনে কোনো রকম বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি।

———— • ————

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৫ই নভেম্বর ২০১৯ ঢাকা সেনানিবাসে বঙ্গবন্ধু ঘাঁটিতে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ১, ৩, ৫, ৮, ৯ ও ৭১ নং স্কোয়াড্রনকে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান ও সালাম গ্রহণ করেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে দক্ষতা অর্জন করতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর (বিএএফ) মর্যাদা সমুন্নত রাখতে এই বাহিনীর সদস্যদের দক্ষ ও আদর্শবান হওয়ার আহ্বান জানান। ৫ই নভেম্বর ২০১৯ ঢাকা সেনানিবাসস্থ বঙ্গবন্ধু ঘাঁটিতে বিএএফ'র ১, ৩, ৫, ৮, ৯ ও ৭১ নম্বর স্কোয়াড্রনকে ন্যাশনাল স্টান্ডার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। এসময় সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতি বিএএফ'র উদ্দেশে বলেন, আপনাদের জন্য পেশাগত দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং একইসঙ্গে বাহিনীর সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে। সুতরাং আপনাকে আরো দক্ষ ও আদর্শ বিমানবাহিনীর সদস্য হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, বিএএফ'র অর্জন নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এই বাহিনীর সদস্যদের আধুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং কঠোর পরিশ্রম করার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়া আশা রাখি, ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির উন্নয়ন কার্যক্রমে বিমানবাহিনীর জওয়ানরা আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতেন মওলানা ভাসানী

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন। ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতেন মওলানা ভাসানী। ১৭ই নভেম্বর ২০১৯ মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৩তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি একথা বলেন। বাণীতে তিনি উল্লেখ করেন, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে এক অবিস্মরণীয় নাম। গ্রামভিত্তিক এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর রাজনীতি। তাঁর নেতৃত্বের ভিত্তি ছিল সমাজে খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ, কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ জনগণ। কৃষক-শ্রমিক ও সাধারণ জনগণের অধিকার এবং স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

সশস্ত্রবাহিনী দিবসে শিখা অনির্বাণে রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধা নিবেদন

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২১শে নভেম্বর ২০১৯ জাতীয় সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে শিখা অনির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারকারী সেনাবাহিনীর শহিদ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে ২১শে নভেম্বর একটি স্মরণীয় দিন। মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন ১৯৭১ সালের এই দিনে তিন বাহিনী সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করে। তাদের সম্মিলিত আক্রমণে হানাদারবাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে যা আমাদের বিজয় অর্জন ত্বরান্বিত করে। মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্রবাহিনীর অবদান ও বীরত্বগাথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, শিক্ষার্থীদের শুধু পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগতের জ্ঞানভাণ্ডার থেকেও জ্ঞান আহরণ করতে হবে। পাশাপাশি তাদেরকে বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কেও জানতে হবে। নিজেদের কর্মী ও জ্ঞানী করে তোলাই শিক্ষার্থীদের প্রধান লক্ষ্য। ২৩শে নভেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়ামে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও রাষ্ট্রপতি ১৩তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের বক্তব্যে একথা বলেন। এসময় রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, উচ্চশিক্ষা যাতে কোনোক্রমেই সনদসর্বস্ব না হয়। বাংলাদেশের জন্য অন্যতম বড়ো একটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করা। জাতির উন্নয়ন, উন্নত সমাজ গঠন ও বিশ্বমানের গ্র্যাজুয়েট তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুণগত মান, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা জরুরি।

২১শে নভেম্বর সশস্ত্রবাহিনী দিবস ২০১৯ উপলক্ষে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ-এর সঙ্গে তিন বাহিনীর প্রধানগণ সাক্ষাৎ করেন–পিআইডি

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

ঢাকা গ্লোবাল ডায়ালগ ২০১৯-এর উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই নভেম্বর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ঢাকা গ্লোবাল ডায়ালগ ২০১৯-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে থাকা মিয়ানমারের লাখ লাখ রোহিঙ্গা শুধু বাংলাদেশে নয়, গোটা অঞ্চলের হুমকিস্বরূপ বলে উল্লেখ করেন। তিনি দ্রুত এ সংকট সমাধানে বিশ্ব

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই নভেম্বর ২০১৯ ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে 'ঢাকা গ্লোবাল ডায়ালগ ২০১৯'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

সম্প্রদায়কে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি এই অঞ্চলের মানুষগুলোর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি, অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। সমুদ্র তীরবর্তী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমুদ্রের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও এর মাধ্যমে 'সুনীল অর্থনীতি'র টেকসই উন্নয়নের জন্য সমুদ্র তীরবর্তী দেশগুলোর মধ্যে সহায়তাপূর্ণ, সৌহার্দ্যপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ ও সমতাপূর্ণ সম্পর্ক অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর এলাকায় জলদস্যুতা, সশস্ত্র ডাকাতি, উপকূলবর্তী ও সামুদ্রিক এলাকায় সন্ত্রাসী আক্রমণ, মানব-মাদক ও অস্ত্র পাচারের মতো অপ্রথাগত নিরাপত্তা ঝুঁকি বিদ্যমান। এসব নিরাপত্তা ঝুঁকি নিরসনে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্ব জোরদার করতে দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।

উন্নয়ন মেলার উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই নভেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পল্লি কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'উন্নয়ন মেলা ২০১৯'-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্ষুদ্র ঋণে দারিদ্র্য বিমোচন হয় না। দারিদ্র্য লালনপালন হয়। মানুষকে কীভাবে সমবায়ের মাধ্যমে একত্রিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করে তাদেরকে কীভাবে দারিদ্র্যসীমার থেকে বের করে আনা যায় তার পরিকল্পনা জাতির পিতাই নিয়েছিলেন বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। পরে কৃষকদের কল্যাণ ও দারিদ্র্য নিরসন এবং কৃষির উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য সাবেক কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীকে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী।

সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ই নভেম্বর দুবাই এয়ার শোসহ আরো কয়েকটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে চারদিনের সরকারি সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাত যান। ১৭ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ও সফল এয়ার শো এবং মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও আফ্রিকার বৃহত্তম এয়ারোস্পেস ইভেন্ট দুবাই এয়ার কোর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। পরে তিনি দুবাই ওয়ার্ল্ড সেন্টারে এয়ার ডিসপ্লে উপভোগ করেন। এয়ার শো'র মাঝে আবুধাবির যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হোটেল সাংরি-লাতে বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত সংবর্ধনা ও নৈশভোজেও অংশগ্রহণ করেন। এসময় তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র বিশেষ করে তৈরি পোশাক, তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে আরব আমিরাতের উদ্যোক্তাদের আরো বড়ো আকারে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, তাঁর সরকার অর্থনৈতিক অঞ্চলে, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে এবং হাইটেক পার্কে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) বিনিয়োগকারীদের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস সুবিধা এবং একশর অধিক অবকাঠামোসহ নানা প্রয়োজনীয় সুবিধাদি প্রদান করছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ সব থেকে সহনীয় বিনিয়োগ নীতি বিদ্যমান। সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী ১৯শে নভেম্বর দেশে ফেরেন।

সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সশস্ত্রবাহিনীকে কাজ করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে নভেম্বর বিকেলে ঢাকা সেনানিবাসের সেনাকুঞ্জে সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সেনা সদস্যদের কাজের প্রশংসা করেন এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকায়নে তাঁর সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি এসময় সশস্ত্রবাহিনীকে সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য সুন্দর ও শান্তির একটি দেশ রেখে যেতে চাই। এলক্ষ্যে সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

একনেকে ৬ প্রকল্পের অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে নভেম্বর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির

(একনেক) সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় ৭ হাজার ৩১২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা ব্যয়ে মোট ৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হচ্ছে– পলবাড়ি-দড়াটানা-মনিহার-মুড়ালী জাতীয় মহাসড়কে মনিহার থেকে মুড়ালী পর্যন্ত ৪ লেনে উন্নীতকরণ, বগুড়া-সারিয়াকান্দি জেলার মহাসড়ক উন্নয়ন ও বাঙালি নদীর ওপর আড়িয়ারঘাট সেতু নির্মাণ, মাগুরা-নড়াইল আঞ্চলিক মহাসড়কের বাক সরলীকরণসহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততা উন্নীতকরণ, ফেনী (মাস্টারপাড়া) আলোকদিয়া-ভালুকিয়া-লস্করহাট-ছাগলনাইয়া জেলা মহাসড়কটি যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, নাটোর রোড থেকে রাজশাহী বাইপাস পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং ঢাকা ও পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে সঞ্চালন ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে ঢাকা ও পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড সঞ্চালন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ প্রকল্প।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী: বিশেষ প্রতিবেদন

আলোচনা হওয়া উচিত মুক্তিযুদ্ধ, দেশ, সমাজ নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের নিয়ে

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, মুক্তিযুদ্ধ, দেশ, সমাজ নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। কিন্তু, পরিতাপের বিষয়, আমরা ধীরে ধীরে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছি, যন্ত্রের সাথে কাজ করতে করতে যন্ত্রের মতোই অনুভূতিহীন হয়ে পড়ছি আমরা। এ কারণে, যারা দেশ, সমাজ নিয়ে কাজ করেন, শিল্প-সাহিত্য-মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে চর্চা করেন, তাদের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। ২রা নভেম্বর রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরে কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে স্বাধীনতা ফাউন্ডেশন আয়োজিত জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম-এর জীবন ও কর্মভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

ড. রফিকুল ইসলামকে একজন জীবন্ত ইতিহাস বর্ণনা করে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, সাধারণত সংবর্ধনার মাধ্যমে গুণীজনদের সম্মানিত করা হয়, কিন্তু আজ ড. রফিককে সংবর্ধনা দিয়ে স্বাধীনতা ফাউন্ডেশনই সম্মানিত হয়েছে। বাহান্ন'র ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া স্বল্পভাষী প্রাজ্ঞজন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শিক্ষক ড. রফিকুল ইসলাম আমাদের সামনে এক দেশপ্রেম ও কর্মবীরত্বের অনন্য উদাহরণ। তাঁর কাছ থেকে আমাদের শেখার কোনো শেষ নেই। প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ড. রফিকুল ইসলামকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির দায়িত্ব দিয়েছেন।

ড. রফিকুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতার সাহচর্য, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, শিক্ষকতা জীবন ও সমসাময়িক দিনপঞ্জি বর্ণনা করে তাঁকে সম্মাননা দেওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ ও শুভকামনা জানান।

অস্থিরতা ছড়ানোর দায় রয়েছে সেবাপ্রদানকারী সংস্থারও

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অস্থিরতা ছড়ানোর দায় সার্ভিস প্রোভাইডার বা সেবাপ্রদানকারী সংস্থা এড়াতে পারে না। ২৪শে নভেম্বর ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমি'র চিত্রশালা মিলনায়তনে 'উগ্রবাদ ও সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে করণীয়' সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ফেসবুক, ইউটিউবসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দায় অস্বীকার করার উপায় নেই। এ বিষয়টি এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। ইউরোপ-আমেরিকার মানুষ মনে করে অনেকক্ষেত্রেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সমাজে অস্থিরতা ছড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমি এ বিষয়ে কয়েকটি দেশের মতামত নিয়েছি। তারা এই ধরনের অপব্যবহারের জন্য সার্ভিস প্রোভাইডার বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন করেছে। আমরাও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিচ্ছি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একাউন্ট খুলতে জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহারের বিষয় নিয়েও আমরা আলোচনা করছি। এছাড়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনুমতিহীন বিজ্ঞাপন নিয়ে সার্ভিস প্রোভাইডারেরা ব্যাপক অর্থ এদেশ থেকে নিয়ে যাচ্ছে। সেটিও নিয়মের মধ্যে আসা প্রয়োজন।

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ২রা নভেম্বর ২০১৯ ঢাকায় জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলামের জীবন ও কর্মভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন–পিআইডি

তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, সংস্কৃতিচর্চা উগ্রবাদ-জঙ্গিবাদ রোধে অত্যন্ত কার্যকর। একারণে সংস্কৃতি চর্চার ব্যাপক প্রসার একান্ত প্রয়োজন। সরকার দেশীয় সংস্কৃতি চর্চার প্রসারে আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে। বিদেশি সিরিয়াল প্রচারের জন্য আমরা যে কমিটি করে দিচ্ছি, তার অনুমতি নিতে হবে। আর আমাদের দেশে যথেষ্ট প্রতিভাবান শিল্পী থাকা সত্ত্বেও তাদের বাদ দিয়ে বিদেশি দ্বিতীয়-তৃতীয় গ্রেডের শিল্পীদের দিয়ে মডেলিং করিয়ে বিজ্ঞাপন নির্মাণ করে এদেশে প্রচার করতে হলেও অতিরিক্ত শুল্ক গুনতে হবে।

ক্যানসার প্রতিকারে প্রয়োজন জাতীয় সচেতনতা

তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান বলেন, ক্যানসার প্রতিকারে সরকারের প্রশংসনীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রয়োজন জাতীয় সচেতনতা। এক সময়ে বাংলাদেশের প্রায়ই সব ওষুধই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো। এখন বাংলাদেশ ১১৭টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করে থাকে। নিজস্ব চাহিদার ৯৭ শতাংশ ওষুধ দেশে তৈরি হয়। সামগ্রিকভাবে সরকারের পদক্ষেপ, নিরলস সহযোগিতা আর জাতীয় সচেতনতায় একটি সুস্থ ও মেধাসম্পন্ন প্রজন্ম তৈরি হবে। ২০শে নভেম্বর ঢাকায় বিকন ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে নটরডেম কলেজ আয়োজিত কলেজ মিলনায়তনে 'Lung cancer awareness programme' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

সেমিনারে ক্যানসার প্রতিকারে জনগণকে সচেতনতার বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাজ প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিটি জেলায় তথ্য অফিস আছে এবং জেলা তথ্য অফিস জনগণকে সচেতন করার জন্য নিয়মিত প্রোগ্রাম করে যাচ্ছে। জনগণের সচেতনতার বিষয়ে প্রতিটি মহল্লায়, পাড়ায় উঠান বৈঠক করছে জেলা তথ্য অফিস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে, ২০৩০ সালে বিশ্বে ক্যানসার রোগীর সংখ্যা হবে প্রায় দ্বিগুণ। এর অধিকাংশই হবে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের। তাই এখনই সময় প্রস্তুতি নেওয়ার।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে নভেম্বর ২০১৯ ঢাকা সেনানিবাসে আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধের সাত বীরশ্রেষ্ঠের উত্তরাধিকারী এবং খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন–পিআইডি

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

জাতীয় সমবায় দিবস

২রা নভেম্বর: সারা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয় জাতীয় সমবায় দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন'

মন্ত্রিসভার বৈঠক

৪ঠা নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা ২০১৯-এর খসড়ার অনুমোদন লাভ করে

একনেক বৈঠক

৫ই নভেম্বর: এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রকল্পসহ ৬টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। এসব প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে চার হাজার ৪৩৯ কোটি টাকা

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ

৬ই নভেম্বর: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং সারাদেশে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পালিত হয় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০১৯

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) পালিত

১০ই নভেম্বর: ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য এবং যথাযথ মর্যাদায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) পালিত হয়

মন্ত্রিসভার বৈঠক

১১ই নভেম্বর: সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (সংশোধন) আইন ২০১৯-এর খসড়ায় নীতিগত অনুমোদিত হয়

বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস

১২ই নভেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস'।

৭টি নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র উদ্‌বোধন

১৩ই নভেম্বর: গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৭টি নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং ২৩টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেখ রাসেল ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব কাপ টেনিস টুর্নামেন্ট ২০১৯-এর উদ্‌বোধন করেন

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস

১৪ই নভেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'আসুন পরিবারকে ডায়াবেটিসমুক্ত রাখি'

আয়কর মেলা

দেশব্যাপী 'জাতীয় আয়কর মেলা-২০১৯' অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর বেইলি রোডের অফিসার্স ক্লাব প্রাঙ্গণে মেলার উদ্‌বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল

উন্নয়ন মেলা উদ্‌বোধন

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পল্লি কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) আয়োজিত উন্নয়ন মেলা উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই নভেম্বর ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) আয়োজিত 'উন্নয়ন মেলা ২০১৯'-এর বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন–পিআইডি

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

রোহিঙ্গা সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ বান কি মুনের

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে বৈঠকে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন রোহিঙ্গা সংকটের রাজনৈতিক সমাধান প্রত্যাশা করেন। ২৩শে নভেম্বর ঢাকায় এক হোটেলে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় তিনি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিশ্বে বাংলাদেশকে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেন।

বান কি মুনের সঙ্গে বৈঠকের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন সাংবাদিকদের বলেন, জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব আগামী বছর অক্টোবর মাসে নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিতব্য জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বান কি মুন আগামী বছর মার্চে ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে আসবেন।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে প্রায় ২৪ ঘণ্টার সফরে ২২শে নভেম্বর ঢাকায় আসেন বান কি মুন। এদিন ঢাকায় আর্মি স্টেডিয়ামে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন তিনি। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর বান কি মুন সাংবাদিকদের বলেন, গত জুন মাসে বাংলাদেশ সফরের সময় তিনি রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করেছিলেন। রোহিঙ্গা পরিস্থিতিকে অত্যন্ত দুঃখজনক ও মর্মান্তিক অভিহিত করে তিনি বলেন, এই লোকগুলো (রোহিঙ্গা) যাতে স্বাধীনভাবে ও নিরাপদে তাদের নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে সেজন্য তাদের প্রতি মিয়ানমার সরকারের আরো উদার হওয়া এবং সহযোগিতা করা প্রয়োজন। রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান বাংলাদেশের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে তিনি জাতিসংঘ ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে আহ্বান জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে ২৩শে নভেম্বর ২০১৯ ঢাকায় হোটেল রেডিসনে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন সাক্ষাৎ করেন–পিআইডি

মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ওআইসি'র মামলা

জেনোসাইড প্রতিরোধ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ লঙ্ঘনের অভিযোগে 'ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে (আইসিজে)' মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) পক্ষে গাম্বিয়া। ১১ই নভেম্বর নেদারল্যান্ডসের হেগে এ মামলা হয়। মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রাখাইন রাজ্যে জেনোসাইডের উদ্দেশ্যে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ এবং সম্প্রদায়গুলোকে ধ্বংস করার অভিযোগ আনা হয়েছে ৪৬ পৃষ্ঠার আবেদনে। এছাড়া রোহিঙ্গা সংকট ও মিয়ানমার পরিস্থিতিতে উদ্বেগ জানিয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে ২০ দফা প্রস্তাব আনছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং ওআইসির সদস্য দেশগুলো।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

খাদ্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাল ও আটার দাম পরিস্থিতি মনিটরিং-এর জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে। চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতার ক্রয়মূল্য তালিকা ঝুলিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি মনিটরিংও জোরদার করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে তিনটি কমিটি ও একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। যে কেউ কন্ট্রোল রুমে অভিযোগ জানাতে পারবেন। অভিযোগ কেন্দ্রের ফোন নম্বর: ০২-৯৫৪০০২৭ এবং ০১৬৪২-৯৬৭৭২৭। ইতোমধ্যে চালের বাজারদর কিছুটা কমে এসেছে। ভবিষ্যতে ব্যবসায়িক কারসাজিতে যাতে কেউ চালের দাম বাড়াতে না পারে সেলক্ষ্যে সব বিক্রেতাকেই ক্রয়মূল্য ঝুলিয়ে রাখতে হবে। কেউ অযৌক্তিক দামে বিক্রি করলে জনগণই তা কন্ট্রোল রুমকে অবহিত করবে। আর কন্ট্রোল রুম মন্ত্রণালয়কে তাৎক্ষণিক তা অবহিত করবে। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রণালয়ও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

আদেশ প্রকাশের পর, মনিটরিং টিম সারা দেশে তা পর্যবেক্ষণ করবে। যারা ক্রয়মূল্যের তালিকা ঝুলিয়ে রাখবে না তাদের প্রথমবারের মতো সতর্ক করা হবে। এরপরও না করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সবজি রপ্তানিতে সাফল্য

সবজি রপ্তানিতে নীরব বিপ্লব ঘটেছে বাংলাদেশে। চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে গত বছরের চেয়ে রপ্তানি বেড়েছে। গত বছরের মোট রপ্তানির পরিমাণ অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে চলতি অর্থবছরের এক তৃতীয়াংশ সময়ে। গার্মেন্টসসহ যেসব শিল্পপণ্য বিদেশে রপ্তানি হয় তার রপ্তানি আয়ের এক বড়ো অংশ চলে যায় কাঁচামাল আমদানিতে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯ কোটি ৯৬ লাখ ডলারের সবজি রপ্তানি হয়।

চলতি অর্থবছরে সবজি রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৩ কোটি মার্কিন ডলার। গত ৪ মাসের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪ কোটি ৯ লাখ ডলার, রপ্তানি হয়েছে ১০ কোটি ৫২ লাখ ডলার। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয়। এক সময় দেশের মধ্য ও উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যশোরেই কেবল সবজির চাষ হতো। এখন দেশের সব এলাকায় সারা বছরই সবজি চাষ হচ্ছে। সারা দেশে এখন ৬০ ধরনের ও ২০০ জাতের সবজি উৎপাদিত হচ্ছে। ১ কোটি ৬২ লাখ কৃষক পরিবার সবজি চাষে জড়িত।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ডের দুই পুরস্কার গ্রহণ করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টেলিযোগাযোগ খাত ও ডিজিটাইজেশনে বাংলাদেশের সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ডের দুটি পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। ২৫শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকের শুরুতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ও মন্ত্রণালয়ের সচিব অশোক কুমার বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর কাছে 'দ্য আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ সার্টিফিকেট অ্যাপ্রিসিয়েশন' ও 'দ্য আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ রিকগনিশন অব এক্সিলেন্স' পুরস্কার দুটি হস্তান্তর করেন।

হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে ৯-১২ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯-এ বাংলাদেশের কাছে পুরস্কার হস্তান্তর করা হয়েছিল। আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯-এ বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং একটি বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন স্থাপনের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রগতি তুলে ধরার জন্য টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) 'দ্য আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ সার্টিফিকেট

অ্যাপ্রিসিয়েশন' প্রদান করা হয়।

আর আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯-এ সেরা উদ্ভাবনের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সফল উদ্যোগ সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম (সিবিভিএমপি) 'দ্য আইটিইউ টেলিকম ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ সার্টিফিকেট অ্যাপ্রিসিয়েশন' পুরস্কার লাভ করে। সিবিভিএমপি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিটি সিমকার্ড নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র, ব্যক্তিগত তথ্য ও ছবির সত্যতা সঠিকভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়। ফলে অপরাধ সংঘটনের হার ব্যাপক হারে কমে এসেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট তাঁর কার্যালয়ে ২৫শে নভেম্বর ২০১৯ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ITU Telecom World 2019-এ সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য বিটিআরসির অর্জন Certificate of Appreciation এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে Central Biometric Verification Monitoring Platform (CBVMP) সেরা উদ্ভাবনের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাপ্ত Recognition of Excellence হস্তান্তর করেন–পিআইডি

ডিজিটাল অর্থনীতির উন্নয়নে শীর্ষ চারে বাংলাদেশ

গত ৪ বছরে ডিজিটাল অর্থনীতিতে চমকপ্রদ অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। ফলে হুয়াওয়ের 'গ্লোবাল কানেক্টিভিটি ইনডেক্স ২০১৯'-এর 'টপ মুভার' তালিকায় শীর্ষ চারে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ। তালিকার বাকি তিন দেশ হচ্ছে ইউক্রেন, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আলজেরিয়া। ২০১৫ সালে থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ডিজিটাল অর্থনীতিতে সারা বিশ্বের অগ্রগতি মূল্যায়ন করে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

গ্লোবাল কানেকটিভিটি ইনডেক্স (জিসিআই) ডিজিটাল বিকাশের উপর হুয়াওয়ের প্রকাশিত একটি গবেষণা প্রতিবেদন। এটি আইসিটি উদ্ভাবন এবং আইসিটি অ্যাপ্লিকেশনগুলো কীভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে বিকাশ লাভ করতে পারে এবং শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়, থিঙ্ক ট্যাঙ্কস এবং শিল্প সমিতিগুলোর সঙ্গে ডিজিটাল অর্থনীতিতে মুক্ত গবেষণা পরিচালনা করে সেসব বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়।

এর লক্ষ্য হলো– দেশ এবং শিল্পকে ডিজিটাল রূপান্তর সম্পর্কিত অনুমোদন, দিক নির্দেশনা, এবং এর অগ্রগতির সঠিক মূল্যায়ন পরিমাপগুলো তুলে ধরা। ২০১৪ সাল থেকে হুয়াওয়ে প্রতিবছর সরবরাহ, চাহিদা, অভিজ্ঞতা এবং সম্ভাবনা নামক চার ক্ষেত্রের ৪০টি সূচকের ভিত্তিতে একটি জিসিআই প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। জিসিআই ২০১৯ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাঁচ বছরেরও কম সময়ের পথচলায় 'গ্লোবাল কানেক্টিভিটি ইনডেক্স' বা বৈশ্বিক সুযোগ সূচকে সাত পয়েন্ট এগিয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৫ সালের পর দেশটিতে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর হার ৫% থেকে বেড়ে ৪১% হয়েছে। একই সময়ে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর হার ৭% থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৪%। এছাড়া মোবাইল ফোন ও বাসাবাড়িতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেছে বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

ডিজিটাল পদ্ধতিতে মজুরি, প্রশংসায় বিশ্বব্যাংক

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের মধ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে মজুরি বিতরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের প্রভাবের প্রশংসা করেছেন বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সফররত নির্বাহী পরিচালকেরা। আশুলিয়ায় নিউএজ গ্রুপের কারখানা পরিদর্শনে গিয়ে ৫ই নভেম্বর প্রতিনিধি দলটি বিকাশের মাধ্যমে বেতন প্রদানের ফলে পোশাককর্মীদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং কারখানাগুলোর উৎপাদনশীলতা বিষয়ে খোঁজখবর নেয়। এসময় তারা কাজের পরিবেশ ঘুরে দেখেন এবং শ্রমিকদের পাশাপাশি বিকাশ ও নিউএজ গ্রুপের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের কার্যক্রমগুলো কেমন চলছে, নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চ্যালেঞ্জগুলো কী ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা নিতে বিশ্বব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকেরা এদেশে আসেন। এরই অংশ হিসেবে তারা বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশনের (আইএফসি) অংশীদার

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৩০শে নভেম্বর ২০১৯ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ কামাল স্টেডিয়ামে ১১তম সমাবর্তন বক্তা পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. রঞ্জন চক্রবর্তীকে ক্রেস্ট প্রদান করেন–পিআইডি

বিকাশ, নিউএজ গ্রুপসহ তাদের বিভিন্ন অংশীদারের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। বর্তমানে দেশের ২৮০টি তৈরি পোশাক কারখানার প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার কর্মী বিকাশে বেতন পাচ্ছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, আর্থিক সেবা গ্রহণে এখনো দেশে লিঙ্গবৈষম্য রয়েছে এবং বিকাশের মতো সেবাগুলো এ বৈষম্য দূরীকরণে ভূমিকা রাখছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী শ্রমিকনির্ভর তৈরি পোশাক খাতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বেতন প্রদান নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

বিশ্বব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক প্যাট্রিজিও প্যাগানো বলেন, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে আমরা ব্যাপক পরিবর্তন দেখেছি। আগে কারখানাগুলো নগদ টাকা বা ব্যাংকের মাধ্যমে বেতন দিত, যা ঝামেলাপূর্ণ ও সময়সাপেক্ষ ছিল। ডিজিটাল পদ্ধতিতে বেতন বিতরণ কর্মী ও মালিক উভয় পক্ষের জন্যই লাভজনক।

খাদ্যপণ্য রপ্তানি হবে শতকোটি ডলারের

প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের রপ্তানি শতকোটি ডলার ছাড়িয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে শেষ হলো তিন দিনব্যাপী খাদ্যপণ্যের প্রদর্শনী। ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটির বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) এ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ২৩শে নভেম্বর ছিল সমাপনী দিন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি।

'সপ্তম বাপা ফুডপ্রো ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো' নামে যৌথভাবে এবারের প্রদর্শনীর আয়োজন করে বাংলাদেশ অ্যাগ্রো প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশন (বাপা) এবং রেইনবো এক্সিবিশন অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, একসময় অভাবে থাকা বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশীয় প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের খাদ্য উৎপাদন করছে, মানুষ সেগুলো খেতেও শিখেছে। তিনি বলেন, এবারের মেলায় যে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো নানা ধরনের প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে তা থেকেই বোঝা যায়, বাংলাদেশ ঠিক পথেই আছে। খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাত কোম্পানিগুলোকে সরকার যে প্রণোদনা দিয়ে থাকে, তা অব্যাহত রাখা হবে বলে ঘোষণা দেন বাণিজ্যমন্ত্রী। সমাপনী অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাপার সদস্যরা ২০২১ সালের মধ্যে ১০০ কোটি মার্কিন ডলারের খাদ্যপণ্য রপ্তানি করতে চায়। গত অর্থবছরে আয় হয়েছিল ৭০ কোটি ডলার। ১৩ সদস্য নিয়ে ১৯৯৮ সালে গঠিত বাপার সদস্য এখন ৫৬৯, যারা বিশ্বের ১৪৪ দেশে খাদ্য রপ্তানি করছে। এবারের প্রদর্শনীতে বিশ্বের ১৩ দেশের বিভিন্ন বিপণন এবং খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অংশ নেয় আর দেশীয় কোম্পানি ছিল ৫০টির বেশি।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

সদা সত্য ও ন্যায়কে সমুন্নত রাখার আহ্বান

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনের পর সদা সত্য ও ন্যায়কে সমুন্নত রাখার, নৈতিকতা ও দৃঢ়তা দিয়ে দুর্নীতি ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করার, রাষ্ট্রের বিবেকবান নাগরিক হিসেবে জাতীয় আকাঙ্ক্ষা, অর্জিত ডিগ্রির মানমর্যাদা রক্ষা, ব্যক্তিগত সম্মান, মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে কখনোই ভূলুণ্ঠিত না করার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মোঃ আবদুল হামিদ। ৩০শে নভেম্বর শেখ কামাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে স্নাতকদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি একথা বলেন। তিনি বিবেকের কাছে পরাজিত না হওয়ার উল্লেখ করেন। বর্তমান সরকার বাংলাদেশের বিশাল তরুণ সমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য আনুপাতিক হারে দেশে আরো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন রাষ্ট্রপতি।

তিনি বলেন, ব্যক্তি স্বার্থের কাছে আদর্শ যাতে ভূলুণ্ঠিত না হয় সে দায়িত্ব শিক্ষকদের নিতে হবে। রাজনৈতিক মতাদর্শ ও চিন্তা-চেতনায় একজনের সঙ্গে আরেকজনের পার্থক্য থাকলেও-এর নেতিবাচক প্রভাব যেন প্রতিষ্ঠানে বা শিক্ষার্থীদের ওপর না পড়ে। পরে অনুষ্ঠানে ২০১৫ ও ২০১৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অর্জনকারী ৩৪৩২ জন শিক্ষার্থীকে সনদ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মণি উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা জাতির মূল ভিত্তি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন ২০শে নভেম্বর কেরানিগঞ্জের জিনজিরা ও আগানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে জাতির মূল ভিত্তি।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

বহুমুখী পাটপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হবে

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বলেন, বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)'র মিলসমূহ আধুনিকায়ন করে মিলগুলোতে বহুমুখী পাটপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হবে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২৬শে নভেম্বর ২০১৯ চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং-এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠককালে মন্ত্রী এ কথা বলেন। এ সময় দুই দেশের বস্ত্র ও পাট শিল্পের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও এর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। মন্ত্রী জানান, বাংলাদেশে এই প্রথম পাট থেকে সোনালি ব্যাগ তৈরি হচ্ছে। সরকার গৃহীত নানামুখী উদ্যোগসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারা বিশ্বে পাটের ব্যবহার ছড়িয়ে দিতে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই সোনালি ব্যাগ পরিবেশবান্ধব।

বৈঠকে চীনের রাষ্ট্রদূত জানান, বাংলাদেশ ও চীনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। চীন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে বাংলাদেশ তাদের বন্ধুপ্রতিম দেশ। দুই দেশের নিয়মিত বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে এ সম্পর্ক আরো জোরদার হচ্ছে। সেজন্য তারা বস্ত্র ও পাট খাতে বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্প্রসারণ ঘটাতে চায়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব লোকমান হোসেন মিয়া, বিজিএমসি'র চেয়ারম্যান আব্দুর রউফসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী-এর সঙ্গে ২৬শে নভেম্বর ২০১৯ ঢাকায় তাঁর মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন–পিআইডি

তুরস্কের ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর বৈঠক

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ২১শে নভেম্বর ২০১৮ তুরস্কের আঙ্কারায় সেদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট Fuat Oktaz-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা হয়। আলোচনায় তুরস্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, তুরস্ক ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো। তিনি আরো বলেন, দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের একে অন্যের প্রতিযোগী না হয়ে আন্তরিকতা নিয়ে ব্যবসা করতে হবে।

অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রগতি এবং বিনিয়োগের সুবিধাগুলো তুলে ধরলে তুরস্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের চামড়াজাত দ্রব্যের প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত করেন। একইসঙ্গে আইসিটি খাতে তুরস্ক যেহেতু অত্যন্ত সফল তাই চামড়াজাত দ্রব্য ও আইসিটি খাতে বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রেরণের অনুরোধ করেন। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল তুরস্কের ভাইস প্রেসিডেন্টকে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে তাঁকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। এ সময়ে আরো উপস্থিত ছিলেন তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম আল্লামা সিদ্দিকী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক মোঃ দাউদ আলী।

আঙ্কারায় বাংলাদেশ-তুরস্ক যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন সভা

বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ ১৫টি লক্ষ্য সামনে রেখে তুরস্কের আঙ্কারায় ১৯শে নভেম্বর ২০১৯ শুরু হয় ৩ দিনব্যাপী বাংলাদেশ-তুরস্ক ৫ম যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন সভা। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। বাংলাদেশের পক্ষে বাণিজ্য-বিনিয়োগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, আইসিটি, শিপ বিল্ডিং, শিল্প, কর্মসংস্থান, নৌ-পরিবহণ, কৃষি, শিক্ষা, নগরায়ণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পর্যটন ও বিমান পরিবহণ, জ্বালানি-বিদ্যুৎ, সংস্কৃতি-ট্যুরিজম, ডেভলপমেন্ট অ্যাসিসটেন্স, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পাট-টেক্সটাইলসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের জন্য অনুরোধ করা হয়।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল পরে তুরস্কের গ্রান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলির স্পিকার মুস্তফা সেন্তোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মন্ত্রী বলেন, তুরস্ক অন্যতম অসাম্প্রদায়িক দেশ। অসাম্প্রদায়িকতা আর জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অবস্থানের কারণে তুরস্ক বিশ্বে সমাদৃত। বাংলাদেশের সঙ্গে তুরস্কের এই নীতিতে সামঞ্জস্য রয়েছে।

অর্থমন্ত্রী এ সময় বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দেশটিকে আঞ্চলিক যোগাযোগ, বিদেশি বিনিয়োগ এবং গ্লোবাল আউট সোর্সিংয়ের একটি কেন্দ্রে পরিণত করেছে। দেশে একশটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল হয়েছে। বিশ্বব্যাপী চলমান অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশ গত ১০ বছরে ৭ শতাংশের ওপরে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং চলতি বছর ৮ দশমিক ১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

প্রতিবেদন: এস আর সবিতা

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রবীণ নারীদের জন্য একক নারী ট্রাস্ট

প্রবীণ নারীদের জন্য হাস্নাহেনা নামে ৫৫ বছর বয়সি এক নারী প্রতিষ্ঠা করেছেন 'একক নারী ট্রাস্ট'। ট্রাস্টের নিবন্ধন হয়েছে। সাত সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। চলছে আবাসন গড়ে তোলার কার্যক্রম। ট্রাস্টের আবাসনে থাকবেন ষাটোর্ধ্ব নারী,

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ২৫শে নভেম্বর ২০১৯ ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় সংলাপের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

বিয়ে করেননি এমন নারী, নিঃসন্তান, তালাক প্রাপ্তা, বিধবা অথবা এক কথায় একক নারীরা যারা স্বামী, সন্তানহীন তাঁরা থাকবেন এই একক নারী ট্রাস্টের আবাসনে। ৫৫ বছর বয়সি হান্নাহেনা জাতিসংঘের একটি সংস্থায় প্রায় ২২ বছর কাজ করার পর স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছেন। একাকিত্বকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। দেখেছেন তাঁর আশপাশের অনেক নারী জীবনের খোঁজ পাচ্ছেন না, নিজের মতো করে বাঁচতে পারছেন না। একক নারীদের জীবনের খোঁজ দিতেই তিনি উদ্যোগ নিলেন একক নারী ট্রাস্ট গঠনের।

ঢাকা সিটির সর্বোচ্চ নারী করদাতা শাহনাজ

এ বছর ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকা থেকে সর্বোচ্চ নারী করদাতা হয়েছেন ট্রান্সকম গ্রুপের পরিচালক শাহনাজ রহমান। ৭ই নভেম্বর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সিটি করপোরেশন ও জেলা পর্যায়ে সেরা করদাতাদের এই তালিকা প্রকাশ করে। ১৪ই নভেম্বর ঢাকা বিভাগের সেরা করদাতাদের সম্মানিত করা হয়।

শাহনাজ রহমান

এবার প্রতিটি সিটি করপোরেশন ও জেলা থেকে তিনজন সর্বোচ্চ করদাতা ও দুজন দীর্ঘ সময় ধরে কর প্রদানকারী এবং একজন করে নারী করদাতা ও তরুণ করদাতা মনোনীত করা হয়েছে। দেশের সিটি করপোরেশনগুলো থেকে যারা সর্বোচ্চ নারী করদাতা হয়েছেন তাঁরা হলেন– চট্টগ্রাম সিটির শামিম হাসান, রাজশাহী সিটির নূরজাহান বেগম, খুলনা সিটির সাবিত্রী আগরওয়ালা, বরিশাল সিটির আনিকা রহমান, সিলেট সিটির শামসুন নাহার বেগম, কুমিল্লা সিটির ফারহানা বেগম, নারায়ণগঞ্জ সিটির নূরজাহান আহমেদ, রংপুর সিটির সামসি আরা, গাজীপুর সিটির মাসুদা পারভীন ও ময়মনসিংহ সিটির জিন্নাতুন নূর।

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালন

সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও ২৫শে নভেম্বর পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য– 'নারী-পুরুষের সমতা রুখতে পারে সহিংসতা'। বাংলাদেশ সরকার, নারী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো এ দিবস নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করেছে। ২৫শে নভেম্বর থেকে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের শুরু। জাতিসংঘের এক বার্তায় জানায়, জাতিসংঘ নারী ও কন্যাশিশুদের প্রতি সব ধরনের সহিংসতা বন্ধে অঙ্গীকারবদ্ধ।

নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে মেলা

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সহযোগিতার জন্য নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'ফ্লেমিং ফিমেল অন ফান্ড রাইজিং-২০১৯' শীর্ষক রকমারি পণ্যের মেলা। ৭ই নভেম্বর গুলশানের ফোর পয়েন্টস বাই শোরাটনের উদ্যোগে হোটেলের ব্যাঙ্কুয়েট হলে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

মেলায় নারী উদ্যোক্তাদের ২২টি স্টল স্থান পায়। এর মূল উদ্দেশ্য, নারী উদ্যোক্তাদের একটা জায়গা করে দেওয়ার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা। নারীরা নিজ প্রচেষ্টায় নিজেদের স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি সমাজকল্যাণেও যে অবদান রাখতে পারেন, এমন একটা উদাহরণ তৈরির জন্যই এই আয়োজন।

১০৩ বছর বয়সে দৌড়ে স্বর্ণপদক জয়

১০৩ বছর বয়সে এসেও ১০০ মিটার ও ৫০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা প্রদেশের বাসিন্দা জুলিয়া হকিন্স। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের অঙ্গরাজ্যে নিউ মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত সিনিয়র গেমসে শতবর্ষী নারী বিভাগে স্বর্ণপদক জিতেন তিনি। হকিন্স এ গেমসে দুটি ইভেন্টে অংশ নিয়ে দুটিতেই সোনা জিতেন। সিনিয়র গেমস অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সবচেয়ে বেশি বয়সি নারী হকিন্স।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাকে ঘর দেবে সরকার

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সরকারি খরচে ঘর তৈরি করে দেবে সরকার। প্রায় ১৪ হাজার অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা এই ঘর পাবেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুজিববর্ষের উপহার হিসেবে এই প্রকল্পের কাজ উদ্‌বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১লা ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ তথ্য জানানো হয়।

বৈঠকে আরো জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রায় ১৪ হাজার অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার জন্য গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এক একটি বাড়ি নির্মাণ করতে ব্যয় হবে প্রায় ১৫ লাখ টাকা। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে ২ হাজার ২০০ কোটি টাকা। এটি বাস্তবায়ন করবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বসতঘর পেল ৩৫০ পরিবার

ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলার সদর ইউনিয়নের ৩৫০টি গৃহহীন অসহায় পরিবার 'আশ্রয়ণের অধিকার– শেখ হাসিনার উপহার' স্লোগানে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত একটি করে বাড়ি উপহার পেয়েছেন। সরকারি খরচে নিজ জমিতে নির্মিত বাড়ি পেয়ে পরিবারগুলো এখন খুবই খুশি।

তারাকান্দা উপজেলায় ১ম কিস্তিতে গত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১৮০টি এবং ২য় কিস্তিতে চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ১৭০টি মিলে মোট ৩৫০টি ঘর নির্মাণ শেষে পরিবারগুলোর মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ বিষয়ে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের নীতি অনুযায়ী কোনো মানুষ গৃহহীন থাকবে না। প্রধানমন্ত্রীর ভিশন অনুযায়ী সমাজের সকল অংশে উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশকে ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ উন্নত হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। আগামীর বাংলাদেশ হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের প্রকৃত সোনার বাংলা।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ২১শে নভেম্বর ২০১৯ ঢাকায় বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে ৭ম বাপা ফুড প্রো ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০১৯-এর স্টল পরিদর্শন করেন–পিআইডি

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন করে রপ্তানির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের মুখে হাসি ফুটাতে হবে। বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশন (বাপা) যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে-এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আগামী বছর ফুডপ্রো ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো মেলায় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ২১শে নভেম্বর রাজধানীর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৩ দিনব্যাপী (২১-২৩) ৭ম বাপা ২০১৯-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, কৃষির ক্রমবর্ধমান বিকাশ নিশ্চিত করতে সরকারের পক্ষ হতে সহযোগিতা করা হবে। ফুড প্রসেসিং সেক্টর এবং এর সঙ্গে জড়িত সব প্রতিষ্ঠানের বিকাশ এবং সার্বিক সমন্বয় নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো বেগবান হবে।

পেঁয়াজের বিকল্প চিভ গবেষণায় সাফল্য

রান্নার অন্যতম প্রধান উপকরণ পেঁয়াজের বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের জন্য চিভ নামের মসলার জাত চাষে সাফল্য পেয়েছেন গাজীপুরের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. নূর আলম চৌধুরী। সহযোগী হিসেবে গবেষণায় অংশ নেন মোস্তাক আহমেদ, আলাউদ্দিন খান ও মোহাম্মাদ মনিরুজ্জামান। দীর্ঘদিন নর্থ চায়না, সাইবেরিয়ান ও মঙ্গোলিয়া অঞ্চলের মসলা জাতীয় বহুবর্ষজীবী চিভ নিয়ে গবেষণা করেন তারা। বছরজুড়েই চাষ ও ফলনের উপযোগী বারি চিভ-১ নামের একটি জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন গবেষকগণ।

পেঁয়াজ ও রসুনের স্বাদ বা গুণাগুণ থাকায় আপদকালীন সময়ে-এর বিকল্প হয়ে উঠতে পারে 'চিভ'– এমন ভাবনায় ২০১৭ সালে গবেষণা শুরু করেন বারি'র বিজ্ঞানীরা। দীর্ঘ প্রচেষ্টায় তারা বারি চিভ-১ নামের একটি উচ্চ ফলনশীল জাত অবমুক্ত করেছেন। এই ফসলকে ঘিরে অনেকটা পেঁয়াজ-রসুনের বিকল্প তৈরিতে আশার সঞ্চার হয়েছে।

বারির ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. নূর আলম চৌধুরী জানান, পৃথিবীর অনেক দেশে চিভ সাধারণত স্যুপ, সালাদ ও চাইনিজ ডিসে ব্যবহৃত হয়। এর পাতা লিলিয়ান আকৃতির ফ্ল্যাট, কিনারা মসৃণ ও-এর ভালভ লম্বা আকৃতির। চিভের স্বাদ অনেকটা পেঁয়াজ-রসুনের মতো। পণ্যটি হজমে সাহায্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ করে। এর মধ্যে ক্যানসার প্রতিরোধী গুণাগুণও বিদ্যমান রয়েছে। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি-১, বি-২, নায়াসিন, ক্যারোটিন ও খনিজ উপাদান বিদ্যমান। চিভ সাধারণত দেশের পাহাড়ি এলাকা সিলেট ও চট্টগ্রামে চাষ হয়ে থাকে। এছাড়াও এখন দেশের পেঁয়াজ উৎপাদনকারী এলাকা পাবনা, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, মাগুরা, বগুড়া ও লালমনিরহাট এলাকায় চিভ চাষের সম্ভাবনা রয়েছে। চিভ গাছ একবার লাগালে দীর্ঘদিন ধরে ফল পাওয়া যায়। বাড়ির আঙিনায় বা টবে এই ফসলের চাষ করা যায়।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই নভেম্বর ২০১৯ ঢাকায় গণভবন থেকে ৭টি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ২৩টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির উদ্‌বোধন উপলক্ষে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন–পিআইডি

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

মুজিববর্ষ উপলক্ষে বিদ্যুতের আলো জ্বলবে ঘরে ঘরে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, তাঁর সরকার ২০২১ সাল নাগাদ সব উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে সারা দেশে ঘরে ঘরে আলো জ্বালাতে সক্ষম হবে। প্রধানমন্ত্রী ১৩ই নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সাতটি নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং ২৩টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, '২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬শে মার্চ পর্যন্ত সময়কে আমরা 'মুজিববর্ষ' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছি। ইনশাআল্লাহ্, মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের মধ্যে আমরা শতভাগ বিদ্যুৎ দিতে সক্ষম হবো। কেউ অন্ধকারে থাকবে না, সব ঘরেই আলো জ্বলবে।'

উদ্‌বোধন হওয়া সাতটি বিদ্যুৎকেন্দ্র হলো– শিকলবাহা ১০৫ মেগাওয়াট, আনোয়ারা ৩০০ মেগাওয়াট, কর্ণফুলী ১১০ মেগাওয়াট, পটিয়া ৫৪ মেগাওয়াট, রংপুর ১১৩ মেগাওয়াট, তেতুঁলিয়া ৮ মেগাওয়াট সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং গাজীপুর ১০০ মেগাওয়াট। শতভাগ বিদ্যুতায়িত ২৩টি উপজেলা হলো– বগুড়া জেলার গাবতলী, শেরপুর, শিবগঞ্জ, চট্টগ্রামের লোহাগড়া, ফরিদপুর জেলার মধুখালী, নগরকান্দা, সালসা, গাইবান্ধার ফুলছড়ি, গাইবান্ধা সদর ও পলাশবাড়ি, হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর, হবিগঞ্জ সদর, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ ও মহেশপুর, কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ, নাটোর জেলার বরাইগঞ্জ, লালপুর ও সিংড়া, নেত্রকোনার বারহাট্টা ও মোহনগঞ্জ এবং পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া, কাউখালী ও ইন্দুরকানি।

বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্যমতে, এই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো উদ্‌বোধন এবং উপজেলাগুলোতে শতভাগ বিদ্যুতায়নের ফলে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমান সময়ে হয়েছে ২২ হাজার ৫৬২ মেগাওয়াট। পাশাপাশি দেশের ৪৬১টি উপজেলার মধ্যে ২৩৪টিতে শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। আরো ১২৭টি উপজেলায় শিগগিরই শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্ভব হবে, যেগুলো এখন উদ্‌বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া বাকি ১০০ উপজেলায় আগামী ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬শে মার্চ পর্যন্ত 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনকালে বিদ্যুতায়ন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আলোকিত করাই আমাদের কাজ এবং সেটাই আমরা করে যাচ্ছি। যেখানে বিদ্যুতের গ্রিড লাইন পৌঁছায়নি, সেসব প্রত্যন্ত পাহাড়ি, হাওর ও চরাঞ্চলে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সারা দেশে এই বিদ্যুতায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমাদের যে খরচ হয়, এর চাইতে অনেক কম অর্থে আমরা তা সরবরাহ করে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে বিদ্যুৎকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়াসহ একের পর এক বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্‌বোধনের মাধ্যমে তার সরকার বিদ্যুৎকে আজকের পর্যায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি সবাইকে অনুরোধ করব, এই বিদ্যুৎ ব্যবহারে আপনারা সাশ্রয়ী হবেন। বিদ্যুতের অপচয় যেন না হয়। বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হলে আপনাদের বিদ্যুৎ বিলটাও কম আসবে।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

বিজেএমসিকে একশত কোটি টাকা বরাদ্দ

২৬শে নভেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলসমূহের শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া মজুরি ও বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য একশত কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহের শ্রমিক-কর্মচারীদের আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বকেয়া মজুরি ও বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে অর্থ বিভাগের 'অপ্রত্যাশিত ব্যয়' খাত থেকে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিজেএমসি'র অনুকূলে 'পরিচালনা ঋণ' খাতে এ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

আর্থিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বিজেএমসি ও অর্থ বিভাগের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে বর্ণিত শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। ছাড় করা অর্থ বিজেএমসির অনুকূলে 'সরকারি ঋণ' হিসেবে গণ্য হবে, যা আগামী ২০ বছরে (পাঁচ বছরের গ্রেস পিরিয়ড-সহ) পাঁচ শতাংশ সুদে ষান্মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।

শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইএলও'র সহযোগিতা প্রয়োজন

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বিগত সম্মেলনে বাংলাদেশ যেসব অঙ্গীকার করেছে এবং বাংলাদেশের ওপর যেসব দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলো সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আইএলও-এর কোনো

সহযোগিতার প্রয়োজন হলে আইএলও তা দিতে প্রস্তুত আছে বলে কান্ট্রি ডিরেক্টর তাঁকে জানিয়েছেন। ২৬শে নভেম্বর সচিবালয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর কান্ট্রি ডিরেক্টরের সঙ্গে এক বৈঠক শেষে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাংলাদেশে শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠার সকল ব্যাপারে আইএলও-এর সহযোগিতা প্রয়োজন এবং এর সাথে সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে মন্ত্রী জানান।

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে দক্ষতা উন্নয়নের বিকল্প নেই

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেন, 'প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষতা উন্নয়নের বিকল্প নেই। তাই বিশ্ব কর্মবাজার উপযোগী দক্ষতা উন্নয়নে সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। আমরা এমডিজি অর্জনে সক্ষম হয়েছি। এখন এসডিজি অর্জনে কাজ করতে হবে। এলক্ষ্যে সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে-এর বিকাশে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।'

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন ১২ই নভেম্বর ২০১৯ ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের পদ্ধতি বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

প্রতিমন্ত্রী ১২ই নভেম্বর ২০১৯ রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)-এর ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও গণপ্রকৌশল দিবস উপলক্ষে 'লার্নিং বাই ডুয়িং হোক শিক্ষার ভিত্তি' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের বিষয়টি মাথায় রেখে সরকার দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রায়োগিক শিক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। শিক্ষাকে মানসিক চাপমুক্ত করে আনন্দময় করার প্রতি সরকার গুরুত্বারোপ করেছে। তিনি আরো বলেন, কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে এ দেশের বিপুলসংখ্যক বেকার যুব সমাজকে আয়বর্ধক মানবসম্পদে রূপান্তর করার বিষয়ে সরকার কাজ করছে। এছাড়া হতদরিদ্র শ্রমজীবী শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা প্রকৌশলী নিয়োগ দেওয়ার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে, যাতে তারা কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হতে পারে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় সংসদে জলবায়ু পরিবর্তনে জরুরি অবস্থা প্রস্তাব পাস হয়েছে

জলবায়ু সংকটের বহুমাত্রিক সমস্যা থেকে বিশ্বের ৮০ ভাগ জনগণকে রক্ষায় বিশ্বের সব পার্লামেন্ট সরকার জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাকে দ্রুত, কার্যকর ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অস্তিত্বের সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হোক শীর্ষক প্রস্তাব পাস হয়েছে জাতীয় সংসদে। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ১৩ই নভেম্বর সংসদের পঞ্চম অধিবেশনের বৈঠকে ১৪৭ বিধিতে আনা এই প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী। এসময় তিনি বলেন, 'আমরা হবো পৃথিবীর প্রথম ও একমাত্র সংসদ, যারা প্লানেটারি ইমার্জেন্সি ঘোষণা করল।' আগামী দিনের রাজনীতি, কূটনীতিতে এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্লাটফর্মে এটা উপস্থাপন করা হবে।

ধুলা রোধে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম

পরিবেশ দূষণ মোকাবিলায় ধুলাবালি কমিয়ে আনতে নগরীতে পানি ছিটানোর 'স্পেশাল ক্র্যাশ প্রোগ্রাম' চালু করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) ১লা ডিসেম্বর থেকে ৯টি গাড়ি দিয়ে ডিএসসিসির আওতাধীন এলাকায় পানি ছিটানো হচ্ছে। এ কার্যক্রম নিয়মিত চলবে। ১লা ডিসেম্বর ডিএসসিসি নগরভবন প্রাঙ্গণ থেকে এ কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন দক্ষিণ সিটির মেয়র সাঈদ খোকন। ঢাকা দক্ষিণ সিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রতিদিন দুই ট্রিপে পানি ছিটানো হবে– তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, আনন্দবাজার, পলাশী, শাহবাগ, কাঁটাবন, সাত মসজিদ রোড, হাজারীবাগ, ঝিগাতলা, সায়েন্সল্যাব, নীলক্ষেত, হাতিরপুল, মগবাজার, কাকরাইল, শান্তিনগরসহ প্রায় সব এলাকায়।

মেয়র বলেন, ধুলা দূষণ নিয়ন্ত্রণে ডিএসসিসি বরাবরই কাজ করছে। আদালত কিছু নির্দেশনা দিয়েছে। ধুলা দূষণ নিয়ন্ত্রণের মূল দায়িত্ব পালন করে পরিবেশ অধিদপ্তর। নাগরিকদের কথা বিবেচনা করে আমরা ১লা ডিসেম্বর থেকে একটি বিশেষ ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালু

করেছি। মেয়র খোকন বলেন, এই কর্মসূচির আওতায় সকাল ৬টা থেকে ৮টা ৩০ মিনিট এবং বিকালে নির্দিষ্ট সময়ে পানি ছিটানো হবে। কর্মসূচিতে যেসব স্থানে কনস্ট্রাকশন কাজ চলছে, সেখানে যদি সঠিকভাবে কাজ না হয় বা যেখানে-সেখানে মাটি পড়ে থাকে, তাহলে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে। যে-কোনো নির্মাণ কাজ সঠিক ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে করতে হবে। ঢাকাসহ আশপাশের এলাকায় বায়ু দূষণ রোধে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

রাজধানীতে সড়ক পরিবহণ আইনের সচেতনতা বাড়াতে মাঠে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগ

রাজধানীতে সড়ক আইন-২০১৮ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে মাঠে নেমেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ। পরিবহণ মালিক, চালক, যাত্রী, পথচারী, মোটর সাইকেল আরোহী ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে এই সচেতনতা কাজ অব্যাহত রেখেছে তারা। ৭ই নভেম্বর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক পয়েন্ট মহাখালী, কালশী, এয়ারপোর্ট, আব্দুল্লাহপুর, রামপুরা, সবুজবাগ, দয়াগঞ্জ ক্রসিং, নারিন্দা ক্রসিং, গোয়ালঘাট ক্রসিং, বাহাদুর শাহ পার্ক, মতিঝিল, গুলিস্তান ও ওয়ারীর বিভিন্ন এলাকায় এ সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এসময় জনগণের মাঝে লিফলেট বিতরণ করা হয়। একইসঙ্গে মাইকিং করে সড়ক পরিবহণ আইন-২০১৮ সম্পর্কে জানানো হয়। ৭ই নভেম্বর ট্রাফিক উত্তর বিভাগের উদ্যোগে বাস মালিক, চালক, হেলপার ও যাত্রীদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার নিয়ে কাকলীতে জনসাধারণকে নিয়ে কাউন্সিলিং ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

নতুন সড়ক আইন সম্পর্কে ট্রাফিক উত্তর বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) প্রবীর কুমার রায় চালক, হেলপার ও যাত্রীদের নতুন আইন সম্পর্কে সচেতনতামূলক পরামর্শ দেন। এসময় তিনি চালক ও হেলপারদের নির্ধারিত বাসস্টপেজে বাস থামানো, চলন্ত অবস্থায় বাসের দরজা বন্ধ রাখা, ঘুমঘুম চোখে গাড়ি না চালানো, ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি না চালানো ও পথচারীদের রাস্তা পারাপারে ফুটওভার ব্রিজ, জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, সড়ক পরিবহণ আইনে অপরাধ ও সাজা সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করাই আমাদের এ প্রচারণা। কাকলীতে ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার না করা পথচারীদের সেখানকার পুলিশ বক্সে এনে সকালে এবং বিকালে ঘণ্টাব্যাপী সচেতনতামূলক ক্লাস নেওয়া হয়। এতে করে মানুষের ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। যখন ট্রাফিকের চাপ বাড়ে যেমন– বিশ্ব ইজতেমা ও হজের মৌসুমেও আমরা নানা ধরনের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার কাজ হাতে নিই।

এদিকে, মহাখালী ও কাকলী মোড়ে যানজটে আটকে থাকা বাসগুলোতে উঠে ট্রাফিক পুলিশ সার্জেন্টদের সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা চালাতে দেখা যায়। প্রচারণার সময় তারা চালক ও হেলপারদের বলেন, নির্ধারিত বাসস্টপেজে বাস থামাবেন, যেখানে-সেখানে যাত্রী উঠা-নামা করাবেন না, চলন্ত অবস্থায় বাসের দরজা বন্ধ রাখবেন, চোখে ঘুম নিয়ে গাড়ি চালাবেন না, ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যতীত গাড়ি চালাবেন না, গাড়ির কাগজপত্র সঠিক আছে কিনা তা ভালোভাবে দেখে নেবেন, দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাবেন না। ফুটওভার ব্রিজ ও জেব্রা ক্রসিং ছাড়া রাস্তা পারাপার না করতে পথচারীদের প্রতি অনুরোধ জানান।

উত্তরায় ১টি সড়ককে সপ্তাহে একদিন গাড়িমুক্ত করার উদ্যোগ

রাজধানীর উত্তরার একটি সড়ককে সপ্তাহে একদিন ব্যক্তিগত গাড়িমুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। ২২শে নভেম্বর সকাল ৯টায় ডিএনসিসি মেয়র আতিকুল ইসলাম গাড়িমুক্ত সড়কের উদ্‌বোধন করেন। এসময় ডিএনসিসি জানিয়েছে, উত্তরার সোনারগাঁও জনপথ সড়কের ১১ নম্বর সেক্টরের ২/এ নম্বর থেকে চৌরাস্তা পর্যন্ত অংশে এখন থেকে প্রতি শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে। তখন ওই সড়কে এলাকাবাসী হাঁটাহাঁটি, সাইক্লিং, গান, ছবি আঁকা, বইপড়াসহ বিভিন্ন কাজ করতে পারবেন।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

বিমান বহরে যুক্ত হচ্ছে আরো দুটি ড্রিমলাইনার

দুবাই এয়ার শোতে বোয়িংয়ের কাছ থেকে দুটি ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার কেনার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। যুক্তরাষ্ট্রের বিমান নির্মাতা বোয়িং ১৭ই নভেম্বর এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছে। বিমানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তারা জানান, দুটি নতুন ড্রিমলাইনার কেনার জন্য গত মাসে বোয়িংয়ের সঙ্গে চুক্তি হয়। আগামী ডিসেম্বর মাসে বিমান বহরে যুক্ত হচ্ছে বিমান দুটি।

বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোকাব্বির হোসেন বলেন, আগামী ৫ই জানুয়ারি থেকে ড্রিমলাইনার দুটি ম্যানচেস্টার ও হিথ্রোর রুটে পরিচালিত হবে। তিনি বলেন, প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক এভিয়েশন শিল্পে অংশীদারিত্ব বাড়ানোসহ গ্রাহকের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করাই বিমানের প্রধান লক্ষ্য।

২৯৮ আসনের ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার একবার জ্বালানি নিয়ে ১৩ হাজার ৯৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারবে। পুরনো

উড়োজাহাজগুলোর তুলনায় এ ড্রিমলাইনারে জ্বালানি খরচ ও কার্বন নিঃসরণ ২৫ শতাংশ কম হবে। এ ধরনের উড়োজাহাজ সাধারণত ৫৮ কোটি ৫০ লাখ ডলারে বিক্রি করে বোয়িং। তবে বাংলাদেশ তারচেয়ে অনেক কম দামে উড়োজাহাজ দুটি পেতে যাচ্ছে বলে ধারণা দিয়েছিলেন কর্মকর্তারা। বিমানের বহরে এখন চারটি বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনারসহ মোট ১৬টি উড়োজাহাজ আছে। এর মধ্যে দুটি বোয়িং ৭৩৭-৮০০ এবং দুটি ড্যাশ-৮ উড়োজাহাজ ভাড়া করা। ১৭ই সেপ্টেম্বর বিমানের বহরে চতুর্থ ড্রিমলাইনার 'রাজহংস'র উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানেই আরো দুটি নতুন ড্রিমলাইনার কেনার কথা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২৮শে নভেম্বর ২০১৯ গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ৫টি নতুন জাহাজ উদ্‌বোধন উপলক্ষে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং নৌপরিবহণ সচিব একটি জাহাজের রেপ্লিকা তুলে দেন–পিআইডি

পদ্মা সেতুর ২৪০০ মিটার দৃশ্যমান

পদ্মা সেতুর ১৬ ও ১৭ নম্বর খুঁটির ওপর বসানো হয়েছে '৩-ডি' নম্বরের ১৬তম স্প্যান (সুপার স্ট্রাকচার)। ১৯শে নভেম্বর স্প্যান বসানোর পর পদ্মা সেতুর মূল অবকাঠামো দুই হাজার ৪০০ মিটার দৃশ্যমান হয়। ধূসর রঙের ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের ও তিন হাজার ১৪০ টন ওজনের স্প্যানটিকে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন তিন হাজার ৬০০ টন ধারণ ক্ষমতার ক্রেনবাহী ভাসমান জাহাজ 'তিয়ান ই'র মাধ্যমে ১৯শে নভেম্বর সকালে দুই খুঁটির মধ্যবর্তী সুবিধাজনক স্থানে নোঙর করা হয়। এরপর দুপুর ১টার দিকে পজিশনিং করে ইঞ্চি মেপে স্প্যানটি তোলা হয় খুঁটির উচ্চতায়। রাখা হয় দুই খুঁটির বেয়ারিংয়ের ওপর। স্প্যান বসানোর জন্য উপযোগী সময় এবং সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় দুপুর সোয়া ১টার মধ্যেই স্প্যানটিকে দুই খুঁটির ওপর স্থাপন করা সম্ভব হয় বলে পদ্মা সেতু প্রকল্পের দায়িত্বশীল একাধিক নির্বাহী প্রকৌশলী নিশ্চিত করেন। এর আগে '৩-ডি' নম্বরের ১৬তম স্প্যানটি (সুপার স্ট্রাকচার) কুমারভোগ কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডের জেটি থেকে অদূরেই ১৬ ও ১৭ নম্বর খুঁটির উদ্দেশে রওনা হয় ক্রেনবাহী ভাসমান জাহাজ 'তিয়ান-ই'। এর আগে ২২শে অক্টোবর স্থায়ীভাবে বসানো হয়েছিল ১৫তম স্প্যান।

পদ্মা সেতুর প্রকৌশলীরা আরো জানান, মূল সেতুর সব খুঁটির পাইপ ড্রাইভের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪২টি খুঁটির মধ্যে ৩২টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চীন থেকে মাওয়ার কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে এ পর্যন্ত ৩১টি স্প্যান এসেছে। যার মধ্যে ১৬টি স্প্যান স্থাপন করা হয়েছে খুঁটির ওপর। এছাড়া চারটি স্প্যান মাওয়ার কুমারভোগ কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে ও ৯টি স্প্যান পদ্মার চর এলাকায় স্থাপনের অপেক্ষায় রাখা হয়েছে।

বিএসসি'র নতুন ৫৮টি জাহাজ উদ্‌বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (বিএসসি) নতুন পাঁচটি সমুদ্রগামী জাহাজের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৮শে নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাহাজগুলোর উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (বিএসসি) নতুন পাঁচটি সমুদ্রগামী জাহাজ চীনের কাছ থেকে বিএসসির জন্য সংগ্রহ করেছে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)র বহরে যুক্ত হওয়া নতুন পাঁচটি জাহাজের নাম হলো– এম.ভি বাংলার সমৃদ্ধি, এম.ভি বাংলার অর্জন, এম.টি বাংলার অগ্রযাত্রা, এম.টি বাংলার অগ্রদূত এবং এম.টি বাংলার অগ্রগত। জাহাজগুলোর মধ্যে তিনটি প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার (তেলবাহী) এবং তিনটি বাল্ক ক্যারিয়ার পণ্যবাহী। বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী ছয়টি জাহাজ সংগ্রহে ব্যয় ধরা হয় ১ হাজার ৬৩৭ কোটি ১৫ লাখ টাকা। এর মধ্যে চীন সরকারের সহায়তা ১ হাজার ৫২৭ কোটি ৬৬ লাখ টাকা এবং বিএসসি'র নিজস্ব অর্থ ১০৯ কোটি ৪৯ লাখ টাকা। প্রতিটি জাহাজের ধারণক্ষমতা ৩৯ হাজার ডিডব্লিউটি (ডেড ওয়েট টন)।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশে নিউমোনিয়ায় শিশুমৃত্যুর হার কমেছে

দেশে নিউমোনিয়া পরিস্থিতি আগের তুলনায় উন্নতি হয়েছে। তবে ঘণ্টায় একটি শিশু এখনো এ রোগে মারা যাচ্ছে। প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার আরো উন্নতি করে নিউমোনিয়াজনিত মৃত্যু আরো কমিয়ে আনা সম্ভব। ৫ই নভেম্বর *প্রথম আলো* কার্যালয়ে 'নিউমোনিয়ায় শিশুমৃত্যু রোধে আমাদের করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে ২০১৮ সালে ইউনিসেফের একটি জরিপের বরাত দিয়ে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, টিকাদান কর্মসূচির কারণে দেশে নিউমোনিয়া পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। টিকাদান কর্মসূচি যেভাবে সফল হয়েছে, নিউমোনিয়া নিয়েও সেভাবে কৌশল গ্রহণের ওপর জোর দেন তাঁরা। এ বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের (মা ও শিশু স্বাস্থ্য) পরিচালক বলেন, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসা জরুরি। সে বিষয়ে মাঠ সেবাদাতাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এসব কাজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে করা হচ্ছে।

চিকিৎসা সহায়ক অ্যাপ চালু

স্বাস্থ্যসেবায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার এবং চিকিৎসকদের সুবিধার্থে মোবাইল ফোনভিত্তিক একটি অ্যাপ্লিকেশন (অ্যাপ) চালু করা হয়েছে। 'ডায়াবেটিস জার্নি' নামের এই অ্যাপটি মূলত ডায়াবেটিস চিকিৎসা সহায়িকা। ১২ই নভেম্বর রাজধানীর ঢাকা ক্লাবে নভো নরডিস্ক এবং বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা জানানো হয়।

ডায়াবেটিস জার্নি অ্যাপ দেশের জাতীয় ডায়াবেটিস রোগী নিবন্ধন ডিজিটালাইজেশনের বড়ো উদাহরণ। এটি সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রচেষ্টারও সহায়ক। সরকারের নতুন গাইডলাইনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা এই অ্যাপ রোগের ধরন ও রোগীদের প্রয়োজন বুঝে সঠিক চিকিৎসা পরামর্শ দিতে চিকিৎসকদের জন্য সহায়ক হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা এসব কথা বলেন। ডায়াবেটিস জার্নি অ্যাপ-http:/bit.ly/2qOcrWB-থেকে ডাউনলোড করতে হবে।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালন

২০০৬ সালে জাতিসংঘের ঘোষণার পর থেকে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে প্রতিবছর ১৪ই নভেম্বর পালিত হয় 'বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– আসুন, পরিবারকে ডায়াবেটিসমুক্ত রাখি। দিবসটি উপলক্ষে বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দিবসটি উপলক্ষে আয়োজন করে শোভাযাত্রা, আলোচনাসভাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান।

শুরুতে শনাক্ত হলে কিডনি রোগ ভালো হয়

দেশে প্রায় দুই কোটি মানুষ কিডনি রোগে আক্রান্ত। তবে কিডনি রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত হলে শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। রোগ যাতে না হয়, সেজন্য প্রতিরোধ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। ১৬ই নভেম্বর কিডনি ফাউন্ডেশনের দুই দিনব্যাপী বার্ষিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

কিডনি ফাউন্ডেশনের বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে অধ্যাপক ডা. হারুন অর রশিদ, জাতীয় অধ্যাপক বিগ্রিডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক, সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) অধ্যাপক ডা. এ এস এম মতিউর রহমান ও বাংলাদেশ ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনের (বাডাস) সভাপতি অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান, লন্ডনের রয়েল হসপিটালের অধ্যাপক মাগদী ইয়াকুব

কিডনি ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যাপক হারুন অর রশিদ বলেন, উন্নত বিশ্বের তুলনায় দেশে কিডনি ডায়ালাইসিসের খরচ অনেক কম। বাইরে ডায়ালাইসিসে প্রতিবার যেখানে ৫০ থেকে ৭০ মার্কিন ডলার খরচ হয় সেখানে বাংলাদেশে দরকার হয় ১৫ মার্কিন ডলারের কম।

কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী সম্মেলন

বাংলাদেশসহ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হ্রাস, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ও টিকা কর্মসূচি সফল হয়েছে কমিউনিটি বা গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। বিশ্বব্যাপী অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধেও তাদের ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে। ২২শে নভেম্বর শুরু হওয়া তিন দিনের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী সম্মেলনে এসব কথা বলেন বিশেষজ্ঞরা।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সেভ দ্য চিলড্রেন ও ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে বাংলাদেশসহ ৩৫টি দেশের ৫০০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

সন্ত্রাসী-জঙ্গি-মাদক ব্যবসায়ী কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সন্ত্রাসী-জঙ্গি-মাদক ব্যবসায়ী যে-ই হোক, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। ২৩শে নভেম্বর রাজধানীর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যুবলীগের ত্রিবার্ষিক জাতীয় সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং কবুতর ও বেলুন উড়িয়ে যুবলীগের এ সম্মেলন উদ্‌বোধন করেন যুবলীগের সাংগঠনিক নেত্রী ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা। নেতাকর্মীদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে রাজনীতি করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদক এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে নভেম্বর ২০১৯ ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ৭ম জাতীয় কংগ্রেস ২০১৯-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

তিনি বলেন, দিন-রাত দেশের মানুষের জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছি। চলার পথে কেউ যদি বিপথে যায় এবং সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদক ও দুর্নীতিতে জড়ায়, সে যেই হোক আমি তাদের ছাড়ব না। তাদের প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি থাকবে না। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যুবসমাজকে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা নিয়ে তার সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, দেশের যুবশক্তিই পারে দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ করে দিতে। সেজন্য যুবসমাজের প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি। সারা দেশের ৭৭টি সাংগঠনিক জেলা থেকে ২৮ হাজারেরও বেশি কাউন্সিলর যুবলীগের এই ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন।

মাদক খাব না খেত দেব না

মাদক ব্যবসায়ীদেরকে দেশ ও সমাজের শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, মাদক শুধু সমাজ নয়, দেশকেও ধ্বংস করে। মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি রয়েছে। আমরা মাদক খাব না বা খেতে দেব না। ২১শে নভেম্বর বিজিবি ১৬-এর মাদকদ্রব্য ধ্বংস ও আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি মাদক ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বলেন, যারা মাদক ব্যবসায়ী তারা মাদক ছেড়ে দেন। নিজের বাড়িটা সামলান। সন্তানরা মাদকের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে কিনা তা খেয়াল রাখুন। তিনি আরো বলেন, শুধু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না, মাদকের বিরুদ্ধে কাজ করার ইচ্ছা শক্তিও থাকতে হবে। অনুষ্ঠানে ১৬ বিজিবি ও ১৪ বিজিবি ব্যাটালিয়ন কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আটককৃত মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়। ধ্বংসকৃত মালামালের আনুমানিক মূল্য প্রায় সাড়ে ৭৭ লক্ষ টাকা।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ফোক ফেস্ট-২০১৯

দেশের লোকগান বিশ্ব দরবারে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২০১৫ সাল থেকে প্রতিবছর আয়োজিত হয়ে আসছে এশিয়ার সবচেয়ে বড়ো ফোক সংগীতের উৎসব ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ফোক ফেস্ট। প্রতিবছরের মতো এবারো রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়ামে তিন দিনব্যাপী এই উৎসব হয়। উৎসব চলে ১৪ থেকে ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত। বনানীর আর্মি স্টেডিয়ামে এ উৎসবের শুরুতে প্রমা ও ভাবনার নৃত্যদলের পরিবেশনায় সিলেট অঞ্চলের ধামাইল নৃত্য দিয়ে শুরু হয় ফোক সংগীত উৎসব। আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতির জন্য একই মঞ্চে সমবেত হয় দেশি-বিদেশি শিল্পীরা। এবার বাংলাদেশসহ আরো ৬টি দেশের ২০০ জনের বেশি লোকশিল্প ও কলাকুশলী অংশ নেন এ ফেস্টিভ্যালে।

উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অঞ্জন চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। উৎসব উদ্‌বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ।

চারুকলার নবান্ন উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় জাতীয় নবান্ন উৎসব উদযাপন পর্ষদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় নবান্ন উৎসব। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ-এ দুই মাসজুড়ে বাংলার প্রকৃতিতে আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয় ফসলের ঋতু হেমন্ত। এ বছর থেকে বাংলা দিনপঞ্জি বদলে গেছে। ১৪২৬ বঙ্গাব্দে প্রথমবারের মতো আশ্বিন মাসের গণনা শুরু হয় ৩১ দিন হিসেবে। সে হিসেবে ১৬ই নভেম্বর ছিল ১লা অগ্রহায়ণ। অগ্রহায়ণকে স্বাগত জানিয়ে জাতীয় নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপন পর্ষদ বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় এবারো নবান্ন উৎসবের আয়োজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুল তলায়। বাঁশিতে লোকজ সুরে নগরে অগ্রহায়ণকে স্বাগত জানানোর পর অনুষ্ঠিত হয় ঋতুভিত্তিক গানের সম্মিলিত পরিবেশনা। একক গান, দলীয় নৃত্য ও আবৃত্তি দিয়ে

সাজানো হয় এ আয়োজন। অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন নাট্য ব্যক্তিত্ব ফেরদৌসী মজুমদার।

ওশান ডান্স ফেস্টিভ্যাল-২০১৯

প্রথমবারের মতো কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে ২২শে নভেম্বর শুরু হয় আন্তর্জাতিক নাচের উৎসব ওশান ড্যান্স ফেস্টিভ্যাল-২০১৯। নৃত্যশিল্পীদের আন্তর্জাতিক সংগঠন ওয়ার্ল্ড ড্যান্স অ্যালায়েন্স এশিয়া প্যাসিফিক (উডিএএপি)-এর বাংলাদেশ শাখা নৃত্যযোগ প্রথমবারের মতো এ আয়োজন করে। চার দিনব্যাপী এ উৎসবে এশিয়াসহ বিশ্বের ১৫টি দেশ থেকে যোগ দেয় দুই শতাধিক নৃত্যশিল্পী, শিক্ষক, গবেষক ও কোরিওগ্রাফার। উৎসবের চারদিনই ভোর থেকে গানে, নৃত্যে ও নাটকে ভূপেন হাজারিকা স্মরণ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাজুড়ে মানুষের নিদারুণ কষ্ট, চা বাগানের মালিকদের অত্যাচার, ইংরেজদের চাবুকের আস্ফালন সবই যেন মনের খাতায় লিখে রাখতেন ভূপেন হাজারিকা। অবসরে সেই খাতা খুলে লিখে ফেলতেন একের পর এক গান। ভূপেন হাজারিকার অষ্টম প্রয়াণ দিবস ছিল ৫ই নভেম্বর। তাঁকে স্মরণ করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও আসামের সংগঠন ব্যতিক্রম মাসডো যৌথভাবে আয়োজন করে মোরা যাত্রী একই তরুণীর শীর্ষক আলোচনা। সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠানের প্রথম দিন ছিল আলোচনাসভা ও বইয়ের মোড়ক উন্মোচন। এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শেষ দিন ৭ই নভেম্বর একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে পরিবেশিত হয় অসম কলাতীর্থ ও এসবি মুভিজের নাটক 'কমলাকুঁয়ারীর সাধু'।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৭ ও ২০১৮ ঘোষণা

সরকার বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পে গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট শিল্পী, কলাকুশলী, প্রতিষ্ঠান ও চলচ্চিত্রকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৭ ও ২০১৮' প্রদানের ঘোষণা করেছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ ঘোষণা প্রদান করা হয়।

এক নজরে ২০১৭ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্তগণ হলেন:

আজীবন সম্মাননা (যুগ্ম): বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামান এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেত্রী সালমা বেগম সুজাতা; শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র (যুগ্ম): কায়সার আহমেদ ও মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন (সানী সানোয়ার)– ঢাকা অ্যাটাক; শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র: বাংলাদেশ টেলিভিশন, চলচ্চিত্রের নাম– বিশ্ব আঙিনায় অমর একুশে; শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক: বদরুল আনাম সৌদ– গহীন বালুচর; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে (যুগ্ম): শাকিব খান রানা– সত্তা ও মাহবুবুল আরিফিন শুভ– ঢাকা অ্যাটাক; শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে: নুসরাত ইমরোজ তিশা– হালদা; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে: মো. শাহাদাৎ হোসেন– গহীন বালুচর; শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে (যুগ্ম): সুবর্ণা মুস্তাফা– গহীন বালুচর ও রুনা খান– হালদা; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা খল চরিত্রে: জাহিদ হাসান– হালদা; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কৌতুক চরিত্রে: এম ফজলুর রহমান– গহীন বালুচর; শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী: নাইমুর রহমান আপন– ছিটকিনি; শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার: অনন্য সামায়েল– আঁখি ও তার বন্ধুরা; শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক: এম ফরিদ আহমেদ হাজরা (ফরিদ আহমেদ)– তুমি রবে নীরবে; শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক: ইভান শাহরিয়ার সোহাগ– ধ্যাততেরিকি; শ্রেষ্ঠ গায়ক: মাহফুজ আনাম জেমস (তোর প্রেমেতে অন্ধ...)– সত্তা; শ্রেষ্ঠ গায়িকা: মমতাজ বেগম (না জানি কোন অপরাধে...)– সত্তা; শ্রেষ্ঠ গীতিকার: সেজুল হোসেন (না জানি কোন অপরাধে...)– সত্তা; শ্রেষ্ঠ সুরকার: শুভাশীষ মজুমদার বাপ্পা (না জানি কোন অপরাধে...)– সত্তা; শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার: আজাদ বুলবুল– হালদা;

শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার: তৌকির আহমেদ– হালদা; শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা: বদরুল আনাম সৌদ– গহীন বালুচর; শ্রেষ্ঠ সম্পাদক: মো. কালাম– ঢাকা অ্যাটাক; শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক: উত্তম কুমার গুহ– গহীন বালুচর; শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক: কমল চন্দ্র দাস– গহীন বালুচর; শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক: রিপন নাথ– ঢাকা অ্যাটাক; শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজসজ্জা: রিটা হোসেন– তুমি রবে নীরবে ও শ্রেষ্ঠ মেকআপম্যান: মো. জাভেদ মিয়া– ঢাকা অ্যাটাক।

এক নজরে ২০১৮ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্তগণ হলেন:

আজীবন সম্মাননা (যুগ্ম): বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা, প্রযোজক ও পরিচালক এম এ আলমগীর এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা প্রবীর মিত্র; শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র: পুত্র, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান– চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর; শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র: গল্প সংক্ষেপ, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান– বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট; শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র: ফরিদুর রেজা সাগর– রাজাধিরাজ রাজ্জাক; শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক: মোস্তাফিজুর রহমান মানিক– জান্নাত; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে (যুগ্ম): ফেরদৌস আহমেদ– পুত্র; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে (যুগ্ম): সাদিক মো. সাইমন (সাইমন সাদিক)– জান্নাত; শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান চরিত্রে: জয়া আহসান– দেবী; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্ব চরিত্রে: আলী রাজ– জান্নাত; শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্ব চরিত্রে: সুচরিতা– মেঘকন্যা; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা খল চরিত্রে: সাদেক বাচ্চু– একটি সিনেমার গল্প; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা/অভিনেত্রী কৌতুক চরিত্রে (যুগ্ম): মোশাররফ করিম– কমলা রকেট; শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কৌতুক চরিত্রে (যুগ্ম): আফজাল শরীফ– পবিত্র ভালোবাসা; শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী: ফাহিম মুহতাসিম লাজিম– পুত্র; শিশু শিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার: মো. মাহমুদুর রহমান অনিন্দ– মাটির প্রজার দেশে; শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক: ইমন সাহা– জান্নাত; শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক: মাসুম বাবুল (আমার জামা কাপড়...)– একটি সিনেমার গল্প; শ্রেষ্ঠ গায়ক: নাইমুল ইসলাম রাতুল (যদি দুঃখ ছুঁয়ে...)– পুত্র; শ্রেষ্ঠ গায়িকা (যুগ্ম): সাবিনা ইয়াসমিন (ভুলে মান অভিমান...)– পুত্র; শ্রেষ্ঠ গায়িকা (যুগ্ম): আঁখি আলমগীর (গল্প কথার ঐ...)– একটি সিনেমার গল্প; শ্রেষ্ঠ গীতিকার (যুগ্ম): কবির বকুল (যদি এভাবেই ভালোবাসা...)– নায়ক; শ্রেষ্ঠ গীতিকার (যুগ্ম): জুলফিকার রাসেল (যদি দুঃখ ছুঁয়ে দেখো...)– পুত্র; শ্রেষ্ঠ সুরকার: রুনা লায়লা (গল্প কথার ঐ...)– একটি সিনেমার গল্প; শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার: সুদীপ্ত সাঈদ খান– জান্নাত; শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার: সাইফুল ইসলাম মান্নু– পুত্র; শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা: এস. এম. হারুন-অর-রশীদ (হারুন রশীদ)– পুত্র; শ্রেষ্ঠ সম্পাদক: তারিক হোসেন বিদ্যুৎ– পুত্র; শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক: উত্তম কুমার গুহ– একটি সিনেমার গল্প; শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক: জেড এইচ মিন্টু– পোষ্ট মাস্টার ৭১; শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক: আজম বাবু– পুত্র; শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজসজ্জা: সাদিয়া শবনম শান্ত– পুত্র ও শ্রেষ্ঠ মেকআপম্যান: ফরহাদ রেজা মিলন– দেবী।

জাতীয় পুরস্কারের অর্থমূল্য বেড়ে দ্বিগুণ

রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে প্রায় দ্বিগুণ করেছে সরকার। ২১শে নভেম্বর সংশোধিত 'জাতীয় পুরস্কার/পদক-সংক্রান্ত নির্দেশাবলি' প্রকাশ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ ঘোষণা দেয়।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ক্ষেত্রে আঠারো ক্যারেট মানের ১৫ গ্রাম স্বর্ণের একটি পদক, পদকের একটি রেপ্লিকা, একটি সম্মাননাপত্র দেওয়া হয়। একই সঙ্গে থাকে অর্থ, যা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হয়েছে। সংশোধিত নির্দেশাবলি অনুযায়ী, এখন থেকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের ক্ষেত্রে আজীবন সম্মাননাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তিন লাখ টাকা পাবেন। শ্রেষ্ঠ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রযোজক, শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য

চলচ্চিত্র প্রযোজক, শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রযোজক ও শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালককে দুই লাখ টাকা করে দেওয়া হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এক লাখ টাকা করে দেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: মিতা খান

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

শিশু পাচার রোধে আন্তঃসীমান্ত সমন্বয় সভা

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ২৩শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় শিশু পাচার বিষয়ক আন্তঃসীমান্ত সমন্বয় সভা। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসাইন দ্রুততম সময়ের মধ্যে চলমান বিশেষ শিশু আদালত গঠনের কাজ শেষ করে বিচারক নিয়োগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। ইনসিডিন বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক একেএম মাসুদ আলীর সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও যুগ্মসচিব, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ।

সভায় প্রধান বিচারপতি বলেন, মানব পাচার এক ধরনের সহিংসতা। নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি সহিংসতার শিকার হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। এর বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। ভারতের প্রতিনিধি মানবেন্দ্র নাথ মণ্ডল বলেন, পাচারের শিকার হওয়া ৪০

থেকে ৫০ জন শিশুকে প্রতিবছর আমরা ভারত থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থার কাছে পাঠিয়ে থাকি। কিন্তু এক্ষেত্রে আইনি নানা জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়। তাই সুনির্দিষ্ট আইনের পাশাপাশি আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ। একইসঙ্গে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো দরকার।

শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদের ৩০তম বার্ষিকী

গত ৩০ বছরে দেশে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। টিকাদান কর্মসূচিতেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। খর্বকায় শিশুর হার কমেছে। বেড়েছে বিশুদ্ধ পানিপ্রাপ্তির সুযোগও। ২৩শে নভেম্বর শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদের (সিআরসি) ৩০তম বার্ষিকী ও বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে এক আলোচনাসভায় এসব তথ্য দেওয়া হয়। রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এ সভার আয়োজন করে ইউনিসেফ বাংলাদেশ।

সভায় জানানো হয়, ১৯৯০ সালে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি ১ হাজারে জীবিত জন্মে ১৫১, যা ২০১৯ সালে ৪০ জনে নেমে এসেছে। একইভাবে এই সময়ে সম্পূর্ণভাবে টিকা পেয়েছে এমন শিশুর সংখ্যা ৫২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮২ শতাংশ হয়েছে। খর্বকায় শিশুর হার ৭২ থেকে ২৮ শতাংশে নেমেছে। বিশুদ্ধ পানিপ্রাপ্তির সুযোগ ৭৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

শিশুবান্ধব আদর্শ নগরী গড়ে তুলতে ও শিশুদের চাহিদা এবং স্বপ্নের প্রতিফলন নিশ্চিত করতে রাজউকের সভাকক্ষে রাজউক ও সেভ দ্য চিলড্রেন-এর আয়োজনে মতবিনিময় সভা

অনুষ্ঠানে আরো জানানো হয়, স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দারুণ অগ্রগতি হয়েছে। এই সময়ে টয়লেট ব্যবহারের হার বেড়েছে ৯ থেকে ৮৫ শতাংশ। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর হারও বেড়েছে। তবে এখনো ৬ থেকে ১৫ বছর বয়সের ৪৩ লাখ শিশু স্কুলের বাইরে রয়েছে। ব্র্যাকের চেয়ারপারসন হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, শিশু অধিকার নিশ্চিত করতে অভিভাবককে সচেতন হতে হবে। শিশু অধিকার বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সভাপতি শামসুল হক ও সাংসদ মেহের আফরোজ চুমকি অনুষ্ঠানে বক্তব্যে দেন।

শিশুবান্ধব নগর গড়বে রাজউক

শিশুরা চায় বাড়ি থেকে হাঁটার দূরত্বে স্কুল, পর্যাপ্ত খেলার মাঠ-পার্ক, সবুজ পরিবেশ ও নিরাপদ আবাসিক এলাকা। প্রক্রিয়াধীন বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় (ড্যাপ) শিশুদের এই চাওয়াগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে ঢাকা শহরকে শিশুবান্ধব করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। ১৬ই নভেম্বর রাজউক মিলনায়তনে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এ ঘোষণা দেওয়া হয়। পাশাপাশি ঢাকা শহরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সভায় অংশগ্রহণকারীরা।

প্রক্রিয়াধীন ড্যাপে শিশুদের চাহিদার প্রতিফলন ঘটাতে গত মে মাসে রাজউক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে। এতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ঢাকা শহর নিয়ে তাদের ভাবনা ও চাহিদার কথা জানায়। তাদের ভাবনা ও চাহিদার কতটুকু প্রক্রিয়াধীন ড্যাপে যুক্ত হচ্ছে, তা চূড়ান্ত করতে এবং বিষয়টি শিশুদের অবহিত করতে এবারের মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধীদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'কানাকে কানা আর খোঁড়াকে খোঁড়া বলো না, শৈশব থেকে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি। শিশুদের শৈশব থেকে এই শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তারা মানবিক হয় এবং যাতে তারা আমাদের সঙ্গে একত্রে চলতে পারে– এটিই সবচেয়ে বড়ো কথা।'

৫ই ডিসেম্বর, ২০১৯ ২৮তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২১তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস ২০১৯-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। রাজধানীর মিরপুরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নবনির্মিত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কমপ্লেক্স 'সুবর্ণ ভবন' উদ্‌বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সবার জন্য সব মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তাঁর সরকার বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তিনি আরো বলেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের জন্য স্বাধীনতা নিয়ে এসেছেন। আমাদের লক্ষ্য হলো এই স্বাধীন দেশের সকল জনগণ সমান অধিকার নিয়ে বসবাস করবে এবং আমরা এই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছি।' প্রতিবন্ধিতা থেকে উত্তরণের বিভিন্ন

৫ই ডিসেম্বর ২০১৯ ঢাকায় মিরপুরে ২৮তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২১তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসের অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রাপ্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা–পিআইডি

ক্ষেত্রে সফল এবং অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন-সংস্থা ও বাবা-মাকে পুরস্কৃত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অটিজম অথবা প্রতিবন্ধিতা কোনো রোগ অথবা অসুস্থতা নয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার এমন পদক্ষেপ নিচ্ছে, যাতে অটিজম অথবা প্রতিবন্ধিতায় যাঁরা ভুগছেন, তাঁরা সমাজের মূলধারার সঙ্গে বসবাস করতে পারেন। তিনি আরো বলেন, 'আমরা জানি যে এ ধরনের প্রতিবন্ধিতায় যেসব শিশু ভুগছে, তাদের পিতামাতার জন্য এটি খুবই বেদনাদায়ক। আমরা তাদের এই দুর্দশা নিরসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছি।'

দেশের ব্যাপক আর্থসামাজিক উন্নয়নের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার এই উন্নয়নে প্রতিবন্ধীদের ওপর জোর গুরুত্ব দিয়েছে। তিনি আরো বলেন, 'আমরা চাই দেশের উন্নয়ন এবং আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গুরুত্ব দিচ্ছি, যাতে তারা উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে না থাকে।

প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংবিধান স্বীকৃত

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। তাই প্রতিবন্ধীদের সহায়তায় সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এতে প্রতিবন্ধীরা সমাজে সমান অধিকার নিয়ে বাঁচবে। সাভারে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি), সিআরপি ও বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফাউন্ডেশন (বিবিএফ) কর্তৃক আয়োজিত 'হুইল চেয়ার বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট-২০১৯' অনুষ্ঠানে ৫ই ডিসেম্বর, ২০১৯ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

টুর্নামেন্ট আয়োজনে ধন্যবাদ জানিয়ে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, এমন সৃজনশীল আয়োজন নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। প্রতিবন্ধীদের খেলা ও অদম্য গতিতে এগিয়ে যাওয়া অন্যদের জন্য অনন্ত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে। সকল প্রতিবন্ধকতার উত্তরণ ঘটিয়ে প্রতিবন্ধীরা বাধাবিপত্তিকে জয় করে স্বাভাবিক কাজকর্মসহ বিভিন্ন খেলাধুলায় অনন্য ভূমিকা রাখছে। যা দেশের সকলের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণযোগ্য।

প্রতিবেদন: হাছিনা আক্তার

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

বান্দরবান ডনবস্কো উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর

৯ই নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ডনবস্কো উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমি ভবনের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধন শেষে মন্ত্রী কাজ পরিদর্শন করেন এবং কাজের গুণগতমান ভালো করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি ডনবস্কো উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমি ভবনের ভিত্তিফলক উন্মোচন করেন

বান্দরবানে মহাপিণ্ড দান সম্পন্ন

যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বান্দরবানে উদ্‌যাপিত হলো বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মহাপিণ্ড দান অনুষ্ঠান। মহাপিন্ড দান অনুষ্ঠান উপলক্ষে ১২ই নভেম্বর বান্দরবান খিয়ং ওয়া কিয়ং থেকে বৌদ্ধ

ভিক্ষুদের একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়ে বান্দরবানের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। তিন শতাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু শহরের বিভিন্ন জায়গা প্রদক্ষিণ করে পিণ্ড দান গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পিণ্ড দান করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি। পিণ্ড দান অনুষ্ঠানে সকলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শ্রদ্ধা জানিয়ে নগদ টাকা, চাল, ফল, মিষ্টি, মোম, আগরবাতিসহ নানারকম উপকরণ দান করে দেশ ও জাতির সুখ শান্তি প্রার্থনা করে। প্রতিবছর মাসব্যাপী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান শেষে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উদ্যোগে এই মহাপিন্ড দান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আর এই পিণ্ড দান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আগামী দিনের সুখ শান্তি প্রত্যাশা করে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নরনারীরা।

থানচিতে বিদ্যুৎহীন ১১০ পরিবার পেল সোলার প্যানেল

থানচি উপজেলা প্রশাসন ও পরিষদের যৌথ উদ্যোগের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কাবিটা ও টিআর কর্মসূচির আওতায় বিদ্যুৎবিহীন হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে সোলার প্যানেল তুলে দেওয়ার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় ১৪ই নভেম্বর। উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সোলার প্যানেল ব্যবহার সংরক্ষণের উপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আর সেই সময় ১১০ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় সোলার প্যানেল। আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আরিফুল হক মৃদুল।

নাইক্ষ্যংছড়িতে ৫০ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজের উদ্‌বোধন করলেন পার্বত্যমন্ত্রী

১৫ই নভেম্বর নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ মাঠে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় পার্বত্যমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি ১৩টি উন্নয়ন কাজের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধন হওয়া উন্নয়ন কাজগুলো হলো– এলজিইডির তত্ত্বাবধানে ৩৫ কোটি ২৬ লাখ টাকা ব্যয়ে ৫টি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ৪ কোটি ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে ৪টি এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৭ কোটি ৩২ লাখ টাকা ব্যয়ে ৪টি উন্নয়ন কাজ।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

ইমার্জিং এশিয়া কাপে বাংলাদেশের দাপট

ফাইনালে গিয়েও শিরোপা জয় করা না হলেও বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দলের ইমার্জিং এশিয়া কাপে দাপটের সাথে একটানা জয় করেছে কয়েকটি ম্যাচ।

হংকংয়ের বিপক্ষে জয়: ইমার্জিং এশিয়া কাপের উদ্‌বোধনী দিনে হংকংয়ের বিপক্ষে ৯ উইকেটের বড়ো জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। সৌম্য সরকার ও নাঈম শেখের ব্যাটিং ঝলকে দুর্দান্ত এই জয় পায় বাংলাদেশ। সৌম্য-নাঈম দুজনই ব্যক্তিগত হাফ সেঞ্চুরি করেছেন। ১৪ই নভেম্বর সাভারের বিকেএসপির চার নম্বর মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬৪ রান সংগ্রহ করে হংকং। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৫ রান করেন হারুন আরশাদ। পরে বাংলাদেশ ব্যাট করতে নেমে ২৪.১ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ে পৌঁছে যায়।

ভারতের বিপক্ষে জয়: ইমার্জিং এশিয়া কাপের দ্বিতীয় ম্যাচেও দাপুটে জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। ১৬ই নভেম্বর ভারতকে ৬ উইকেটে উড়িয়ে দেয় টাইগাররা। নাজমুল হোসেন শান্ত ও সৌম্য সরকার ব্যাট হাতে আলো ছড়ান। ২৪৭ রানের লক্ষ্যটা ৪৭ বল হাতে রেখেই টপকে যায় বাংলাদেশ।

নেপালের বিপক্ষে জয়: ইমার্জিং এশিয়া কাপে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে নেপালকে ৮ উইকেটে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখে বাংলাদেশ। ব্যাট হাতে আলো ছড়ান নাজমুল হোসেন শান্ত ও নাইম শেখ। তাদের ব্যাটিং নৈপুণ্যে ১৩৯ রানের লক্ষ্য ২৬ ওভার হাতে রেখে টপকে যায় বাংলাদেশ।

টানা তৃতীয় ম্যাচে বল হাতে নৈপুণ্য দেখালেন সুমন খান। প্রথম দুই ম্যাচে ভারত ও হংকংয়ের বিপক্ষে ৮ উইকেট নেন ১৯ বছর বয়সি সুমন খান। নেপালের বিপক্ষে শিকার করেন ৩ উইকেট। এর আগে ১৮ই নভেম্বর টসে জিতে নেপালকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় বাংলাদেশ। ব্যাটিংয়ে নেমে ৪৪.৩ ওভারে ১৩৮ রানে অলআউট হয় নেপাল। ৩৩ রানের ওপেনিং জুটি ভাঙার পর ব্যাটিংয়ে ধস নামে নেপাল ইনিংসের। ৬৮ রানে হারায় ৭ উইকেট। শেষদিকে ৯ নম্বরে নামা সোম্পাল কামির দলীয় সর্বোচ্চ ৩৮ রানে ভর করে শতরান পার করে নেপাল।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয়: ইমার্জিং এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-২৩ দলকে বড়ো ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে উঠে বাংলাদেশ। আফগানদের ২২৯ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেট ও ৬১ বল হাতে রেখে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলাদেশ। ২১শে নভেম্বর মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেট হারিয়ে ২২৮ রান সংগ্রহ করে আফগানিস্তান।

২২৯ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম (১৭) রান করে আউট হয়। এরপর ১০৭ রানের দুর্দান্ত জুটি গড়ে দলকে শক্ত ভিত এনে দেন সৌম্য সরকার ও নাজমুল হোসেন শান্ত।

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন ২২শে নভেম্বর ২০১৯ ঢাকায় মাওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে প্রাণ-ডিআরইউ মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০১৯-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন–পিআইডি

ভারতকে হারিয়ে দিল্লি শাসন মুশফিকদের

এ যেন লেখা ছিল। এটাই হবে। তিন বছর আগে বেঙ্গালুরুতে তিন বলে ২ রান নিতে না পারার ব্যর্থতার দায় ছিল মাহমুদউল্লাহ ও মুশফিকুর রহিমের। ৩রা নভেম্বর সে দায়টা মেটালেন দুজন। সেদিন প্রথমে আউট হয়েছিলেন, ৩রা নভেম্বর তাই পথ দেখালেন মুশফিক। আর সেদিন যা করতে পারেননি, এবারে সেটাই করলেন মাহমুদউল্লাহ। ছক্কা মেরে এনে দিলেন ৭ উইকেটের জয়। তারপর এমন ভাবে উদ্‌যাপন করলেন, যেন এ ফলটাই স্বাভাবিক। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৬ উইকেট হারিয়ে ২০ ওভারে ১৪৮ রান করে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে নভেম্বর কলকাতার ইডেন গার্ডেন স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে উপমহাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম দিবা-রাত্রির টেস্ট ম্যাচ উপভোগ করেন–পিআইডি

ভারত। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৩ উইকেট হারিয়ে ৩ বল হাতে রেখেই দুর্দান্ত জয় পায় বাংলাদেশ।

পাকিস্তানের মাটিতেও ইতিহাস বাংলাদেশের

৩রা নভেম্বর ইতিহাস রচনা করেছে মুশফিক-মাহমুদউল্লাহরা। সব সংস্করণ মিলে ভারতের মাটিতে প্রথম জয় পেয়েছে বাংলাদেশের পুরুষ জাতীয় দল। ৪ঠা নভেম্বর তেমনই এক ইতিহাস রচনা করল নারী ক্রিকেট দল। ঐদিন সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে পাকিস্তানকে ১ উইকেটে হারিয়েছেন রুমানা-সালমারা। পাকিস্তানের মাটিতে ক্রিকেটে এটিই বাংলাদেশের প্রথম জয়। এ জয়ে পাকিস্তানে কোনো সিরিজ ড্র করতেও সক্ষম হলো বাংলাদেশ।

ক্রিকেটে ছেলেদের নিয়ে উন্মাদনা থাকলেও কোনো বড়ো টুর্নামেন্টের শিরোপা মেয়েরাই এনে দিয়েছে বাংলাদেশকে। ২০১৮ এশিয়া কাপ জয়ের পর এবারও ইতিহাস রচনা মেয়েদের হাত ধরে।

ঘণ্টা বাজিয়ে খেলার উদ্‌বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ইডেন গার্ডেনসের ঐতিহ্যবাহী ঘণ্টা বাজিয়ে দিবারাত্রির টেস্ট ম্যাচ উদ্‌বোধন করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২২শে নভেম্বর দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে শেখ হাসিনা ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে খেলার উদ্‌বোধন ঘোষণা করেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)-এর সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী কলকাতায় বাংলাদেশ-ভারত দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ দেখতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেই আমন্ত্রণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রওনা দেন সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে। শেখ হাসিনা কলকাতায় পৌঁছেন ১০টা ৪৫ মিনিটে। টেস্ট ভেন্যু ইডেনে ১২টা ১০ মিনিটে শেখ হাসিনাকে অভ্যর্থনা জানান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী।

শেখ রাসেল ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব কাপ টেনিস টুর্নামেন্ট ২০১৯-এর উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেখ রাসেল ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব কাপ টেনিস টুর্নামেন্ট ২০১৯-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী যুব ও তরুণ সমাজকে খেলাধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার আহ্বান জানান। খেলাধুলা অসামাজিক কার্যকলাপ এবং মাদক ও সন্ত্রাস থেকে দূরে রাখে যুব ও তরুণ সমাজকে। চরিত্র গঠনে ও সুন্দর জীবনযাপনে খেলাধুলা সহায়ক ভূমিকা পালন করে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশ এখন

ফেসবুকে

ভিজিট করুন

www.facebook.com/sachitrabangladesh/

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

চলে গেলেন কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন

আফরোজা রুমা

না ফেরার দেশে চলে গেলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন। ২৬শে নভেম্বর ভোরে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে রক্তের সংক্রমণে ভুগছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

১৯৪৩ সালের ৩১শে জানুয়ারি কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন রবিউল হুসাইন। ১৯৫৯ সালে সেখানকার সিরাজুল ইসলাম মুসলিম হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক ও ১৯৬২ সালে কুষ্টিয়া কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শেষে ১৯৬৮ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে স্থাপত্যবিদ্যায় স্নাতক সম্পন্ন করেন। জীবনের নানাপর্বে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্থপতি হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। বাংলাদেশের আধুনিক বাস্তুকলা বিভাগে রবিউল হুসাইন এক বিশিষ্ট নাম। ঢাকাসহ দেশের নানা প্রান্তের বেশকিছু স্থাপত্যকর্ম তাঁর নান্দনিক চিন্তার সাক্ষ্য বহন করছে। বাংলা একাডেমির ঐতিহাসিক বর্ধমান হাউসসহ বিভিন্ন স্থাপনা সংস্কার ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্প্রসারিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা বিন্যাসে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট, জাতীয় কবিতা পরিষদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে এদেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক অভিযাত্রায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন। রবিউল হুসাইনের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছে– সুন্দরী ফর্ণা, কোথায় আমার নভোযান, কেন্দ্রধ্বনিতে বেজে ওঠে, আমগ্ন কাটাকুটি, কবিতাপুঞ্জ। উপন্যাস– বিষুবরেখা। প্রবন্ধ-গবেষণা– বাংলাদেশের স্থাপত্য সংস্কৃতি। শিশুসাহিত্য– কুয়াশায় ঘরে ফেরা, দুর্দান্ত। সম্পাদনা গ্রন্থগুলো হচ্ছে– কবিতায় ঢাকা সাহিত্যকর্মে তাঁর বৈচিত্র্যপূর্ণ অবদানের নিদর্শন। গত শতকের ষাটের দশকে নানা ছোটো কাগজের মধ্য দিয়ে এদেশের ছোটো কাগজ আন্দোলনেও তিনি তাঁর অঙ্গীকারের প্রমাণ রেখে গেছেন।

একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইনের মরদেহ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয় ২৭শে নভেম্বর বিকালে। এর আগে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সকাল সাড়ে ১০টায় তাঁর মরদেহ কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে নেওয়া হয়। সেখানে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি ফুলেল শ্রদ্ধা জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানান তাঁর বিশেষ সহকারী বিপ্লব বড়ুয়া ও আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মণি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, স্থপতি রবিউল হুসাইন দেশের সব প্রগতিশীল আন্দোলনে সাংস্কৃতিক কর্মীদের সঙ্গে ছিলেন, তাদের প্রেরণা জুগিয়েছেন। তিনি বঙ্গবন্ধু জাদুঘরের সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিলেন। আমরা তাঁকে অসময়ে হারালাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ইমিরেটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, রবিউল হুসাইন কবি হিসেবে বিশিষ্টজন ছিলেন, তাঁর নিজের যে বিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা, সেখানেও তাঁর একটা ভূমিকা ছিল। রবিউল হুসাইন সব সময় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে চলেছেন।

নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার বলেন, রবিউল হুসাইন ছিলেন বহুমাত্রিক ও নিরহংকারী। তাঁর বহুমুখী কাজের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মাঝে পরিচিত হয়ে থাকবেন। সাবেক সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সমুন্নত রাখার জন্য সারাজীবন কাজ করে গেছেন।

সকাল ১০টায় বাংলা একাডেমিতে তাঁর মরদেহ আনা হয়। জোহরের নামাজের পর ঢাবি কেন্দ্রীয় মসজিদে জানাজার পর মরদেহ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও স্থপতি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির 'সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী আয়োজন উপকমিটি'র সদস্য রবিউল হুসাইনের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলাদা বার্তায় শোক প্রকাশ এবং তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ
মোবাইল অ্যাপস-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপস
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 40, No. 06, December 2019, Tk. 25.00

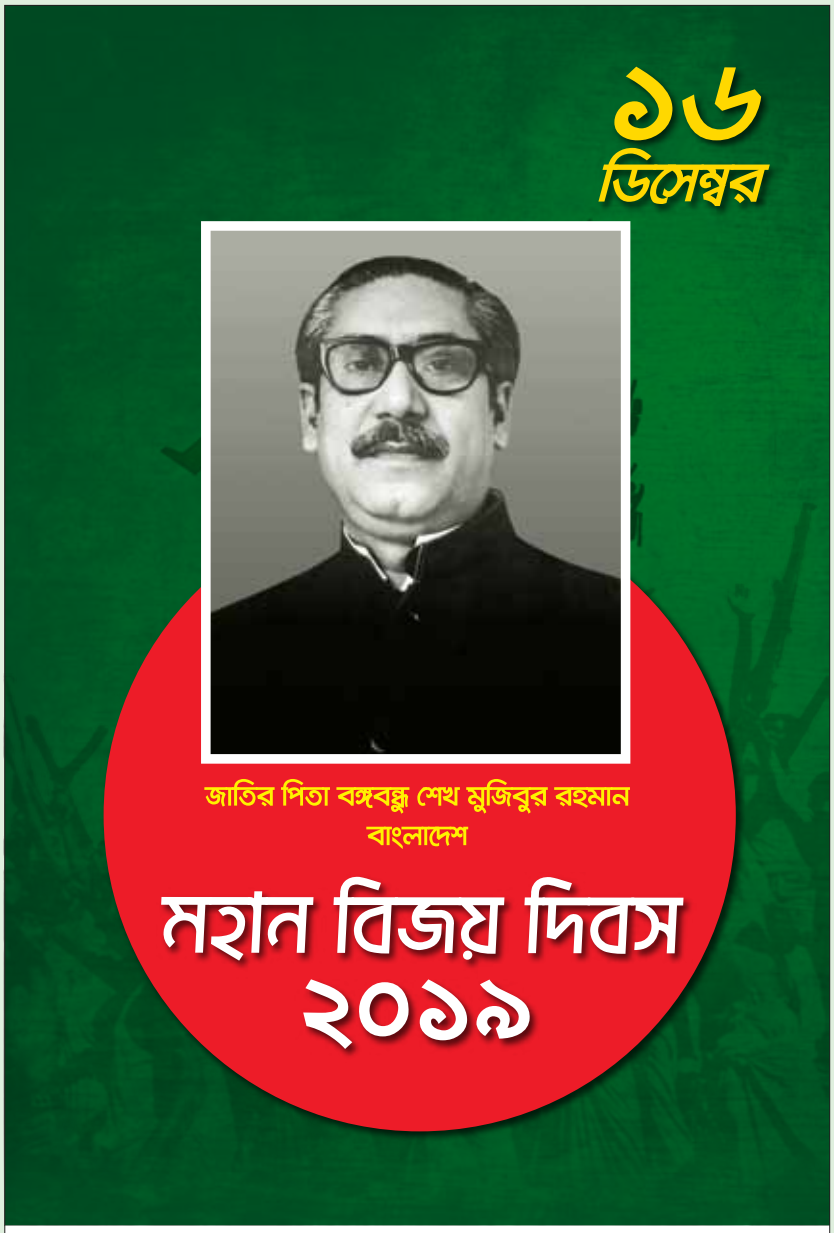

প্রকাশনায়: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, প্রচারে: গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়, মুদ্রণে: বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ২০১৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।